ফসলের উন্নয়ন

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

সমাজের উন্নয়ন : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

[illegible]

ফসলের উন্নয়ন : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

BANSDOC Library

ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া
প্রফেসর
কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

বাংলা একাডেমী ঢাকা

ফসলের উন্নয়ন : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

(বাংলাদেশে ফসল উন্নয়নের বিভিন্ন প্রেক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১৬ / জুলাই ২০০৯

বাএ ৪৭৫৭

(২০০৯-২০১০ : পাঠ্যপুস্তক : জীকৃচি : ১)

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান উপবিভাগ

জীকৃচি ৩৫২

প্রকাশক
ড. আবদুল ওয়াহাব
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মোবারক হোসেন
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

মূল্য
একশত টাকা

FASHOLER UNNAYAN : BANGLADESH PREKHIT (Crop improvement : Bangladesh Perspective) by Dr. Md. Shahidur Rashid Bhuiyan. Published by Dr. Abdul Wahab, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka-1000, Bangladesh. First Published : July 2009.
Price : Taka 100.00 only.

ISBN 984 - 07 - 4766-5

উৎসর্গ

বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রের দুই দিকপাল
কৃষিবিজ্ঞানী ও উদ্ভিদ প্রজননবিদ
ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা
ও
ড. শাহ্ মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান

ভূমিকা

ফসল উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। তখন ফসলের উন্নয়নের কাজ যতটা বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মকাণ্ড ছিল তার চেয়ে অধিক ছিল দৃষ্টি-নির্ভর। কারণ, কি করে বৈশিষ্ট্য পিতামাতা থেকে সন্তানে সঞ্চারিত হয় গত শতাব্দির পূর্বে সে নিয়মটিই অজানা ছিল। বিংশ শতাব্দির একেবারে শুরুতেই মেন্ডেলের বংশগতির সূত্র দুটির সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়েছে। অতঃপর শুরু হয় বিজ্ঞানভিত্তিক ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। ফসলের নানারকম বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ নিয়ে অতঃপর বহু গবেষণা পরিচালিত হয়। এতে নানা বৈশিষ্ট্যের জিনগত ভিত্তিসহ বৈশিষ্ট্য প্রকাশে পরিবেশের ভূমিকা কতটুকু সেটিও জানা সম্ভব হয়েছে। বিংশ শতাব্দির পঞ্চাশের দশকে এসে ক্রোমোজোমের মধ্যে লুকিয়ে থাকা DNA এর গঠনটি জানা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানীদের কাছে জিন-এর বিষয়টিও স্পষ্টতর হয়ে উঠে। ফলে গবেষণায় নতুন দিক উন্মোচিত হয়। ফসল উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন প্রজনন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এসব প্রজনন পদ্ধতি এবং এগুলোর নানারকম রূপান্তরিত পদ্ধতির সফল প্রয়োগের ফলে উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে নানারকম ফসলের জাত। প্রচলিত যাচাই-বাছাই আর নির্বাচনের মাধ্যমে জাত সৃষ্টির পাশাপাশি গত ৬০-৭০ বছর ধরে শুরু হয়েছে ব্যাপক সঙ্করায়ন কর্মসূচি। এরই ফলে উচ্চ ফলনশীল জাত পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে নানারকমের ফসলের হাইব্রিড জাত। নানারকমের মিউটাজেন প্রয়োগ করে মিউটেশন ঘটানো কিংবা ক্রোমোজোমের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করে ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের চেষ্টাও শুরু হয়েছে। গত ২০-৩০ বছর ধরে টিস্যু কালচারও ফসল উন্নয়নের সহায়ক প্রযুক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ইতোমধ্যে জিনের ভেতরকার বহু তথ্য বিজ্ঞানীদের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। নির্দিষ্ট জিনকে চিহ্নিত করে তা কর্তন করে নিয়ে নির্দিষ্ট ফসলে একে প্রবিষ্ট করে দিয়ে ফসলে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভও অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। দিনে দিনে জিন প্রযুক্তির প্রসার, প্রয়োগ ও ফসল উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। নতুন নতুন জিএম বা ট্রান্সজেনিক ফসল এখন নানা দেশে বাণিজ্যিকভাবে আবাদ হচ্ছে। আমাদের দেশেও জিএম উদ্ভিদ নিয়ে মাত্রার গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। মানুষ যত বাড়ছে, খাদ্য উৎপাদনের নানারকম কৌশলও ততো বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফসলের নানা বৈশিষ্ট্যের রূপান্তর ঘটিয়ে উৎপাদন ও গুণগত মান বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে।

পৃথিবীর নানা দেশের মতো বাংলাদেশেও ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এগিয়ে চলেছে সেই ১৯১০-২০ সাল থেকেই। নানারকম প্রজনন পদ্ধতি প্রয়োগ করে নতুন নতুন জাত সৃষ্টির কর্মকাণ্ডে এদেশের বিজ্ঞানীরাও বেশ এগিয়ে এসেছেন। নতুন নতুন জাত সৃষ্টির পাশাপাশি নতুন নতুন ফসল আর ফসলের জাত প্রবর্তন মিলে এদেশে গত ৫০-৬০ বছরে ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য রকমভাবে বেড়েছে। আগামী দিনে আমাদের

চাহিদার নিরিখে আরও নতুন নতুন জাত সৃষ্টি করতে হবে। ফসল উন্নয়নের ফলে নতুন নতুন জাত সৃষ্টির কারণে অল্প ক'টি ফসলের জাত অধিকতর সফল হওয়ায় ফসলের মধ্যে দিন দিন জাত বৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। ফসল উন্নয়ন কৌশলের পাশাপাশি কৃষিতে মেধাস্বত্বের বিষয়সহ জীববৈচিত্র্য হ্রাসের নানা প্রসঙ্গও এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে কোন ধরনের প্রজনন কৌশল অনুসরণ করে কোন ধরনের জাত সৃষ্টি করা হয়েছে তার কিছু বর্ণনা এই গ্রন্থে সন্নিবেশন করা হয়েছে।

ফসল এবং ফসলের উন্নয়ন নিয়ে যারা চিন্তা-ভাবনা করেন তাদের জন্য এই গ্রন্থটি কাজে আসবে বলে বিশ্বাস করা যায়। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে ধারণা করা যায়।

এ গ্রন্থটি প্রকাশ করায় আমি বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জুলাই ২০০৯ ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	:	ফসলের স্থানীয় জাত ও ফসল উন্নয়ন	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	ফসল ও ফসলের জাত প্রবর্তন	১৭
তৃতীয় অধ্যায়	:	সঙ্করায়নের মাধ্যমে ফসলের উন্নয়ন	২৯
চতুর্থ অধ্যায়	:	ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করে ফসলের উন্নয়ন	৫২
পঞ্চম অধ্যায়	:	আকস্মিক জিন পরিবর্তনকরণের মাধ্যমে ফসলের উন্নয়ন	৫৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	হাইব্রিড জাত সৃষ্টির মাধ্যমে ফসলের উন্নয়ন	৬৯
সপ্তম অধ্যায়	:	কোষকলা আবাদের মাধ্যমে ফসলের উন্নয়ন	৮১
অষ্টম অধ্যায়	:	জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসলের উন্নয়ন	৯২
নবম অধ্যায়	:	ফসল উন্নয়ন ও মেধাস্বত্ত্ব	১০২
দশম অধ্যায়	:	ফসল উন্নয়নের ক্ষতিকর প্রভাব	১০৮
একাদশ অধ্যায়	:	আগামী দিনের ফসল	১১৪
		তথ্যপঞ্জি	১২৬

প্রথম অধ্যায়

ফসলের স্থানীয় জাত ও ফসল উন্নয়ন

গাছপালার সঙ্গে মানুষের পরিচয় অনেকদিন আগে থেকেই। সে তুলনায় বুনো গাছগাছালিকে ফসলে রূপান্তর করবার চেষ্টা খুব বেশি দিনের কথা নয়। এ যাবৎ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ফসলের আবাদের কাজ শুরু হয়েছে এখন থেকে দশ বারো হাজার বছর পূর্বে। হাজার হাজার বছর ধরে নানারকম বুনো গাছগাছালিকে নানারূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ফসলে রূপান্তর ঘটিয়েছে মানুষ। এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বুনো গাছ-গাছালি থেকে নানারকম ফসলের উৎপত্তি ঘটেছে। প্রাকৃতিক নির্বাচন আর মানুষের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ফসলকে পাল্টেছে যুগ যুগ ধরে। ফসলের কোষস্থ জেনেটিক উপাদানে আকস্মিক পরিবর্তন আর প্রাকৃতিক সঙ্করায়নের ফলে সৃষ্ট বিভিন্নতা থেকে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম নির্বাচন ফসলের রূপান্তর ঘটিয়েছে। প্রাকৃতিক বিভিন্নতা সম্পন্ন উদ্ভিদরাজি থেকে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ নির্বাচন ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি করেছে এক একটি ফসলের বহু সংখ্যক জাত। কৃষকের নিজস্ব রুচি, নির্দিষ্ট এলাকায় ফসলের অভিযোজন আর মানুষের চাহিদার উপর নির্ভর করে এলাকাভিত্তিক কৃষকগণ নির্বাচন করে নিয়েছেন কত শত জাত। কত ভিন্ন তাদের আকার আকৃতি,স্বাদ বর্ণ আর গন্ধ। এগুলো আমাদের বিভিন্ন ফসলের আদি জাত। এসব জাতকে বলা হয় 'ভূমি কর্ষিতক' (land race)। সহজ ভাষায় এগুলোই হলো কৃষকের জাত অথবা ফসলের স্থানীয় জাত।

১. ভূমি কর্ষিতক বা স্থানীয় জাত

আমেরিকান বিজ্ঞানী জে আর হারলেন ফসলের আদি জাত, ভূমি কর্ষিতক, স্থানীয় জাত বা কৃষকের জাতের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এসব জাতের চমৎকার জেনেটিক অখণ্ডতা রয়েছে। বাহ্যিকভাবে একটি জাতকে অন্য জাত থেকে আলাদা করে নেবার প্রয়োজনীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কৃষকের এসব জাতের রয়েছে চমৎকার সব নাম। মৃত্তিকার প্রকৃতি, বীজ বোনার সময়কাল, ফসল পাকার সময়কাল, ফসলের জাতের উচ্চতা, পুষ্টিমান এবং অন্যান্য আরও কিছু গুণাগুণের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন জাতের রয়েছে বিভিন্ন রকম অভিযোজ্যতা, রয়েছে চমৎকার কৌলিক বৈচিত্র্য। এ বৈচিত্র্য নিয়ে এরা পরিবেশে বেশ সুষমতা প্রদর্শন করে। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে টিকে থাকার এগুলোর চমৎকার ক্ষমতা রয়েছে। রোগবালাই আর কীটপতঙ্গের আক্রমণ এবং নানারকম পারিবেশিক পীড়ন সয়ে নেবার ক্ষমতা এগুলোর বেশি। এগুলোর রয়েছে পরিবর্তিত পরিবেশে খাপখাইয়ে নেবার উত্তম অভিযোজন ক্ষমতা।

ফসলভেদে কৃষকের জাতসমূহের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। স্ব-পরাগী ফসলে কৃষকের জাতগুলো একাধিক বিশুদ্ধ লাইনের (pure lines) মিশ্রণ। স্ব-পরাগী স্বভাবের কারণে প্রতিটি লাইনের জেনোটাইপ হোমোজাইগাস কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লাইনের হোমোজাইগিটির

রূপ এক রকম নয় বলে সবগুলো লাইন মিলে উদ্ভিদ সমষ্টিতে এক রকম জেনেটিক অসমসত্বতা (heterogeneity) সৃষ্টি করে। এই অসমসত্বতা কিন্তু স্থায়ী এবং বেশ সুষমও। একারণেই এসব জাত বংশপরম্পরায় রক্ষা করে চলেছে এগুলোর স্বাতন্ত্র্য। এ স্বাতন্ত্র্য যেমন দৃষ্টিরূপতায় (phenotype), তেমনি তা জিনরূপতায়ও (genotype)। কৃষকের এসব জাতে যেসব লাইন মিশ্রিত হয়ে আছে এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্যও রয়েছে। এ পার্থক্য প্রতিটি লাইনের রোগবালাই ও কীটপতঙ্গের আক্রমণ সয়ে নেবার ক্ষমতায়, পার্থক্য রয়েছে এসব লাইনের ফলনশীলতায়। আর পার্থক্য রয়েছে এদের দৃষ্টিরূপতায় তা যত সামান্যই হোক না কেন। এটুকু পার্থক্য আছে বলে এগুলোকে আলাদা বলে চেনা যায়। কৃষকের জাতসমূহের মধ্যে বিদ্যমান এসব বিশুদ্ধ লাইনের মধ্যে পার্থক্য যা-ই থাকুক এদের মধ্যে যে মিল নেই তাও কিন্তু নয়। যদি মিল না থাকতো তাহলে এত অধিক কাল পর্যন্ত একটি জাতের অংশীদার হয়ে কিছুতেই টিকে থাকতে পারতো না এক একটি লাইন। এদের দানার আকৃতিগুলো ছিল মোটামুটি এক রকমের। এদের বৃদ্ধি ও বিকাশের সময়কাল এক। এদের পরিপক্বতা কাল এক। পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবেশিক ঘাত প্রতিঘাত সইয়ে নিয়ে এক সঙ্গে টিকে থাকার আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে এদের। এজন্যই অজীবীয় (abiotic) ও জীবীয় (biotic) পীড়ন সইয়ে এরা টিকে রয়েছে জাত হিসেবে। প্রতিকূল পরিবেশে কাঙ্ক্ষিত ফলন না পাওয়া গেলেও এসব জাত কৃষককে একেবারে নিরাশ করে না কখনও।

পরপরাগী ফসলেরও রয়েছে নানা রকম কৃষকের জাত। জেনেটিক দিক থেকে এরা হেটেরোজাইগাস। সহজেই অন্য জাতের পরাগ গ্রহণে দক্ষ বলে এদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব। এরা সতত পরিবর্তনশীল। প্রকৃতিক নির্বাচন প্রতিনিয়তই এ ধরনের উদ্ভিদ সমষ্টিতে ক্রিয়াশীল। ফলে অল্প কিছু জাত ছাড়া পরপরাগী ফসলের অধিকাংশ কৃষকের জাত এদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে বলে এদের আর পূর্বের জাত হিসেবে শনাক্ত করা যায় না। এজন্য বংশপরম্পরায় এদের জাত টিকে থাকার কোনো সুযোগ নেই। তবে কিছু পরপরাগী স্বভাব রয়েছে অথচ মূলত ফসলটি স্ব-পরাগী সে রকম ক্ষেত্রে কৃষকের জাত কিছুটা বিকৃত অবস্থায় বহু বছর টিকে থাকতে পারে।

উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে গত শতাব্দির শুরুতে এসে ফসলের এসব আদি জাতের ব্যবহার অনেক হ্রাস পায়। এসব কৃষকের জাতের মধ্য থেকে উত্তম গাছ বাছাই করে বিজ্ঞানীরা অধিক ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেন। বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী Vas Mons, ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী Andrew Knight এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী Cooper বেশ কিছু ফসলে এরকম নির্বাচন পরিচালনা করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফসলের জাত উদ্ভাবন করেন। বিজ্ঞানী Patrick Shireff নামে স্কটল্যান্ডের এক বিজ্ঞানী গমে এবং যই-এ স্বতন্ত্র গাছ নির্বাচন করে বেশ কিছু উত্তম জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন। ইংল্যান্ডে বিজ্ঞানী Hellet একক গাছ নির্বাচন করে গম, যই এবং যবে প্রভূত উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হন। বিজ্ঞানী Vilmorin ও ফসলের সন্তান-সন্ততি যাচাই করে স্বতন্ত্র উদ্ভিদ নির্বাচন করে সুগারবিট ফসলে চিনির পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম হন। কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে কৃষকের জাতের উন্নয়নের ফলে সৃষ্ট নতুন জাতের ব্যবহার বৃদ্ধি

পাওয়ায় বিংশ শতাব্দির শুরুতে এসে এসব দেশে কৃষকের জাতের আবাদ বেশ হ্রাস পায়।

বিশ্বের উন্নয়নশীল এবং দরিদ্র দেশগুলোতে গত শতাব্দির শুরুতে কিন্তু ফসল উৎপাদন কেবল ভূমি কর্ষিতক বা কৃষকের জাতের উপরই নির্ভরশীল ছিল। শতকরা ১০০ ভাগ ফসলের জাতই ছিল কৃষক কর্তৃক বিভিন্ন এলাকায় যাচাই বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে উদ্ভাবিত এসব জাত। কোনো কোনো উন্নয়নশীল দেশে গত শতাব্দির ষাটের দশক পর্যন্ত ব্যাপকভাবেই এসব জাতের চাষ হয়ে আসছে। পাশাপাশি আবাদ করা হয়েছে নির্বাচিত বিশুদ্ধ লাইনের (Pure line) ফসলের জাত।

২. ফসলের বংশানুসরণ সম্পর্কিত গবেষণা

বিংশ শতাব্দির একেবারে শুরুতে বংশগতির ক্ষেত্রে একটা খুব বড় রকমের ঘটনা ঘটে। হল্যান্ডের বিজ্ঞানী Correns, জার্মানীর বিজ্ঞানী Tschermak এবং অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী De Vries স্বতন্ত্র গবেষণার মাধ্যমে একেবারে একসঙ্গে গ্রেগর যোহান মেন্ডেল কর্তৃক প্রস্তাবিত বংশগতির সূত্র (laws of heredity) দুটির সত্যতা আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এ আবিষ্কার কোন্ নিয়মে পিতামাতার বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয় বিজ্ঞানীদের কাছে তা একেবারে স্পষ্ট করে তোলে। মেন্ডেলের সূত্রদ্বয়ের পুনরাবিষ্কার ফসল উন্নয়নে এক নতুন মাত্রা নিয়ে আসে। বিজ্ঞানীরা নতুন উদ্যমে ফসল উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন ।

বিজ্ঞানী Johannsen ফরাসী শিম (French bean) নিয়ে এক চমৎকার গবেষণা করেন। বাজার থেকে 'প্রিন্সেস' নামক একটি জাতের মিশ্রিত আকারের বীজ সংগ্রহ করে সে বীজ নিয়ে তিনি গবেষণাটি পরিচালনা করেন। বীজের আকৃতি অনুযায়ী তিনি বীজগুলোকে ১৯ টি গ্রুপে ভাগ করেন। এসব বীজ তিনি আলাদা আলাদাভাবে মাঠে বুনেন। যখন এসব বীজ থেকে আবার বীজ তৈরি হয় তখন তিনি বীজগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে সংগ্রহ করেন। এভাবে তিনি লক্ষ্য করেন যে, বড় বীজ থেকে সৃষ্ট বীজগুলো বড় হয়েছে, মাঝারি বীজ থেকে মাঝারি বীজ সৃষ্টি হয়েছে এবং ছোট বীজ পাওয়া গেছে ছোট বীজ থেকে। তার এ গবেষণালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ করে তিনি বিশুদ্ধ লাইন তত্ত্ব (pure line theory) নামে একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। এ তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করলে যে সত্যগুলো বেরিয়ে আসে তা হলো–

ক) কোনো স্ব-পরাগী ফসলের জাতে কয়েকটি লাইন মিশ্রিত হয়ে থাকলে নির্বাচনের মাধ্যমে লাইনগুলোকে আলাদা করে নেয়া যায়।

খ) কোনো ফসলের জাতে একাধিক বিশুদ্ধ লাইন মিশ্রিত হয়ে থাকার ফলে যে বিভিন্নতা মাঠে পরিলক্ষিত হয় তা কৌলিক এবং পরিবেশগত উভয় কারণে হতে পারে।

গ) কোনো একটি বিশুদ্ধ লাইনে মাঠ পর্যায়ে কোনো বিভিন্নতা দেখা গেলে তা কৌলিক নয়, বরং তা পরিবেশগত কারণে সৃষ্ট। ফলে এক্ষেত্রে নির্বাচন পরিচালনা করলে তা অকার্যকর হতে বাধ্য।

উন্নত বিশ্বে কৃষকের জাতে নির্বাচন পরিচালনার যৌক্তিকতা এবং বিজ্ঞানীরা এসব জাতে নির্বাচন করে উন্নত ধরনের জাত সৃষ্টি করার কারণ সম্বন্ধে জানা সম্ভবপর হওয়ায় ইতোপূর্বে যেসব দেশে কৃষকের জাতে নির্বাচন করে ভিন্ন ভিন্ন লাইনগুলোকে আলাদা করা হয়নি সেসব দেশের বিজ্ঞানীদের বিশুদ্ধ লাইন জাত সৃষ্টির লক্ষ্যে গবেষণা শুরু করার আগ্রহ সৃষ্টি করে। এ সময় অবশ্য ফসলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য বিভিন্ন গবেষণা থেকে বেরিয়ে আসে। ফসলের বৈশিষ্ট্য যে মূলত দু'রকমের এটিও জানা সম্ভব হয়। কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে একটি মাত্র জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এদের বংশানুসরণ বেশ সহজ। এরা পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় না বললেই চলে। ফুলের বর্ণ তেমনি এক বৈশিষ্ট্য। আর এক ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে বেশ জটিল। এরা নিয়ন্ত্রিত হয় অনেকগুলো জিন দ্বারা। সব জিন মিলে এরা বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ করে। পরিবেশ দ্বারা এসব বৈশিষ্ট্য বেশ প্রভাবিত হয়। ফসলের ফলন তেমনি একটি বৈশিষ্ট্য। সহজে তাই এর উন্নয়ন সাধন করা যায় না। গমের দানার বর্ণের উপর গবেষনা করে ১৯০৮ সালে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন সুইডেনের বিজ্ঞানী Nilsson-Ehle।

ফসলের বংশগতিসহ ফসলের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণে জিনের ভূমিকা এবং বৈশিষ্ট্যের উপর পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং অন্যান্য তথ্যাবলির সমাহার নতুন নতুন উদ্ভিদ উন্নয়ন পদ্ধতি উদ্ভাবনে সহায়ক হয়। ইতোমধ্যে ফসল উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রজননবিদদের গবেষণার ফলে একাধিক বিকল্প পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। বিজ্ঞানীরা ফসল উন্নয়নের বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে শুরু করেন। যেসব দেশে এতদিন কৃষকের জাতই ফসল আবাদের প্রধান অবলম্বন ছিল, সেসব দেশেও ইতোমধ্যে বিশুদ্ধ লাইন জাত উদ্ভাবন শুরু হয়ে যায়। বিশুদ্ধ লাইন জাত দেখতে সমরূপ হওয়ায়, এদের দানার বর্ণ ও আকার আকৃতি হুবহু এক রকম হওয়ায় এবং কৃষকের জাত অপেক্ষা অধিক ফলন প্রদান করায় কৃষকেরা সহজেই এসব জাতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে বিশুদ্ধ লাইন জাতের আবাদ শুরু হয়ে যায় এবং কৃষকের জাতের আবাদ কমতে থাকে।

কৃষকের জাতের কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। বিশেষ করে দানাশস্যে এ সীমাবদ্ধতা বেশ স্পষ্ট। দানা ফসলের গাছগুলো বেশ লম্বা। এজন্য কোনো কোনো ফসলের স্থানীয় জাত সহজেই হেলে পড়ে। যার ফলে নানাভাবে ফসলের ফলন হ্রাস পায়। হেলে পড়া গাছের শীষ মাটিতে লেগে গেলে নষ্ট হয়ে যায়। এরা সহজে রোগজীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। গাছ লম্বা হওয়ায় এদের শীষ ততটা বড় নয়। অধিকাংশ দানা অপূর্ণ থেকে যায়। এদের হারভেস্ট ইনডেক্স (harvest index) বেশ কম। ধান গমের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের মোট জীবভরের (biomass) সাথে দানার ওজনের অনুপাত হলো এর হারভেস্ট ইনডেক্স। কম হারভেস্ট ইনডেক্সের কারণে কৃষক সহজেই বিকল্প হিসেবে বিশুদ্ধ লাইন জাত আবাদ করতে আগ্রহী হয়। কিছু অধিক ফলন পাওয়াটাই এখানে মুখ্য বিষয়। এসব বিশুদ্ধ জাতের প্রতি কৃষকের আগ্রহ অনিবার্যভাবে অনেক কৃষকের জাতকে আবাদের বাইরে ঠেলে দেয়। অনাবাদি থাকতে থাকতে আমাদের অজান্তে অনেক স্থানীয় জাত অতঃপর বিলুপ্ত হয়ে যায়। এদের অনেকগুলো সংগ্রহ করে জিন ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হয়।

৩. ফসলের স্থানীয় জাতের জিন সংরক্ষণ ও ব্যবহার

রাশিয়ার বিখ্যাত বিজ্ঞানী N I Vavilov জিন ব্যাংকে ফসলের আত্মীয়-স্বজনদের সংরক্ষণ করার বিষয়টিতে প্রথম গুরুত্বারোপ করেন। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে অনেক ফসলের কৃষকের জাত, বুনো ও আধা-বুনো প্রজাতি, অন্যান্য আত্মীয় প্রজাতি ইত্যাদি সংগ্রহ করে এনে একটি বিশাল জিন ব্যাংক গড়ে তুলেন। অবশ্য তিনি এসব বিশাল জিন সম্ভারকে কাজে লাগিয়ে ফসল উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার কাজে বেশি দুর অগ্রসর হতে পারেনি। তবু তাঁর জিন ব্যাংক গড়ে তোলার কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ হয়ে ষাটের দশকে যুক্তরাষ্ট্রের গম ফসল উন্নয়ন এবং জাপানে ধান ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় দুটি প্রধান গবেষণা ইনস্টিটিউট গড়ে উঠে। এর একটি গড়ে উঠে ১৯৬০ সালে ফিলিপাইনের লসবেনসে। এ প্রতিষ্ঠানটির নাম আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI)। অন্য প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠে ১৯৬৬ সালে মেক্সিকো নগরের সন্নিকটে। এ প্রতিষ্ঠানটির নাম আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র সংক্ষেপে যাকে বলা হয় CIMMYT। আন্তর্জাতিক ঋণদাতা রকফেলার ফাউন্ডেশন এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশন এ কাজে অর্থায়ন করে। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠে বিভিন্ন ফসলভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা ইনস্টিটিউট। রোমে গড়ে উঠে কনসালটেটিভ গ্রুপ অন ইনটারন্যাশনাল এগ্রিকালচারল রিসার্চ (CGIAR)নামক একটি প্রতিষ্ঠান। এসব গবেষণা ইনস্টিটিউটগুলোকে CGIAR -এর মাধ্যমে অর্থায়ন করে থাকে ফোর্ড এবং রকফেলার ফাউন্ডেশন এবং বিশ্ব ব্যাংক। এসব ইনস্টিটিউটের প্রধান কাজ হলো তিনটি :

১) এদের প্রতিটি ইনস্টিটিউটের যেসব ফসলের উন্নয়নের দায়িত্ব দেয়া আছে সেসব ফসলের উন্নয়ন সাধন;

২) এসব ফসলের খামার পদ্ধতি (farming system) সম্পর্কে গবেষণা করা এবং

৩) ইনস্টিটিউটভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের কৃষকের জাতসহ অন্যান্য জিন সম্পদ সংরক্ষণের জন্য জিন ব্যাংক স্থাপন।

আশির দশকে এসব কৃষকের জাত সংরক্ষণের লক্ষ্যে পৃথিবীর ৭০টি দেশে জিন ব্যাংক স্থাপন করা হয়। ফসলের কৃষকের জাতসমূহ সমগ্র পৃথিবীর মানুষের সাধারণ সম্পদ– এ মতবাদের ভিত্তিতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ধনী দেশগুলোর অর্থায়নে সংগ্রহ করা হয় ফসলের জিনসম্পদ। কোনো দেশ থেকে সংগৃহিত জিনসম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট দেশে থাকলে সেখানেও সংরক্ষণ করা হয়েছে সংগৃহিত সম্পদের এক কপি। আর এক কপি সংরক্ষণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে আন্তর্জাতিক গবেষণা ইনস্টিটিউটগুলোর জিন ব্যাংকে। পৃথিবীব্যাপী ফসলের স্থানীয় জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের যে আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, গম ও ভুট্টার ক্ষেত্রে শতকরা প্রায় ৯৪ ভাগ কৃষকের জাত সংরক্ষিত হয়েছে। ধান ও সরগমের ক্ষেত্রে তা শতকরা ৮০ ভাগ (সারণি ১.১)। এসব জিনসম্পদ সংরক্ষণের মূল কথা ছিল এই যে, এসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানেই এসব মূল্যবান জিনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে যেসব প্রজনন লাইন (breeding line) তৈরি করা হবে তা সরবরাহ করা হবে

বিনামূল্যে জিন সরবরাহকারী দেশগুলোকে। এজন্য এতদিন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা ইনস্টিটিউটে উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের জাতও যেমন সরাসরি পাওয়া গেছে, তেমনি পাওয়া গেছে বিভিন্ন প্রাগ্রসর লাইনও (advanced lines)। এসব লাইন থেকে স্ব স্ব দেশে যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে।

সারণি ১.১ : পৃথিবীর জিন ব্যাংকগুলোতে সংরক্ষিত প্রধান ফসলসমূহের নমুনার সংখ্যা এবং মোট কৃষকের জাতের সংগৃহিত শতকরা হার

ফসল	সংগৃহিত নমুনা	কৃষকের জাতের শতকরা হার
গম	৪১০০০০	৯৫
ধান	২২০০০০	৮০
ভুট্টা	১০০০০০	৯৫
সয়াবিন	১০০০০০	৬০
বার্লি	২৮০০০০	৬৫
সরগাম	৯৫০০০	৮০

মূলত জিন ব্যাংকে বিভিন্ন ফসলের বীজ সংরক্ষণের মাধ্যমে ফসলের আত্মীয়স্বজনের জিনগুলো সংরক্ষণ করা হচ্ছে। গবেষণাগারে কোনো বীজ সংরক্ষণের জন্য এলে এর একটি কম্পিউটারভিত্তিক আইডেন্টিটি কার্ড দেয়া হয় এবং এর অঙ্কুরোদ্গম হার এবং জলীয় উপাদানের পরিমাণ মূল্যায়ন করা হয়। বীজের আর্দ্রতা রক্ষা করা হয় শতকরা ৬ ভাগের কাছাকাছি আর বীজকে সংরক্ষণ করা হয় ঠাণ্ডা ঘরে যার আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম। বীজসংরক্ষণের দুটি উপায় রয়েছে। যে সব বীজের আকার বড় বা যেসব বীজে তেলের পরিমাণ বেশি এদেরকে থলের মধ্যে রেখে ভল্টে ঢুকিয়ে দেয়া হয় ১৮°C তাপমাত্রায় সংরক্ষণের জন্য। দশ বছর পরপর এসব বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা যাচাই করার জন্য জন্মাতে হয়। অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা হ্রাস পেলে এদের মাঠে জন্মানো হয় যেন আবার নতুন বীজ সংরক্ষণ করা যায়। আর যেসব ফসলের বীজ ছোট এবং যাদের বীজে তেলের পরিমাণ কম (যেমন দানাশস্য) এদের সংরক্ষণ করা হয় -১৯৬°C তাপমাত্রায় তরল নাইট্রোজেনের মধ্যে। দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের জন্য এ পদ্ধতিটি বেশ ভাল। গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, কয়েক দশক পর পর তরল নাইট্রোজেনে সংরক্ষিত বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা যাচাই করলে চলে। ইদানিংকালে যেসব ফসল অঙ্গজ উপায়ে যেমন- মূল,কন্দ,কাণ্ডাংশ ইত্যাদি দিয়ে বংশবিস্তার করে এদের দেহের অঙ্গজ অংশ টিস্যু কালচার করে তরল নাইট্রোজেনে দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা যায় কিনা সে গবেষণা চলছে। গবেষণার ফলাফলও বেশ আশাব্যঞ্জক।

সংরক্ষণের আয়োজন দেখেই বোঝা যায়, আমাদের নানা রকম ফসলের কৃষকের জাতগুলোর মূল্য কতটা। এসব জাতের মধ্যে যে মূল্যবান জিন সম্ভার রয়েছে এগুলো

আমাদের আজকের এবং আগামী দিনের ফসল উন্নয়নের কাঁচামাল। আজকের প্রেক্ষাপটে কোনো একটি জাতের বৈশিষ্ট্য এতটা জরুরি বিবেচিত না হলেও কোনো একদিন সেই বৈশিষ্ট্য বা বৈশিষ্ট্যগুলো খুব প্রয়োজনের হয়ে উঠতে পারে। পরিবেশের মধ্যে ফসলকে প্রতিনিয়তই নানা রকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কীটপতঙ্গ, রোগবালাই, খরা, শীত, বন্যা, লবণাক্ততা এমনি কত রকম পীড়নকে মোকাবেলা করে তবেই ঘরে আসে কৃষকের ফসল। তাছাড়া আজ যে কীটপতঙ্গ এক একটি ফসলের প্রধান শত্রু ক'দিন পর অন্য কীটপতঙ্গ হয়ে উঠতে পারে ফসলের প্রধান শত্রু। আজ যে রোগজীবাণু ফসলের ধস নামায় তা-ও হয়ে পড়তে পারে এক সময় গৌণ। এমনি নানা পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে ফসল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হতে পারে নানা রকম জিন। সংরক্ষণ না করলে কোথায় মিলবে এসব জিন। পৃথিবীব্যাপী আজ আধুনিক ধান, গম কিংবা ভুট্টার যে সাফল্য এদের সৃষ্টির খবর যদি আমরা নেই, তাহলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না যে, কত মূল্যবান অবদান রেখেছে এসব কৃষকের জাত।

৪. আধুনিক ধানের জাত সৃষ্টিতে কৃষকের জাতের ভূমিকা

ধানের ক্ষেত্রে ষাটের দশকে ইরি ধান এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগায় অনেক দেশে। ইরি ধানের এ সাফল্যের পেছনে এসব কৃষকের জাতের মূল্যবান অবদান রয়েছে। ষাটের দশকের বিস্ময়কর ধান IR-8 সঙ্করায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ সঙ্করায়নে প্রজনক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এসব কৃষকের জাতই। IR-8-এর পিতামাতা হলো Peta আর Dee-geo- woo-gen নামক দুটি জাত। জাপানে স্থানীয় একটি ধানের জাতের সঙ্গে প্রাকৃতিক পর-নিষেকের মধ্য দিয়ে যাচাই বাছাই হতে হতে তৈরি হয়েছে Peta নামক উচ্চ ফলনশীল খরাসহিষ্ণু ধানের জাতটি। এ কাজটি সম্পন্ন করেছেন সে দেশের কৃষকেরাই। আর যে আধা খর্বাকৃতির তাইওয়ানের ধানের সঙ্গে Peta জাতটির ক্রস করানো হয়েছিল সেটিও ছিল একটি কৃষকের জাত। এর নাম Dee-geo- woo-gen। IR-8 জাতটি পরবর্তীকালে খুব সফল জাত না হলেও পৃথিবীর অনেক দেশে অনেক স্থানীয় জাতের সঙ্গে একে প্রজনক হিসেবে ব্যবহার করে ক্রস করানো হয়েছে । এভাবে IR-8 জাতের মধ্যে লুকিয়ে থাকা স্থানীয় জাত Dee-geo- woo-gen এর কিছু জিন এবং Peta জাতের কিছু জিন সকলের অলক্ষ্যে ঢুকে গেছে ক্রসের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন বংশধরের মধ্যে। তা থেকে অত:পর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে খর্বাকৃতির অধিক ফলনশীল আধুনিক ধান।

ইরির আর একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ধানের জাত হলো IR-20। ১৯৬৯ সালে এ জাতটি বাজারজাত করার ছাড়পত্র পায়। এ জাতটির পিতামাতা ছিল Taichung Native 1(TN1) এবং Peta নামক জাতটি। TN1 জাতটি কোথেকে এসেছে সেটি দেখা যাক। জাপোনিকা ধান Dee-geo-woo-gen স্থানীয় জাতের সঙ্গে ইন্ডিকা জাতের রোগ প্রতিরোধী একটি স্থানীয় জাতের ক্রসের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এ জাতটি। অর্থাৎ উৎস কিন্তু কৃষকের জাতই। হাজার হাজার বছর ধরে উত্তরাধিকার সূত্রে ধারণ ও বহন করে এদের বাঁচিয়ে রেখেছিলেন আমাদের কৃষকেরা। বিজ্ঞানীরা সে বিশাল ভাণ্ডার থেকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এদের ব্যবহারকে নিশ্চিত করবার চেষ্টা করেছেন।

আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবনে কৃষকের জাতের গুরুত্ব কতোটা তা আর একটি উদাহরণ দিলে সহজেই বোঝা যাবে। খুব বেশি দিন হয়নি IR-72 উফশী ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে IRRI। এর পারিবারিক কুলজি (Family pedigree) পর্যালোচনা করলে বিস্মিত হতে হয় যে, কত দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে কত কত ক্রসের শেষ ফলাফল এ জাতটি। সবচেয়ে বড় কথা এ জাতটি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়েছে মোট ২২টি কৃষকের জাত, আর অনেকগুলো ইরি জাত। ইরি জাতগুলোর ভেতর দিয়ে বাহিত হয়ে এসেছে এসব কৃষকের জাতের জিন IR-72 তে। এই ২২টি জাতের মধ্যে ১টি করে কৃষকের জাত নেয়া হয়েছে মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে। কাকতালীয় এটি যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব জাত নয়। ফিলিপাইনের তিনটি কৃষকের জাত ব্যবহার করা হয়েছে আর চীনের চারটি। সবচেয়ে বেশি কৃষকের জাত ব্যবহার করা হয়েছে ভারতের। এর সংখ্যা দশটি। এ দশটির মধ্যে রয়েছে আমাদের পরিচিত একটি স্থানীয় জাতও। এর নাম লতিশাইল। লতিশাইল আমাদের দেশের একটি জনপ্রিয় স্থানীয় জাত।

৫. আন্তর্জাতিক জিন ব্যাংকে সংরক্ষিত স্থানীয় জাতের ভবিষ্যৎ

ফসলের সংরক্ষিত জিন সম্পদ কর্তৃক এই যে বিশাল জিন সম্ভার তথা কৃষকের জাত সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে এদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। যেসব দেশ থেকে এসব মূল্যবান জিনসম্পদ 'সকল মানুষের উত্তরাধিকার' বা 'সকল মানুষের সম্পদ' এ শ্লোগানের ভিত্তিতে সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়েছে সেসব দেশে এদের সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের উপায় অনেকক্ষেত্রেই বিদ্যমান নেই। ফলে স্ব স্ব দেশজ জিন ব্যাংকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাছাড়া তাদের আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাজনিত সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। ফলে তাদের মূল ভরসা কিন্তু আন্তর্জাতিক জিন ব্যাংকে সংরক্ষিত জিনসম্পদই। দ্বিতীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো এসব সংরক্ষিত জিন সম্পদের মালিকানা নিয়ে সৃষ্টি হওয়া সাম্প্রতিক কালের বিতর্ক।

বিতর্কের বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে আসার পূর্বে ছোট্ট একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা একান্ত আবশ্যক। এই পৃথিবীর আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ২০টি ফসল এদের অধিকাংশগুলোর জন্মস্থান কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে। এ কথা সত্য যে, এখন আর কোনো দেশ কেবল সে দেশে উৎপত্তি লাভ করেছে যেসব ফসল বা ফসলের জাতের তার উপর শতভাগ নির্ভরশীল নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অনেক বেড়ে গেছে। পশ্চিম মধ্য এশিয়ায় যে খাদ্য শস্যের আবাদ হচ্ছে এর শতকরা ৭০ ভাগ ফসলের উৎপত্তি স্থল ওখানেই। ইন্দোচীনের ফসলের শতকরা ৬৭ ভাগ এবং ভারতের শতকরা ৫১ ভাগ ফসলের উৎপত্তি ঘটেছে যথাক্রমে ইন্দোচীন আর ভারতে। সবচেয়ে মজার কথা এই যে, পৃথিবীর প্রধান ২০টি ফসলের একটিরও উৎপত্তিস্থল অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডা নয়। এরা সম্পূর্ণতই ফসলের জিন সম্পদের জন্য শতকরা ১০০ ভাগ নির্ভরশীল অন্য দেশ থেকে সংগৃহীত এসব জিন সম্পদের উপর।

পশ্চিম মধ্য এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো পৃথিবীর জিনসম্পদ তথা কৃষকের জাতের প্রধান ধারক। এ দুটি এলাকায় উৎপত্তি লাভ করা ফসল পৃথিবীর উৎপাদিত ফসলের দুইতৃতীয়াংশ দখল করে আছে। সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের কথা বিবেচনায় নিলে পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জিনসম্পদের শতকরা ৯৫ ভাগ এসেছে তৃতীয় বিশ্ব থেকে। জাপান ছাড়া বাকি শিল্পোন্নত দেশগুলোর অবদান মাত্র শতকরা ৫ ভাগ। মোটকথা অর্থনৈতিকভাবে দূর্বল কিন্তু জিনসম্পদে বিত্তবান দেশগুলোর জিনসম্পদ জমা পড়েছে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী কিন্তু জিনসম্পদে দূর্বল দেশগুলোর হাতে অর্থাৎ যার জিনসম্পদ তার হাত এখন আর পূর্ণ নয় অথচ যে জিনসম্পদের মালিক নয় তার হাত আজ এ সম্পদে পরিপূর্ণ। এ কারণেই কেবল বিতর্কের সৃষ্টি তা কিন্তু নয়। বিতর্কের উৎসটা বরং অন্যত্র।

আমাদের ফসলের মাঠ থেকে সংগৃহীত কৃষকের জাত ফসল উন্নয়নের কাজে ব্যবহার অবাধে করছে উন্নত বিশ্বের প্রাইভেট প্রজননবিদগণ। উন্নত বিশ্বে ফসল উন্নয়নের কাজ পরিচালিত হচ্ছে মূলত প্রাইভেট কোম্পানির তত্ত্বাবধান ও অর্থায়নে। এসব কোম্পানির প্রজননবিদগণ কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের কৃষকের জাত ব্যবহার করে ফসল উন্নয়নে কোনোভাবেই বাধাগ্রস্থ হচ্ছে না। অথচ এসব কোম্পানির অর্থায়নে তৈরি করা প্রজনন লাইন বা নতুন জাত বিনা পয়সায় কিছুতেই পাচ্ছে না তৃতীয় বিশ্বের কৃষকগণ। এমনকি প্রজনন লাইন নিয়ে গবেষণা চালিয়ে নতুন কোনো জাত তৈরি করবে সে অধিকারও পাচ্ছে না তৃতীয় বিশ্বের প্রজননবিদগণ। প্রাইভেট কোম্পানি তাদের উদ্ভাবিত জাত পেটেন্ট করে নিচ্ছে। চড়া মূল্য ছাড়া পেটেন্ট করা জাত ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই।

জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা (FAO) একথা বেশ জোরেই বলছে যে, কৃষকের জাততো বটেই এমনকি এসব জাত ব্যবহার করে যেসব প্রজনন লাইন তৈরি করা হয় সেসবও মানবকুলের সাধারণ সম্পদ। এসব কৃষকের জাত ফসল উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করা এবং উদ্ভাবিত জাত ভোগ করার অধিকারও সকলের সমান। এসব কথা যাদের জন্য বলা তারা যে এতে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে তা নয়। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো জিনসম্পদ হাতের কাছে পাবার জন্য যেভাবে এগিয়ে এসেছে এ থেকে প্রাপ্ত সুফল সকলের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে ঠিক ততটাই পিছিয়ে যাচ্ছে। এসব উন্নত দেশগুলো কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ কয়লা বা তেলের জন্য ঠিকই বিনিময় মূল্য প্রদান করে কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ কৃষকের জাতের জন্য কোনো মূল্য দিতে তারা নারাজ। অথচ তৃতীয় বিশ্বের জিনসম্পদ ছাড়া তাদের একদিনও চলে না এ কারণে যে তাদের নিজস্ব ফসল বা জিনসম্পদ বলে কিছু নেই। ১৯৯২ সালের পরিবেশ সম্মেলনে এ নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেয়া হলেও যুক্তরাষ্ট্রের অনমনীয়তার জন্য তা আর বাস্তবে রূপ নেয়নি।

৬. বাংলাদেশে ফসল উন্নয়নে কৃষকের জাত

বাংলাদেশে কৃষকের জাতের ব্যাপক আবাদ হয়েছে গত শতাব্দির ষাটের দশক পর্যন্ত। এদেশের কৃষকগণ তাদের নিজস্ব রুচি ও চাহিদার নিরিখে স্ব স্ব এলাকায় যাচাই বাছাই করে নির্বাচন করে নিয়েছেন হাজার হাজার ধানের জাত। বিশুদ্ধ লাইন জাত সৃষ্টি এবং

এদের বিস্তারের ফলে কৃষকের জাতের আবাদ কিছুটা হ্রাস পেলেও সত্তরের দশকে উচ্চ ফলনশীল ধানের আবাদ কৃষকের জাতের আবাদকে মারাত্মক রকম নিরুৎসাহিত করতে শুরু করে। আজ সারা দেশের ধানের আবাদি এলাকা খুঁজলে প্রায় ৫০০ রকম কৃষকের জাতের সন্ধান মিলবে কি-না সন্দেহ হয়।

সারণি ১.২ : বিভিন্ন রকম ধানের কয়েকটি কৃষকের জাতের উদাহরণ

কৃষকের জাত		
১. সর্বরিভোগ	১১. মধুশাইল	২১. বাঁশফুল
২. পঙ্খিরাজ	১২. রাঁধুনি পাগল	২২. বিন্নি
৩. বালুজুরি	১৩. হাঁসফুল	২৩. রাজভোগ
৪. বউপাগল	১৪. দুধকলম	২৪. চিনিগুড়া
৫. বেগুনবিচি	১৫. গাবুরা	২৫. চিনিসাগর
৬. সুলতান ভোগ	১৬. বাঁশি রাজ	২৬. হাতিশাইল
৭. দুলাল	১৭. মানিকদিয়া	২৭. রাঙামণি
৮. লক্ষীবিলাস	১৮. রাজফল	২৮. আগুনশাইল
৯. সাইঠা	১৯. মালভোগ	২৯. মাণিকরাজ
১০. মরিচফুল	২০. কনকচূড়া	৩০. পদ্ম

বাংলাদেশে ফসল উন্নয়নের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে গত শতাব্দির দ্বিতীয় দশকের শুরুতে। আর তা শুরু হয়েছে আমাদের প্রধান ফসল ধান এবং পাটকে নিয়েই। যথারীতি কৃষকের জাত সংগ্রহ এবং এদের মধ্য থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ লাইন তৈরি করাই ছিল প্রথম দিকের ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। আর এরকম নির্বাচনের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে আউশ, আমন আর বোরো ধানের বহু স্থানীয় উন্নত জাত (সারণি ১.৩, ১.৪, ১.৫ এবং ১.৬)।

সারণি ১.৩ : কৃষকের জাতে নির্বাচন পরিচালনা করে উদ্ভাবন করা আউশ ধানের কয়েকটি বিশুদ্ধ লাইন জাত

বিশুদ্ধ লাইন জাত	ছাড়করণের বছর	জীবনকাল (দিন)	ফলন (টন/হেক্টর)
কটকতারা	১৯২১	১০০	২.৫
সূর্যমুখী	১৯২৭	১০০	২.৪
পুখী	১৯৩০	৮৫	২.০
পানবিরা	১৯৩০	১০৫	২.৫
ধারিয়াল	১৯৩৬	৯০	২.৬
পাসপাই	১৯৪০	৮৫	২.০
মরিচবাটি	১৯৪১	৮৫	২.৪
হাসি কলমি	১৯৪৪	৮০	২.৪
হরিণমুদা	১৯৪৫	৮০	২.১
ধলা সাইট্যা	১৯৪৫	৮৫	২.৪

ধানের ক্ষেত্রে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিশুদ্ধ লাইনগুলোকে শ্রেণিভূক্ত করা হয়। আর বিশুদ্ধ লাইন নির্বাচন চলে এদের উচ্চ ফলনশীলতা, বিস্তৃত অভিযোজন ক্ষমতা আর গুণমানের উপর। আউশ এবং রোপা আমনের বিশুদ্ধ লাইনের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯২৫ সালে এসে ২০০০-এ। রোপা আমনের সর্বোত্তম বিশুদ্ধ লাইন ছিল ইন্দ্রশাইল, পাইকেরবার, লক্ষ্মী বিলাস, লম্বা চিকন, কান্দুলিয়া এবং লোহাডং। আর আউশের সর্বোত্তম বিশুদ্ধ লাইন ছিল কটকতারা, পাখি, সূর্যমুখী, চার্নক আর লার্কোচ। এসব বিশুদ্ধ লাইন থেকে ১৯১৮ সালে রোপা আমনের জন্য অবমুক্ত করা হয় ইন্দ্রশাইল জাতটি। এর তিন বছরের মাথায় অবমুক্ত করা হয় আউশের জাত কটকতারা।

ত্রিশের দশকে এসে আউশ এবং রোপা আমন ধানের বিশুদ্ধ সারির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০০০-এ। এ সময় আউশের আরও চারটি বিশুদ্ধ লাইন জাত - সূর্যমুখী, চার্নক, পুখি এবং আটলাই অবমুক্ত করা হয়।

সারণি ১.৪ : কৃষকের জাতে নির্বাচন চালিয়ে উদ্ভাবিত কিছুসংখ্যক রোপা আমন ধানের বিশুদ্ধ লাইন জাত

বিশুদ্ধ লাইন জাত	ছাড়করণের বছর	জীবনকাল (দিন)	ফলন (টন/হেক্টর)
ইন্দ্রসাইল	১৯১৮	১৮০	৩.৪
ঢেপি	১৯২৪	১৮০	৩.১
দুধসর	১৯২৪	১৬৫	৩.৩
যোশোবালাম	১৯২৪	১৮০	২.৭
হাতিশাইল	১৯৩০	১৮০	২.৭
ঝিঙ্গাশাইল	১৯৩০	১৬৫	৩.০
লতিশাইল	১৯৩৪	১৮০	৩.৪
রূপশাইল	১৯৪৫	১৬৫	২.৮
খিরাইজালি	১৯৩০	১৮০	২.৫
রাজাশাইল	১৯৪৫	১৫০	২.৪
বাঁশফুল	---	১৮০	৩.১
বাদশাহভোগ	১৯৩৬	১৭৫	২.৭

ঢাকা এবং বরিশাল দুটি স্থানেই রোপা আমনের গবেষণা চলছিল বিশুদ্ধ লাইন জাত তৈরির লক্ষ্য নিয়ে। রোপা আমন ধানের দশটি জাত অবমুক্ত করা হয় এ সময়। ধানের কৃষকের জাত ঢেপি, দুধর, তিলকাছড়ি, দাউদ খানি, যেশোবালাম, হাতিশাইল, জিংগাশাইল, চিংড়িগুসি, চিরাইউলি এবং বাঁশফুল অবমুক্ত করা হয়। আউশ ধানের কৃষকের জাতের মধ্যে বিশুদ্ধ লাইন নির্বাচনের কাজ চলেছে চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশক

ধরেও। একশ বিশুদ্ধ লাইনের অভিযোজ্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলো ঢাকা, ফরিদপুর আর বরিশালে। পটুয়াখালী নামক স্থানীয় একটি জাত অবমুক্ত করা হলো বাণিজ্যিকভাবে আবাদের জন্য। সাতচল্লিশে এসে আরও যেসব আউশের জাত অবমুক্ত করা হলো সেগুলো হলো পানবিরা, ধারিয়াল, কুমারী, পাসপাই, মরিচ বাটি, হাসিকলমি, হরিণমুদা ইত্যাদি। থেলোসাইটা জাত এবং খাসিয়া পাক্কা নামক আউশের জাত অবমুক্ত করা হয় ১৯৫৫ সালে। বিশুদ্ধ লাইন নির্বাচন থেকে পরবর্তীকালে আরও রোপা আমন জাত তৈরি করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে লতিশাইল, ব্লুস্টিক, নাইজারশাইল এবং রুবেইল।

ঢাকাস্থ কৃষি গবেষণা স্টেশনে বোনা আমন বা গভীর পানির ধান নিয়ে গবেষণা ঢাকা স্টেশনে শুরু করা হয় ১৯১৭ সালে। প্রায় ৭০০ লাইন তখন সংগ্রহ করা হয়, এর মধ্যে থেকে বিশবাইশ এবং গাবুরা জাত হিসেবে ছাড় করা হয়। ১৯৩৪ সালে গভীর পানির ধান এবং বোরোধানের গবেষণা করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় হবিগঞ্জ স্টেশন। এখানে ৪২৪টি বিশুদ্ধ লাইন সংগ্রহ করা হয়। ১৯৪৬ সালে কাতশবাগদার, গোদালাকি, গোওয়াই, দুধলাকি এবং ধলা আমন জাতগুলো গভীর পানির ধানের জাত হিসেবে ছাড় করা হয়। ১৯৫৫ সালে লাল আমন নামক আর একটি জাত ছাড় করা হয়।

সারণি ১.৫ : কৃষকের জাতে নির্বাচন চালিয়ে উদ্ভাবিত কিছুসংখ্যক বোনা আমন ধানের বিশুদ্ধ লাইন জাত

বিশুদ্ধ লাইন জাত	ছাড়করণের বছর	জীবনকাল (দিন)	ফলন (টন/হেক্টর)
বিশ বাইশ	১৯৪১	২৪০	২.৮
গাবুরা	১৯৪১	২২৫	২.৭
মালিয়াভাঙ্গার	১৯৪৩	২৫০	২.৬
গোদালাকি	১৯৪৬	২১৫	২.৯
গোয়াই	১৯৪৬	২৩০	২.৮
দুধলাকি	১৯৪৬	২২৫	২.৮
ধলা আমন	১৯৪৬	২৫২	২.৮
লাল আমন	১৯৫২	২৫০	২.৮

বোরো ধানের গবেষণা শুরু হয় হবিগঞ্জ স্টেশনে ১৯৩৫ সালে। সে সময় ৪২২টি লাইন সংগ্রহ করা হয়। তা থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে টৌপা বোরো, শাইল বোরো, খৈয়া বোরো, বোনাঝিরা এবং পশু শাইল ছাড় করা হয়। সারা দেশ থেকে আউশ, আমন এবং বোরো-এর কৃষকের জাত সংগ্রহের মাধ্যমে এবং নানা রকম যাচাই বাছাই

ও নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ লাইন জাত সৃষ্টির পাশাপাশি এসব বিশুদ্ধ লাইনের কোনো কোনোটিকে আবার সঙ্করায়ন কর্মসূচিতেও ব্যবহার করা হয়।

সারণি ১.৬ : কৃষকের জাতে নির্বাচন সম্পন্নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত কিছুসংখ্যক বোরো ধানের বিশুদ্ধ লাইন জাত

বিশুদ্ধ লাইন জাত	ছাড়করণের বছর	জীবনকাল (দিন)	ফলন (টন/হেক্টর)
টোপা বোরো	১৯৪২	১৫৫	২.৮
শাইল বোরো	১৯৪৩	১৫৫	২.৫
খৈয়া বোরো	১৯৪৪	১৫০	৩.০
বানাজিরা	১২৪৬	১৫৫	৩.০
পোষোশাইল	১৯৪৯	১৫৫	৩.০

ব্রি ধান ৫, ব্রি ধান ২২, ব্রি ধান ২৩, ব্রি ধান ২৫, ব্রি ধান ৩১, ব্রি ধান ৩৪ নামক জাতগুলো সৃষ্টির জন্য যে সংকরায়ণ করা হয় তার প্রত্যেকটিরই একটি প্রজনক ছিল কৃষকের জাত।

সারণি ১.৭ : ১৯১১-১৯৬০ পর্যন্ত ধানের স্থানীয় জাতের মধ্যে সঙ্করায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত কিছু ধানের জাত

জাত	পিতা-মাতার পরিচয়	ঋতু	ছাড়করণের বছর
পুসুর	পুখী × সূর্যমুখী	আউশ	১৯৪০
ধুলার	দুমাই × লার্কোচ	আউশ	১৯৪০
চিতরাজ	চিটাগাং ২২ × রাজশাহী ২২	রোপা আমন	১৯৪৪
ইশাশাইল	ইন্দ্রশাইল × পাটনাই ২৩	রোপা আমন	১৯৪৮
জিন্নাহশাইল	ঝিঙ্গাশাইল × লতিশাইল	রোপা আমন	১৯৪৮
লিয়াকতশাইল	লতিশাইল × দুধসর	রোপা আমন	১৯৫৬
হবিগঞ্জ A VI	ধলাআমন × জোরা	---	১৯৫০
হবিগঞ্জ A VII	লাকি × গোয়াই	---	১৯৫১
হবিগঞ্জ B VII	খৈয়া বোরো × বিজয়শাইল বোরো	বোরো	১৯৫০
হবিগঞ্জ B VIII	টোপা বোরো × বাঁশফুল	বোরো	১৯৫১

কৃষকের জাতের বৈশিষ্ট্যগুলো জানা সম্ভব হলে আগামী দিনগুলোতে এদের আরও বেশি করে ফসল উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। স্থানীয় জাতগুলোতে বিশুদ্ধ

লাইন নির্বাচন পরিচালনার পাশাপাশি এদের মধ্যে কিছু কিছু সঙ্করায়ন করা হয়। ১৯০১-১৯৬০ এ সময়কালে বিভিন্ন ঋতুর জন্য সঙ্করায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট ধান জাতের সংখ্যা ছিল ১১ টি (সারণি ১.৭)।

পাট বরাবরই এদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রধানতম অর্থনৈতিক ফসল সোনালি আঁশ পাটকে নিয়ে তাই গবেষণা শুরু হয়েছে সেই গত শতাব্দির শুরুতেই। সরকারের কৃষি বিভাগে 'আঁশ বিশেষজ্ঞ' হিসেবে যোগ দেন ইংরেজি বিজ্ঞানী আর এস ফিনলো (Finlow)। প্রায় ২৫ বছর তার নেতৃত্বে চলে পাট উন্নয়ন কর্মসূচি। পাটের ক্ষেত্রেও কিন্তু দেশের নানা অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা দেশি পাটের জাতে নির্বাচন সম্পন্নের মাধ্যমে উৎকৃষ্টটিকে জাত হিসেবে অবমুক্ত করা হয়। পাট জাত সৃষ্টির গোড়ার দিকে মিশ্র জাত থেকে একটি দুটি উৎকৃষ্ট লাইনকে আলাদা করে নিয়ে নতুন জাত সৃষ্টি করা হয়েছে।

এদেশে একসময় নানা রকম বৈচিত্র্যময় পাটের জাতের আবাদ হতো। এক হিসাবে দেখা যায় পাটের কৃষকের সৃষ্ট জাতের সংখ্যা ছিল ৫০০-র অধিক। ফলে অনুমান করা চলে এসব কৃষকের জাত সংগ্রহ করেই শুরু হয়েছে পাট ফসলের উন্নয়নের কাজ। পাবনার সিরাজগঞ্জ থেকে সংগৃহীত বীজে নির্বাচন চালিয়ে পাওয়া যায় 'কাকিয়া বোম্বাই' সাদা পাটের জাতটি। এ জাতটিতে পরবর্তীকালে নির্বাচন সম্পন্নের মাধ্যমে ১৯১৬ সালে রাজশাহীতে তৈরি হয় আর- ৮৫ জাত। তার তিন বছর পর ঢাকায় 'কাকিয়া বোম্বাই' জাতের মিশ্রণ থেকে আবার নির্বাচন সম্পন্নের মাধ্যমে পাওয়া যায় ডি-১৫৪ জাতটি। তোষা পাটেও জাত উদ্ভাবন শুরু হয় এদেশের কৃষকের জাত থেকেই। 'চিনসুরা গ্রীন' নামক জাত থেকে ঢাকায় তৈরি করা হয় ডি-৩৮ জাতটি ১৯১৫ সালে। রাজশাহীর স্থানীয় জাত থেকে বাছাই করে নেয়া হয় লাল কাণ্ডবিশিষ্ট আর-২৬ এবং কিছুদিন পর আর একটি জাত আর-২৭। এরকম স্থানীয় জাত থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে পাওয়া গেছে ও-১, ও-২, এবং ও-৩ জাতগুলো যথাক্রমে উনচল্লিশ, চল্লিশ ও চল্লিশে।

স্থানীয় জাত থেকে ঢাকায় ১৯৩৯ ও ১৯৪১ সালে তৈরি করা হয় সাদা পাটের আরও দুটি জাত। স্থানীয় জাতে নির্বাচন করে পাওয়া যায় সি-১ ও সি-২ জাত দুটি। উত্তরবঙ্গ থেকে সংগ্রহ করা নলডগ দেশি জাত থেকে নারায়ণগঞ্জেও ১৯৪২ সালে নির্বাচন করা হয় বেশ আগাম এবং দ্রুত বর্ধনশীল জাত সি-৩। জলপাইগুড়ি থেকে সংগ্রহ করা হেউতি জাত থেকে একই বছর নির্বাচন করা হয় তিনটি জাত। মূলত মিশ্রিত জাত থেকে বিশুদ্ধ জাত বাছাই করে পাওয়া যায় এসব পাটের জাত।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে পাটের জাত উন্নয়নের কাজ সীমাবদ্ধ থেকেছে মূলত পাটের স্থানীয় জাত সংগ্রহ করা ও নির্বাচনের মধ্যেই। এক হিসেবে দেখা যায় যে, স্বাধীনতার পূর্বে দেশি ও তোষা পাট মিলে এদেশে বাছাই করে অবমুক্ত করা জাতের সংখ্যা বারটি। এমনকি সাতাত্তরে এসে সাদা পাটের দেশি জাতে নির্বাচন করে অবমুক্ত করা হয় দুটি জাত সিভিএল-১ (সবুজ পাট) এবং সিভিই-৩ (আশু পাট)।

কেবল ধান আর পাটের ক্ষেত্রেই নয়, কৃষকের জাতে নির্বাচন চালিয়ে উন্নততর জাত সৃষ্টি করা হয়েছে অন্য ফসলেও। রাই সরিষার রাই- ৫ জাতটি নির্বাচন করা হয়েছে (সারণি ১.৮) স্থানীয় একটি কৃষকের জাত থেকে। বারি সরিষা- ৬ (ধলী) নামক জাতটিও নির্বাচন করা হয়েছে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত একটি স্থানীয় জাত থেকে। স্বল্পমেয়াদি সবচেয়ে জনপ্রিয় 'টরি ৭' সরিষার জাতটিও দেশি জাতের সরিষাতে যাচাই বাছাই করার ফল। "নীলা" নামক তিসির জাতটিও পাওয়া গেছে একইভাবে। বাংলাদেশে যে বেগুনের আবাদ হচ্ছে এখন তারও একটি বড় অংশ দখল করে আছে কৃষকের মেধা আর মননের অনন্য স্বাক্ষর হিসেবে পাওয়া দেশি জাতগুলো। আমাদের অতি চেনা ইসলামপুরী, শিংনাথ, খটখটিয়া, দোহাজারী, ঈশ্বরদী, মুক্তকেশী, তাল্লা, মগবাজারী, কুলি ইত্যাদি জাত এখনও বেশ জনপ্রিয় কৃষকের নিকট। বেগুনে দেশি জাতগুলো সাদরে বংশপরম্পরায় বয়ে চলেছেন আমাদের সবজি চাষীরা। আকার আকৃতি আর স্বাদের দিক থেকে এত ভিন্ন রকম বেগুন পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

সারণি ১.৮ : কৃষকের জাতে নির্বাচন পরিচালনা করে বিভিন্ন ফসলের জাত সৃষ্টি

জাতের নাম	জাত সৃষ্টি	অনুমোদনের বছর	প্রতিষ্ঠান
১। সরিষা			
বারি সরিষা-৬ (ধলি)	ধলি	১৯৯৪	বিএআরআই
উন্নত টরি - ৭	সংগৃহিত সরিষা জাত	১৯৭৬	বিএআরআই
SS - 75 (সোনালী সরিষা)	সংগৃহিত সরিষা জাত	১৯৭৯	বিএআরআই
দৌলত	সংগৃহিত সরিষা জাত	১৯৮৮	বিএআরআই
২। তিল			
টি - ৬	সংগৃহিত সরিষার জাত	১৯৭২	বিএআরআই
৩। গর্জন তিল			
শোভা (মিগ-১)	জার্মপ্লাজম সংগ্রহ	১৯৮৮	বিএআরআই
৪। তিসি			
নীলা (লিন- ১)	জার্মপ্লাজম সংগ্রহ	১৯৮৮	বিএআরআই
৫। কুসুম ফুল			
স্যাফ- ১	জার্মপ্লাজম সংগ্রহ		বিএআরআই

কৃষকের বাছাইকৃত জাত ব্যবহার করে এদেশে আবাদ হচ্ছে বহু ফসল। মিষ্টি আলু, কচু, ডাঁটা, সজিনা, বরবটি, পটল, ধুন্দুল, লাউ, কুমড়াসহ বহু সবজি ফসলে

এখনও কৃষকের প্রধান নির্ভরতা দেশি জাতগুলোর উপরই। ফল ফলাদির ক্ষেত্রে একথা আরো বেশি করে সত্য : কলা, আনারস, আম, কাঁঠাল, লেবু, বেল, জাম, আতা আর শরীফাসহ অনেক প্রধান ও অপ্রধান ফল গাছের আবাদি জাতগুলো এদেশের কৃষকের নির্বাচিত জাত। ভিন্ন দেশি কিছু ফলের জাত প্রবর্তন ছাড়া এসব ফসলে এখনও গুরুত্বসহকারে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া হয়নি।

অনেক কৃষকের জাতে রয়েছে অনেক সম্ভাবনা। কোনো কোনো এলাকায় এদের আবাদ করাও সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ফসলের স্থানীয় জাতগুলো সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো। যাচাই বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে যাদের উত্তম মনে হবে এদের আজও জন্মানো সম্ভব পরিকল্পিত উপায়ে। তাছাড়া ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এদের যে অধিকতর হারে ব্যবহার করা হবে আগামীতে তা সহজেই অনুমান করা চলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফসল ও ফসলের জাত প্রবর্তন

পৃথিবীতে আজ যত রকম ফসল দেখা যায় সেগুলোর উৎপত্তি ঘটেছে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। সেই আদিকাল থেকেই যাযাবরী মানুষ তাদের আবাস বদলের সময় অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সঙ্গে সঙ্গে বয়ে নিয়ে গেছে তাদের চেনা জানা গাছ-গাছালির বীজও। এভাবে এক স্থানের ফসল চলে গেছে অন্য স্থানে। কখনও দেশের গণ্ডি পেরিয়ে অন্য দেশে এবং কখনও আবার অন্য মহাদেশেও। সমুদ্রচারী, ভ্রমণকারী, পাদ্রী, উদ্যান প্রেমিক, অভিযাত্রী, বণিক, শাসক ইত্যাদি নানা রকম লোকজনের মারফত এক স্থানের ফসল চলে গেছে অন্য স্থানে। কখনও ইচ্ছায় ঘটছে এ ঘটনা কখনো বা অনিচ্ছায়। এভাবে এক দেশের কোনো কোনো ফসল অন্য দেশের প্রধান ফসল হয়ে উঠেছে। এক মহাদেশের ফসল অন্য মহাদেশে জেঁকে বসেছে।

এসব ঘটনা ঘটেছে বেশ আগে থেকেই। এরই ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা গেছে গত শতাব্দিতেও। তবে গত শতাব্দিতে ফসল আর নানা ফসলের জাত বা প্রাগ্রসর বংশধর (advanced generations) তথা লাইনগুলোর প্রবর্তন কর্মকাণ্ড ছিল অনেক বেশি নিয়মতান্ত্রিক। আর একাজে মূল ভূমিকা পালন করেন উদ্ভিদ গবেষক এবং কিছু কিছু উদ্ভিদ প্রেমিক ও নিসর্গী। দ্বিপাক্ষিক চুক্তির অধীন কিংবা কারিগরি সহযোগিতার অংশ হিসাবেও আদান প্রদান ঘটেছে বহু উদ্ভিদ প্রজাতির। কখনো 'পৃথিবীর সম্পদ' এই অজুহাতে পৃথিবীর নানা স্থান থেকে ফসলের মূল্যবান জিনসম্পদ নিয়ে নেয়া হয়েছে এক দেশ থেকে অন্য দেশে।

দান বা অনুদান হিসেবে কখনও কখনও পাওয়া সম্ভব হয়েছে কোনো কোনো ফসলের জিনসম্পদে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দান করতে পারে এসব মূল্যবাদ সম্পদ। জিনসম্পদ ক্রয় বিক্রয় করবার রেওয়াজও ইতোমধ্যে চালু হয়ে গেছে। একেবারেই কোনো ফসলের জিনসম্পদ না পেলে তার উৎপত্তির কেন্দ্র থেকে এসব সম্পদ সংগ্রহ করবার জন্য অভিযান পরিচালনা করারও রেওয়াজ রয়েছে। তবে বিগত দিনগুলোতে কাজটি যত সহজ ছিল এখন আর তা অতটা সহজ নয়।

যেসব ফসল আর ফসলের জাত প্রবর্তন করা হয়েছে এক দেশ থেকে তাদের সকলেই যে ফসলের জাত সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে তা নয়। তবে যেসব ফসলের জাত নতুন স্থানে এসে চমৎকারভাবে মানিয়ে নিয়েছে এবং উত্তম ফলন দিতে সক্ষম হয়েছে তেমন সব জাত সারাসরি ফসলের জাত হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে আবাদের সুযোগ পেয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রবর্তিত জাতের মধ্যে নির্বাচন চালিয়ে কাঙ্ক্ষিত প্রকৃতির উদ্ভিদকে তুলে নেয়া সম্ভব হয়েছে। তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে নতুন জাত।

কখনও আবার প্রবর্তিত জাতকে মাতা বা পিতা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সঙ্করায়ন কর্মসূচিতে। প্রবর্তিত জাতের জিনের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে ফসলের স্থানীয় জাতের জিনের। বংশানুক্রমে চলেছে যাচাই বাছাই। উত্তম বলে বিবেচিত হলে সে উদ্ভিদ থেকে বীজের পরিমাণ বাড়িয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে নতুন ফসলের জাত। আজ নয় কিন্তু আগামীতে ব্যবহৃত হতে পারে এ উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত অনেক প্রজাতি বা ফসলের জাত সংরক্ষিত হয়েছে পৃথিবীর নানা দেশের জিন ব্যাংকে।

প্রবর্তিত অনেক ফসল রয়েছে যা কখনও একটি দেশে এর আগে আবাদই করা হয়নি। এমনি অনেক ফসল একেবারে নতুন ফসল হিসেবে অনেক দেশে আবাদ করা শুরু হয়েছে। নতুন এলাকায় ফসলটি অভিযোজিত হতে পারলে এবং এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব থাকলে তা সেই প্রবর্তিত এলাকার ফসল হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। ভুট্টা, গোলআলু, টমেটো এমনি কত কত ফসল গত শতাব্দিতেও অনেক দেশে নতুন ফসল হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। এসব ফসলের সমাদর এখন অনেক বেশি।

১. দেশে দেশে উদ্ভিদ প্রবর্তন

এক স্থান থেকে কৌলিসম্পদ সংগ্রহ করে পৃথিবীর অন্য স্থানে অন্য দেশে অন্য মহাদেশে তা ব্যবহার করার ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। তবে গত শতাব্দিতে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাতের আবাদ বৃদ্ধি পাওয়ায় ফসলের জিনসম্পদ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে সবচেয়ে বেশি সংগ্রহ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। মূলত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জিনসম্পদ সংগ্রহ অভিযান চলেছে অবাধে এ কারণে যে, এসব দেশেই রয়েছে ফসলের জিনসম্পদের মূল ভাণ্ডার। ইউরোপ অভিযানকারীরা ভুট্টা আর গোলআলু নিয়ে এসেছে আমেরিকা মহাদেশ থেকে। উনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ একটি উদ্ভিদ অনুসন্ধান সেকশনই চালু করে। বিংশ শতাব্দিতে যুক্তরাষ্ট্রের চারটি এলাকায় উদ্ভিদ প্রবর্তন স্টেশন চালু করা হয় ফসলের নানা জাত - উপজাত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মূল্যায়ন ও কৃষকের নিকট তা সহজলভ্য করার জন্য। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নানা ফসল এবং এদের মূল্যবান জিনসম্পদ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এর তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, তাদের নিজের দেশে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আবাদি ফসলের উৎপত্তি ঘটেনি। ফলে অন্য দেশ থেকে ফসল প্রবর্তন করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় ছিল না। দ্বিতীয়ত, এক সময় যে পৃথিবী জুড়ে জিনসম্পদের একটি তীব্র সংকট শুরু হবে একথা তারা জানে। চাইলেও বিনা পয়সায় জিনসম্পদ পাওয়ার সুযোগ তখন থাকবে না। অন্য যে কোনো জাতির চেয়ে চিন্তা চেতনায় অনেক বেশি দূরদর্শী বিধায় তারা পৃথিবীর যেখানে যা জিনসম্পদ পেয়েছে তা সংগ্রহ করেছে। তৃতীয়ত, বিশ্বব্যপী ফসলের কৌলিসম্পদ সংগ্রহ অভিযানের দলে সবসময় কমপক্ষে একজন আমেরিকান সদস্য থেকেছে বলে পৃথিবীর সব স্থান থেকে তারা এসব সম্পদ সংগ্রহ করার সুযোগ পেয়েছে।

পশ্চিম মধ্য এশিয়ার আবাদি ফসলের শতকরা ৭০ ভাগ ফসলের আবাদিকরণ করা হয়েছে সেসব দেশে। গম এবং দানাদার শিমজাতীয় ফসল এদের মূল ফসল।

অন্যদিকে আফ্রিকাতে আবাদ হচ্ছে এমন ফসলের মাত্র শতকরা ১২ ভাগের আবাদিকরণ করা হয়েছে আফ্রিকায়। সরগম আর গো-শিম হলো এ এলাকার নিজস্ব ফসল। এক হিসাবে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়ার আবাদি ফসলের শতকরা ৮২ ভাগের উৎপত্তি ঘটেছে পশ্চিম মধ্য এশিয়ায়। এসব ফসলের মধ্যে রয়েছে মূলত গম এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র দানাদার ফসল। আফ্রিকাতে আবাদ হচ্ছে যেসব ফসল-এর শতকরা ৫২ ভাগ ফসল এসেছে ল্যাটিন আমেরিকা থেকে। এসব ফসলের মধ্যে রয়েছে মূলত ভুট্টা, নানা রকম শিম ফসল এবং ক্যাসাবা। পৃথিবীর বিশটি গুরুত্বপূর্ণ ফসলের কোনোটিরই উৎপত্তিস্থল উত্তর আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়া নয়।

গত শতাব্দির চল্লিশ, পঞ্চাশ, যাট এবং সত্তরের দশকে অবাধে কৌলিসম্পদ বিনিময় ঘটেছে। জাপানের Norin 10 জাতের খর্বাকৃতি গম জাতটি জাপান থেকে আমেরিকা আসে ১৯৪৬ সালে। এ জাতটিকে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক সঙ্করায়ন কর্মসূচিতে ব্যবহার করা হয়। এরই কিছু লাইন চলে যায় মেক্সিকোতে। মেক্সিকোর দেশি জাতের সঙ্গে এর সঙ্করায়ন করে তৈরি করা হয় আধা-খর্বাকৃতির উচ্চ ফলনশীল গম জাতগুলো। এসব জাত আবার প্রবর্তন করা হয় ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশে। একইভাবে IRRI থেকে ধানের খর্বাকৃতির জাত চলে আসে ভারত, পাকিস্তানসহ নানা দেশে।

আন্তজার্তিক কৌলিসম্পদ বিনিময়ের কিছু সুবিধাও রয়েছে। কোনো এলাকায় কোনো একটি ফসলে কোনো নতুন রোগজীবাণু বা কীটপতঙ্গের আক্রমণ দেখা দিলে কৌলিসম্পদ বিনিময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ১৯৪৯ সালে পশ্চিম আফ্রিকায় হঠাৎ ভুট্টা ফসলে মরিচা (rust) রোগ দেখা দেয়ায় ভুট্টার ফলন ভীষণ রকম কমে গেল। পূর্ব আফ্রিকায় এ রোগটি দেখা দেয় ১৯৫২ সালে। কেনিয়ার উদ্ভিদ প্রজননবিদেরা পূর্ব আফ্রিকার ৬৮ টি ভুট্টার লাইন যাচাই করেও রোগ প্রতিরোধী লাইন পেতে ব্যর্থ হন। এ রোগের উৎপত্তিস্থল হলো মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকা। মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় ভুট্টার লাইন কেনিয়াতে প্রবর্তন করে ২০৩ টি লাইনের মধ্যে ৪৫টি রোগ প্রতিরোধী লাইন পাওয়া গেল। অত:পর ক্রসিং ও ব্যাকক্রসিং করে রোগ প্রতিরোধী জিন সংযোজন করা হলো উত্তম জাতগুলোতে, আর তা ১৯৫৬ তে কৃষকের জন্য বাজার-জাত করা হলো।

প্রবর্তিত কৌলিসম্পদ যেসব সময় প্রবর্তনের পরপরই ফসল উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়েছে তা নয়। অনেক কৌলিসম্পদ জিন ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হয় ভবিষ্যতে ব্যবহার করা হবে এ উদ্দেশে। ফলে জিনসম্পদ দেশে প্রবর্তন করা হলে সাধারণভাবে অনেক দেশেই তা জাতীয় জিন ব্যাংকে এক কপি জমা দেয়া আবশ্যক। আশির দশকের এক হিসাবে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল প্লান্ট জার্মপ্লাজম সিস্টেমে (NPGS) সংগৃহীত কৌলিসম্পদের সংখ্যা চার লক্ষ। বীজ ফসল এবং অঙ্গজ ফসল দু'রকমেরই জিনসম্পদ এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করা এসব জিনসম্পদ মূলত কৃষকের জাত এবং অনুন্নত জার্মপ্লাজম। প্রতিবছর এ জিন ব্যাংকে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে সাত থেকে পনের হাজার নতুন কৌলিসম্পদ।

২. বাংলাদেশে উদ্ভিদ প্রবর্তন

বাংলাদেশে প্রবর্তন আর নির্বাচন ফসল উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন ফসলের যত জাত সৃষ্টি হয়েছে তার সিংহভাগই কেবল হয় সরাসরি প্রর্বতন নয়তো প্রর্বতন আর নির্বাচন অথবা প্রবর্তন আর সঙ্করায়নের মাধ্যমে। ধানের কথা দিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক। ধান এ অঞ্চলের একটি আদি ফসল। ধানকে অবলম্বন করে আবর্তিত হয়েছে এদেশের কৃষি। কিন্তু ধানের স্থানীয় জাতের উপর নির্ভর করে চাহিদানুযায়ী ফলন পাওয়া যখন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তখনই অন্য দেশ থেকে ধানের জাত নিয়ে আসার কথা উঠেছিল। যে আমেরিকা নিজেই অন্য দেশ থেকে তার সব ফসল প্রবর্তন করে নিয়েছে আবাদের জন্য, এদেশে বৃটিশ আমলেই সেই আমেরিকা থেকে ধানের জাত প্রবর্তন করা হয়।

২.১. ধান প্রবর্তন

আমেরিকা থেকে ১৯৩৪ সালে 'ব্লুস্টিক' নামক একটি জাত প্রবর্তন করা হয় । এটি এদেশে অভিযোজনক্ষম হওয়ায় তা আমাদের জন্য রোপা আমনের জাত হিসেবে অবমুক্ত করা হয় ১৯৩৮ সালে। নাইজেরিয়া থেকে এ দেশে ১৯৩৫ সালে নিয়ে আসা হয় 'নাইজারশাইল' জাতটি। রোপা আমনের জাত হিসেবে এটি বাজারজাত করা হয় ১৯৪৪ সালে। বায়ান্নের পর থেকে পৃথিবীর ধান উৎপাদনকারী বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবর্তন করা হয় নানা রকম ধানের জাত। (সারণি ২.১)।

সারণি ২.১ : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে ধানের জাত প্রবর্তন

জাতের নাম	উৎপত্তিস্থল	অবমুক্তির বছর	প্রতিষ্ঠানের নাম
ব্লুস্টিক	আমেরিকা	১৯৩৮	---
নাইজারশাইল	নাইজেরিয়া	১৯৪৪	---
তাইচুং - ৬৫	তাইওয়ান	---	---
তাইপি ১ - ১৭৭	তাইওয়ান	---	---
ইয়াবানি ৪৭	মিশর	---	---
ইয়াবানি পার্ল	মিশর	---	---
এমেরিকানো ১৬৩৬	ইটালি	---	---
কুলোসা	ইটালি	---	---
আরডিটো	ইটালি	---	---
কলোরো	অস্ট্রেলিয়া	--	---

জাপান, তাইওয়ান, মিশর, ইটালি, অস্ট্রেলিয়া এমনি নানা দেশ থেকে প্রবর্তন করা হয় ধানের জাত। এদের কোনো কোনোটি বেশ ভাল দক্ষতা প্রদর্শন করে আমাদের জলবায়ুতে।

ধানের দুটি ইকোটাইপ হলো ইন্ডিকা আর জাপোনিকা। জাভানিকা নামেও আর একটি ইকোটাইপ রয়েছে ধানের। ইন্ডিকা আর জাপোনিকার মধ্যে সঙ্করায়ন ঘটিয়ে মালয়েশিয়ায় তৈরি হয় 'মালিঞ্চা' আর 'মাসুরি' জাতটি। বাংলাদেশে প্রবর্তনের পর এর নতুন নামকরণ করা হয় 'পাজাম'। পাকিস্তান থেকে আনা হয় বলে Pakistan এর Pa, জাপানিরা এটি নিয়ে আসে বলে Japan এর Ja আর মালয়েশিয়া থেকে আনা হয় বলে Malaysia এর M মিলে এর নাম হয় Pajam। বাংলাদেশে তিনটি ধানের ঋতুতে এটি আবাদ হচ্ছে এখন।

১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর চীন থেকে এদেশে 'চেন-চু-আই' নামক একটি জাত নিয়ে আসেন। পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের 'Purba' আর China এর 'Chi' মিলিয়ে এর নামকরণ করা হয় পূর্বাচী (Purbachi)। সেসময় আউশ এবং বোরো ঋতুতে এর ব্যাপক আবাদ করা হয় ।

ধান উন্নয়নের যে বিশাল অগ্রগতি বাংলাদেশে সাধিত হয়েছে তাতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে ইরি কর্তৃক উদ্ভাবিত খর্বাকৃতির ধানের জাতের প্রবর্তন। এদেশে কখনও প্রবর্তিত লাইন সরাসরি আবার কখনও প্রবর্তিত লাইনের মধ্যে নানা রকম যাচাই বাছাই আবার কখনও স্থানীয় জাতের সঙ্গে প্রবর্তিত জাতের সঙ্করায়ন ও নির্বাচন পরিচালনা করে নানা রকম উচ্চ ফলনশীল জাত সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রাপ্ত খর্বাকৃতির জিন পরবর্তীকালে ব্যবহার করা হয়েছে এদেশের প্রায় প্রতিটি উফশী জাতে।

১৯৬৬ সালে ইরি থেকে ৩০৩ টি পুরোগামী প্রজনন লাইন এদেশে নিয়ে আসা হয়। এসব লাইনের মধ্যে IR8- 288-3 লাইনটি উত্তম ফলাফল প্রদান করে। এ লাইনটি এদেশে ইরি 'IR 8' নামে আবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়। এদেশে USAID এর সহযোগিতায় এ জাতের ১০০ কেজি বীজ নিয়ে আসা হয় । বোরো ঋতুতে এ জাতটি ১৯৬৭-৬৮ তে হেক্টর প্রতি ৮ টন ফলন দেয়। এজাতটি প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে এদেশের ধান উন্নয়নে এক নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয়। পরবর্তীকালে IR 5 এবং IR 20 জাত দুটি সরাসরি প্রবর্তন করে এদেশেও একই নামে নতুন জাত হিসেবে অবমুক্ত করা হয়।

ইরি লাইন থেকে যাচাই-বাছাই করেও বেশ কিছু জাত সৃষ্টি করা হয়েছে ধানে। BRRI-র প্রথম জাত দুটি- মালা আর চান্দিনা কিন্তু ইরি লাইনের নির্বাচনের ফলাফল। BRRI -র তৃতীয় জাতটি কিন্তু সৃষ্টি করা হয়েছে BRRI তে একটি ইরি লাইনের সঙ্গে লতিশাইল নামক স্থানীয় জাতের সঙ্করায়নের মাধ্যমে। এভাবে কখনও স্থানীয় জাতের সঙ্গে ইরি লাইন, কখনও ইরি লাইনের সঙ্গে অন্য ইরি লাইন, আবার কোনো উদ্ভাবিত জাতের সঙ্গে ইরি লাইনের মধ্যে সঙ্করায়ন ঘটিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে বিভিন্ন উফশী জাতের ধান।

ধানের ক্ষেত্রেও প্রবর্তন যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে সে বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবর্তিত ধানের কৌলিসম্পদে নানা পর্যায়ে মিউটেশন ঘটিয়েও সৃষ্টি করা হয়েছে একাধিক ধানের জাত। ইরি-৮ জাতে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্নের মাধ্যমে পাওয়া গেছে ইরাটম-২৪ জাতটি। আবার 'ইরাটম-২৪' জাতের সঙ্গে স্থানীয় জাত 'দুলার' এর সঙ্করায়ন ঘটিয়ে এবং গামারশ্মি প্রয়োগ করে সৃষ্টি করা হয়েছে

'বিনাধান-৬'। একইভাবে বি আর ৪ এর সাথে ইরাটম-৩৮ লাইনের সঙ্করায়ন ও F_2 বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পাওয়া গেছে বিনাধান-৪।

২.২. গম প্রবর্তন

বাংলাদেশে গম উন্নয়নের ইতিহাসও মূলত প্রবর্তনেরই ইতিহাস। ষাটের দশকের শেষ দিকে আর সত্তর দশকের গোড়ার দিকে গ্রীষ্ম ঋতুতে ধানের ফলনহ্রাস পাওয়ায় বিকল্প দানাশস্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। বাংলাদেশে স্বাধীনতা উত্তরকালে গম গবেষণায় সত্যিকার অর্থে তেমন কোনো পরিকল্পিত কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করা যায়নি। পয়ষট্টিতে মেক্সিকোর দুটি গম জাত- Penjamo 62 এবং Sonora 64 এদেশে প্রবর্তন করা হয় এবং এদের ফলন মোটামুটি ভাল দেখা যায় বলে আবাদের জন্য জাত দুটি কৃষকের জন্য অবমুক্ত করা হয়। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত এদেশে মেক্সিকো, ভারত ও পাকিস্তান থেকে গমের নতুন নতুন জাত প্রবর্তন করা হয়। উত্তম জাত নির্বাচন করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত গমের জাতসমূহ সেচযুক্ত ও সেচহীন পরিবেশে জন্মানো হয়। এসব যাচাই-বাছাই থেকে আটটি জাত অত:পর অবমুক্ত করা হয়।

এদেশের গম উন্নয়নের ইতিহাস মূলত প্রবর্তন আর নির্বাচন নির্ভর বিষয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মেক্সিকোর CIMMYT থেকে প্রবর্তন করা গমের লাইনসমূহে নির্বাচন পরিচালনা করে ১৯৭৯ সালে পাভন, ১৯৮৩ সালে বরকত, ১৯৮৭ সালে সওগাত ও প্রভাতী ১৯৯৩ আর ১৯৯৮ সালে যথাক্রমে সৌরব আর গৌরব নামক গমের জাত এদেশে আবাদের জন্য নিবন্ধন করা হয়।

২.৩. ভুট্টা প্রবর্তন

এদেশে ভুট্টার আবাদ শুরু হয়ে অন্য দেশ থেকে ভুট্টার জাত প্রবর্তনের মাধ্যমে। ১৯৮৫ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইল্যান্ড থেকে ৫০০ টন ভুট্টা বীজ আনা হয়। এর মাধ্যমে ভুট্টা চাষ শুরু হয় সে সময়। এরপর নানা দেশ থেকে প্রাপ্ত ভুট্টার কৌলি সম্পদ এদেশে নিয়ে এসে বিভিন্ন কৃষি প্রতিবেশিক অঞ্চলে জন্মানো হয়। এসব যাচাই-বাছাই থেকে অত:পর সম্ভাবনাময় আটটিকে নির্বাচন করা হয়। এরপর এদেশে কয়েক বংশধর আবর্তিত নির্বাচন চালিয়ে এদের উন্নয়ন সাধন করা হয়।

১৯৮৬ সালে 'বর্ণালী' আর 'সৌরভ' নামে দুটি ভুট্টার জাত এখানে অবমুক্ত করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন সময়ে CIMMYT থেকে বেশ কিছু ভুট্টার লাইন প্রবর্তন করা হয়। ১৯৯১ সালে 'মোহর' নামের একটি জাত অবমুক্ত করা হয় প্রবর্তিত লাইনে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্নের মাধ্যমে। একইভাবে অবমুক্ত করা হয় বারি ভুট্টা ৬ ও বারি ভুট্টা ৭। এমন কি বারি হাইব্রিড ১, ২ আর ৩ এরও মূল লাইনগুলো প্রবর্তন করা হয়েছে যথাক্রমে থাইল্যান্ড ও মেক্সিকো থেকে।

২.৪. তেল ফসল প্রবর্তন

আমাদের দেশে সরিষার আবাদ হচ্ছে প্রধানত কৃষকের জাত 'টরি-৭' ব্যবহার করে। তবে এ ফসলেও অল্প ক'টি জাত সৃষ্টি করা হয়েছে বিদেশ থেকে কৌলিসম্পদ নিয়ে

এসে তার উপর নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্নের মাধ্যমে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের 'দৌলত' নামক রাই সরিষার জাতটি বাছাই করে নেয়া হয়েছে ভারত থেকে প্রাপ্ত কৌলিসম্পদ থেকে। এমন কি ২০০০ সালে অবমুক্ত জাত বারি সরিষা-১০ এবং এর পরের বছর অবমুক্ত জাত বারি সরিষা-১১ জাত দুটি এসেছে নানা রকম কৌলিসম্পদ থেকে নির্বাচনের মাধ্যমেই। (সারণি ২.২)।

চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে প্রবর্তিত কৌলিসম্পদে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্নের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮১ সালে উদ্ভাবিত হয় 'সম্পদ'। 'বারি সরিষা ৯' পাওয়া গেছে ভারতের আর একটি জাত থেকে, বারি সরিষা ৭ আর ৮ পাওয়া গেছে দেশি ও বিদেশি একাধিক প্রজাতির মধ্যে সঙ্করায়ন করে। কিন্তু এর সঙ্করায়ন কাজটি সম্পন্ন হয় সুইডেনে। আমাদের কয়েকটি দেশি জাতের সঙ্গে বিদেশের কয়েকটি জাতের মধ্যে সঙ্করায়ন ও নির্বাচন চালিয়ে পাওয়া গেছে জাত দুটি। তেল ফসলের মধ্যে সয়াবিনের যে ক'টি জাত এখানে অবমুক্ত করা হয়েছে তার সব ক'টিরই উৎস হলো প্রবর্তিত জাত। যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরাসরি ১৯৮১ সালে প্রবর্তন করা হয় Bragg এবং Davis জাত দুটি; ১৯৯১ সালে অবমুক্ত করা 'সোহাগ' জাতটি এসেছে কৌলিসম্পদ সংগ্রহ ও তাতে নির্বাচন চালিয়ে। ২০০২ সালে অবমুক্ত 'বারি সয়াবিন-৫' জাতটি তাইওয়ান থেকে প্রাপ্ত জাত থেকে নির্বাচন করা হয়েছে।

সারণি ২.২: প্রবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবন

জাতের নাম	জাত সৃষ্টি	অনুমোদনের বছর	প্রতিষ্ঠান
১. সয়াবিন			
ব্রাগ	প্রবর্তন ও যাচাই বাছাই	১৯৮১	বিএআরআই
ডেভিস	প্রবর্তন ও যাচাই বাছাই	১৯৮১	বিএআরআই
সোহাগ	প্রবর্তন ও যাচাই বাছাই	১৯৯১	বিএআরআই
বাংলাদেশ সয়াবিন - ৪ (জি-২)	এ ভি আর ডি সি থেকে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ	১৯৯২	বিএআরআই
২. সরিষা			
বারি সরিষা - ৯	ভারত থেকে সংগৃহিত	২০০০	বিএআরআই
বারি সরিষা - ১০	প্রবর্তন ও যাচাই বাছাই	২০০০	বিএআরআই
বারি সরিষা - ১১	প্রবর্তন ও যাচাই বাছাই	২০০১	বিএআরআই
৩. বাদাম			
ত্রিদানা বাদাম (DM-1)	ভারত থেকে সংগৃহিত	১৯৮৭	বিএআরআই
বাসন্তী (ডিজি.২)	বিদেশ থেকে সংগৃহিত	১৯৮১	বিএআরআই
বারি চীনাবাদাম - ৬	ভারত থেকে সংগৃহিত	১৯৯৮	বিএআরআই

চীনাবাদামের ক্ষেত্রে 'ত্রিধানা' জাতটি নির্বাচন করা হয়েছে ভারত থেকে প্রবর্তিত কৌলিসম্পদের উপর নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্নের মাধ্যমে। 'বারি বাদাম-৬' পাওয়া গেছে ICRISAT থেকে সংগৃহীত বিদেশি জাতে নির্বাচন পরিচালনা করে।

২.৫. গোল আলু প্রবর্তন

বাংলাদেশে অবমুক্ত সব গোলআলু জাতের উৎস হলো বিদেশ থেকে প্রবর্তিত গোলআলুর জাত অথবা পুরোগামী লাইন। অবশ্য আলুর সব জাতের উৎস এক দেশ নয়। তবে হলান্ড থেকে প্রবর্তিত আলুর পুরোগামী লাইনে নির্বাচন চালিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রে তৈরি করা হয় প্রায় এক ডজন গোলআলুর জাত। ১৯৯০ থেকে ২০০৪ সালের ভেতর এসব জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। স্কটল্যান্ড থেকে প্রাপ্ত একটি জাতে নির্বাচন করে পাওয়া গেছে একটি আলুর জাত, পেরুর আন্তর্জাতিক গোলআলু কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত গোলআলুর বিভিন্ন লাইন থেকে এদেশে পাওয়া গেছে তিন চারটি জাত।

২.৬. অন্যান্য ফসল প্রবর্তন

বার্লি বা যব আমাদের দেশের ফসল নয়। ফলে এ ফসলের জাত প্রবর্তন ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। মেক্সিকোর CIMMYT থেকে বিভিন্ন বার্লির লাইন প্রবর্তন করে এদেশে অবমুক্ত করা হয়েছে দুটি বার্লির জাত। এজাত দুটি হলো 'বারি বার্লি-১'ও 'বারি বার্লি-২'। সূর্যমূখীর 'কিরণী' জাতটি পাওয়া গেছে পোল্যান্ড থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজমে নির্বাচন পরিচালনা করে।

আখ এদেশের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। এ দেশে চিনির একমাত্র উৎস এ ফসলটি। অথচ এ ফসলটির সিংহভাগ জাতই হয় প্রবর্তিত, নয়তো বিদেশে সঙ্করায়িত জাতের বিভিন্ন বংশধর থেকে যাচাই-বাছাই করে পাওয়া জাত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার ভিনদেশি জাত এদেশে নিয়ে এসে সঙ্করায়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে নতুন জাত সৃষ্টি করা। আখের বিভিন্ন জাতের উৎস আসলে অন্যদেশ, মূলত ভারতের কোইম্বাটর। ওখানকার গবেষকদের সৃষ্ট ইক্ষুর জাত আমাদের দেশের ইক্ষুর জাতের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। অল্প ক'টি আমেরিকান জাতও বাংলাদেশে প্রবর্তন করা হয়েছে।

তুলার ক্ষেত্রে আমরা একশত ভাগ ভিনদেশি জাতনির্ভর। গত কয়েক দশক ধরে আমদানি করা জাতের উপর এদেশে যাচাই-বাছাই চালিয়ে অবমুক্ত করা হয়েছে তুলার এক একটি জাত। আমেরিকার কোম্পানি ডেল্টা পাইনল্যান্ড থেকে প্রাপ্ত কৌলিসম্পদ যাচাই-বাছাই করে এদেশে উদ্ভাবিত হচ্ছে তুলার জাত। এদেশে জিন ব্যাংকে রয়েছে প্রায় ৪০০-টি তুলার কৌলিসম্পদ। তা থেকে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে উদ্ভাবিত হবে আগামী দিনের তুলার জাত এমনটি ধরে নেয়া যায় এ কারণে যে, এ ফসলে এখনও কৃত্রিম পরাগ সংযোগের কাজই শুরু করা হয়নি।

মটরশুটি এদেশের মানুষের নিকট একটি অত্যন্ত প্রিয় সবজি। এর দামও বেশ চড়া। এদেশে আবাদি মটরশুটির সিংহভাগ দখল করে আছে প্রবর্তিত কৌলিসম্পদ

থেকে যাচাই-বাছাই করে সৃষ্ট জাতগুলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে তিনটি মটরশুটির জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে তা হয়েছে ভিনদেশি মটরশুটিতে নির্বাচন সম্পন্নের মাধ্যমে। বারি মটরশুটি ১, ২ ও ৩ এর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি একই রকম।

'বিনামুগ-২' জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে AVRDC থেকে সংগৃহীত লাইনের সঙ্গে একটি মিউট্যান্ট লাইনের ক্রস করে। AVRDC থেকে সংগৃহীত একটি লাইনের সঙ্গে মিউট্যান্ট একটি লাইনের সঙ্করায়ন করে সৃষ্টি করা হয়েছে বিনামুগ ৩, ৪ ও ৫। ICRISAT থেকে প্রবর্তিত জাতে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পাওয়া গেছে বিনাছোলা-৩ জাতটি। অন্যদিকে বিনাছোলা ৪ পাওয়া গেছে ICRISAT লাইনের সঙ্গে মিউট্যান্ট জাত 'হাইপ্রোছোলা'র সঙ্করায়ন ও নির্বাচন পরিচালনা করে।

প্রবর্তন পদ্ধতির প্রচলনের ফলে বহু ফসলে নিয়মিত বিভিন্ন পুরোগামী লাইন পাওয়া যায় CIMMYT, AVRDC আর IRRI থেকে। এসব লাইনকে নানাভাবে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন জাত সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে।

প্রতি বছর আমরা কত ফসলের বীজ যে প্রবর্তন করছি তার ইয়ত্তা নেই। এসব অধিকাংশ ফসলের বীজই হাইব্রিড প্রকৃতির। বিভিন্ন প্রাইভেট ও এনজিও প্রতিষ্ঠান বীজ ব্যবসার খাতিরে এবং অধিক মুনাফার লক্ষ্যে প্রতি বছর এদেশে নিয়ে আসে নানা ফসলের হাইব্রিড বীজ। সরাসরি হাইব্রিড বীজগুলো কিন্তু আমরা সংরক্ষণ করতে পারি আমাদের জিন ব্যাংকগুলোতে। তাছাড়া অনেক হাইব্রিড ফসলের বীজকে কয়েক বংশধর জন্মালে পাওয়া সম্ভব এদের পেরেন্টদ্বয়কে। এসব পেরেন্টকে পরে ব্যবহার করা সম্ভব নানা ভাবে। এদের সেগ্রিগেটিং বংশধর (segregating generation) থেকে এমনকি নির্বাচন চালিয়ে পাওয়া সম্ভব একাধিক জাতও। বশেমুরকৃবিতে F_1 মূলার বীজের পরবর্তী কয়েক বংশধর পর্যন্ত জন্মানো হলে তা থেকে নির্বাচন চালিয়ে পাওয়া গেছে একাধিক মূলার জাত। তাছাড়া এসব পেরেন্টকে জিন ব্যাংকে সংরক্ষণ করা যায় পরবর্তীকালে ব্যবহার করার জন্যও।

সবজির ক্ষেত্রে এদেশে যেসব জাত আবাদ হয়েছে এবং হচ্ছে এর সিংহভাগের উৎস হলো প্রবর্তিত কৌলি সম্পদ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সবজি বিজ্ঞানীরা নিয়মিত প্রবর্তন করছেন বিভিন্ন ফসলের পুরোগামী লাইন তাইওয়ানের এশিয়ান ভেজিটেবল রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (AVRDC) থেকে। এসব প্রবর্তিত জার্মপ্লাজম এবং পুরোগামী লাইন থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকাংশ সবজির জাত উদ্ভাবন করা হচ্ছে। বেগুন ফসলটির উৎপত্তি ঘটেছে আমাদের এই দেশে। এজন্য বেগুন আমাদের নিজস্ব ফসল। সে কারণেই এদেশে রয়েছে বেগুনের বৈচিত্র্যময় সব কৃষকের জাত -তা সত্ত্বেও ভিনদেশি বেগুনের জাত নিয়ে আসা হয়েছে এদেশে বিভিন্ন সময়। তেমনি কিছু জাত হলো- ব্ল্যাক লং, পোষা পার্পল লং, পোষা পার্পল রাউন্ড ইত্যাদি। দেশি জাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে এসব ভিনদেশি জাত। দেশি জাতের বেগুনের এখনও বেশ জনপ্রিয়তা বিদ্যমান। টমেটো একটি ভিনদেশি ফসল। এর অন্য নাম বিলাতি বেগুন। এদেশে এ ফসলটির ভিন্নতা খুব একটা নেই।

BARI বিজ্ঞানীরা টমেটোর ভিনদেশি কৌলিসম্পদ সংগ্রহ করেছেন ১০৫০টি। অনুমান করা যায়, এসব কৌলিসম্পদে যথেষ্ট বিভিন্নতা পাওয়া সম্ভব হবে। এ ভাণ্ডার থেকে যাচাই-বাছাই কিংবা এদেরকে সঙ্করায়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে পাওয়া সম্ভব টমেটোর নানা রকম জাত। লাউ ও শসাতেও ভিনদেশি জাত প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশি জাতের পাশাপাশি ভিনদেশি জাতগুলো আবাদ হচ্ছে দেশের কোনো কোনো স্থানে। BARI বিজ্ঞানীরা ১৯৭৫-৮৫ এই এক দশকে এদেশে লাউ গোত্রের বেশ কিছু ফসলের জাতের প্রবর্তন করেছেন । শসার বিদেশি জাতের মধ্যে রয়েছে ব্ল্যাক পার্লি, পারফেকেশন ইত্যাদি জাত। লাউয়ের বিদেশি জাতগুলো হলো- সামার প্রলিফিক লং, সামার প্রলিফিক রাউন্ড ইত্যাদি জাত। তরমুজের ক্ষেত্রে আমাদের শতভাগ নির্ভরতা ভিনদেশি জাতের উপর। টপইল্ড, গ্লোরি, এম্পায়ার নং-২, ওর্য়াল্ডি কুইন F_1 জাতসহ এদেশে প্রবর্তিত তরমুজের অন্যান্য জাতগুলো হলো– চ্যাম্পিয়ান কোরিয়া নং-২, গ্রে বেলি, সুগার বেরি ইত্যাদি জাত। স্কোয়াশ ফসলের প্রবর্তিত জাতগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি হলো ইবানী সুইট আর ডেলিকা।

বাংলাদেশের বাজারে এখন সবজির হাইব্রিড বীজের ভীষণ সমাদর। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বীজ ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসেন এসব সবজির F_1 বীজ। খুব কম সবজি ফসল রয়েছে যার বাজারে হাইব্রিড জাত নেই (সারণি ২.৩)। নিয়মিত এসব বীজ বাজারে এনে হাজির করেছেন বীজ ব্যবসায়ীরা। ভিনদেশি সবজি বীজ না আনতে পারলে হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করে সবজি চাষ করা সম্ভব হতো না। এটি যেমন সত্য কথা তেমনি এটিও সত্যি যে, এদেশের জল হাওয়ায় সৃষ্ট নয় বলে এসব হাইব্রিড অনেক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলন দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

সারণি ২.৩ : বাংলাদেশে ইদানিংকালে প্রবর্তিত সবজির কিছু হাইব্রিড ও উফশী জাত

ফসল	জাত	ফসল	জাত
টমেটো	হাইব্রিড 'লালী' হাইব্রিড 'জুয়েল' উফশী 'রুমা ভি এফ' হাইব্রিড 'জেনিফ' হাইব্রিড 'ইপক' হাইব্রিড 'রেড হিট'	বরবটি	উফশী - সবুজ সংকেত
মরিচ	হাইব্রিড মরিচ '৭৮০' হাইব্রিড মরিচ 'বিজলী'	ঢেঁড়শ	উফশী - হাই সফট উফশী - উত্তম উফশী - বিনা
বেগুন	হাইব্রিড 'বেগুনি'	লালশাক	উফশী - লাল মিয়া উফশী - নীলাবতী
লাউ	হাইব্রিড 'গ্রিনবল' হাইব্রিড 'মেরিনা'	ডাটা	উফশী - রসনা উফশী - রেড পিলার

মিষ্টি কুমড়া	হাইব্রিড 'মনিকা' হাইব্রিড 'মিঠাই' হাইব্রিড 'শ্যামলী'	পিঁয়াজ	লাল পুরি
শসা	হাইব্রিড 'গ্রিন বার' হাইব্রিড 'গ্রিন স্টার' হাইব্রিড 'গ্রিন ক্রান্ত'	ধনিয়া	গ্রীন লিফ
ঝিঙ্গা	হাইব্রিড 'দোদুল' হাইব্রিড 'দোলক'	তরমুজ	হাইব্রিড - সুগার এম্পেরর হাইব্রিড - টপ ইল্ড হাইব্রিড - ফিল্ড মাষ্টার হাইব্রিড - বিগ টপ হাইব্রিড - ওয়ার্ল্ড হিরো
করলা	উফশী 'মেহমান' হাইব্রিড 'জয়' হাইব্রিড 'স্নিগ্ধা'	বাঁধাকপি	হাইব্রিড - এটলাস-৭০ হাইব্রিড - হলিরস হাইব্রিড - ওয়াই আর এটলাস হাইব্রিড - খামার সিজন
ক্ষীরা	হাইব্রিড 'সাগর'	ধান	হাইব্রিড - এসিআই-১ হাইব্রিড - এসিআই-২ হাইব্রিড - সম্পদ হাইব্রিড - সেরা হাইব্রিড - ফলন হাইব্রিড - রাজকুমার হাইব্রিড - ৯৩০২৪ হাইব্রিড - সোনার বাংলা-৬
ফুলকপি	হাইব্রিড 'আঙুর' হাইব্রিড 'নবীন'	আলু	প্রোভেন্টা ডায়ামন্ট কার্ডিনাল বিনেলা
মূলা	হাইব্রিড 'মিনু মালী' উফশী 'হোয়াইট - ৪০' উফশী 'ব্রাইট হোয়াইট - ৪০' উফশী 'হোয়াইট মার্বেল' উফশী 'হোয়াইট কন্টেসা' উফশী 'হোয়াইট এক্সেল' উফশী 'আলী হোয়াইট'		

গত শতাব্দিতে এদেশে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বেশ কিছু নতুন সবজিও প্রবর্তন করা হয়েছে। এদেশে কোনো কোনোটি বেশ খাপখাইয়ে নিয়েছে এদেশের পরিবেশের সঙ্গে। এরা এখন আবাদ হচ্ছে দেশের নানা অংশে। ব্রোকলি এবং ব্রাসেলস স্প্রাউট

নামক দুটি ফসল গত শতাব্দিতে প্রবর্তন করা হয়। ব্রোকলির বর্ণিল পুষ্পমঞ্জরি খেতে বেশ সুস্বাদু। সাম্প্রতিক কালেই পাতা প্রধান সবজির মধ্যে চীনাকপি, বাটিশাক, গিমাকলমি এ দেশে প্রবর্তন করা হয়েছে । এসব কপি আর শাক এখন আবাদ হচ্ছে বাংলাদেশের বেশ কিছু এলাকায়।

বাজারে এখন পেয়ারার বেশ রমরমা অবস্থা। বেশ বড় বড় পেয়ারা এখন চোখে পড়ছে। এত বড় আকার দেখে এবং এদের ওজন অনেক বলে এদেরকে অনেকে কেজি পেয়ারা বলেও অভিহিত করে থাকে। আসলে পেয়ারার এ জাতটির নাম কাজী পেয়ারা। থাইল্যান্ড থেকে নিয়ে আসা এ জাতের পেয়ারার গড় ওজন ৫০০ গ্রাম। বড় আকৃতির বলে স্বাদতো একটু কম। কিন্তু মন্দ নয় এ জাতটি। গাছে ধরে প্রচুর। এ জাতটি দেশের পেয়ারার চাহিদার সিংহভাগ যোগানদাতা।

৩. ফসল হিসেবে ফল প্রবর্তন

যে কোনো ফল মেলায় গেলে আমাদের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যায় বিদেশি ফল বৃক্ষের বাহারি ফলের রঙ, আকার আকৃতি দেখে। ছোট ছোট গাছে ঝুলে আছে নানা রঙের ফল। থাইল্যান্ড এদিক দিয়ে বেশ এগিয়ে আছে। থাইল্যান্ডের মিষ্টি তেঁতুল, টুকটুকে লাল রঙের জামরুল, থাই লিচু, থাই আম, থাই করমচা, থাই কামরাঙা এমনি কত রকম থাই ফল গাছের সমারোহ দেখা যায় আমাদের দেশের বৃক্ষমেলা ও বৃক্ষ ব্যবসায়ীদের নার্সারিতে। শহরে গড়ে ওঠা ছাদভিত্তিক ফলের বাগানের এগুলো প্রধান আকর্ষণ। উচ্চতা কম বলে এরা জায়গা দখল করে কম; অথচ ছোট গাছে দৃষ্টি নন্দন ফলগুলো কেমন ঝুলে থাকে অবলীলায়।

এদেশে বেশ পূর্বেই আঙুর ফলের প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু এতদিন বাণিজ্যিকভাবে এর আবাদ শুরু করা যায়নি। এই গত শতাব্দির শেষ দশকে এসে এদেশে মিষ্টি আঙুর ফলাবার কাজ শুরু হয়েছে গাজীপুরের কাশিমপুরে। মধ্য আমেরিকা থেকে এদেশে প্রবর্তন করা হয়েছে এভোকেডো ও কাজুবাদাম। চট্টগ্রাম আর পার্বত্য চট্টগ্রামের উঁচু অঞ্চলে সীমিত আকারে এদের আবাদ করা হচ্ছে। রংপুরের "শামসজ্জামান" নামের এক কৃষক থাইল্যান্ড থেকে নিয়ে এসেছে লিচুজাতীয় এক রকমের ফল। এখন সেটি 'জামান' ফল হিসেবে এদেশে এর আবাদ শুরু হয়েছে ।

আরবদেশের খেজুরের কথাটি ধরি। আগে কখনো এ খেজুরের আবাদ হয়নি এদেশে। ময়মনসিংহের ভালুকার মোতালেব সাহেব সৌদি আরব থেকে এদেশে খেজুরের বীজ নিয়ে এসে আবাদ শুরু করেন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেয়ে ভিনদেশি এ ফসলটি এদেশেও চমৎকার মিষ্টি খেজুর তৈরি করছে। তার এ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে নতুন ফসলের তালিকায় যুক্ত হলো আরব দেশের খেজুর।

তৃতীয় অধ্যায়

সঙ্করায়নের মাধ্যমে ফসলের উন্নয়ন

এক বা একাধিক গাছ থেকে বৈশিষ্ট্য অন্য একটি গাছে সংযোজিত হবার প্রাকৃতিক উপায়ই হলো পর-পরাগায়ন। হাজার হাজার বছর ধরে এক জাতের গাছের সঙ্গে একই ফসলের অন্য জাতের গাছের পরাগ বিনিময় এবং তা থেকে নানা রকম যাচাই বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে উদ্ভাবিত হয়েছে নানা রকম জাত। কখনো কখনো পরাগ বিনিময় ঘটেছে এক প্রজাতির সঙ্গে অন্য প্রজাতিরও। এমনকি ফসলের মাঠে ফসলের সঙ্গে জন্মানো ফসলের নানা রকম আগাছা থেকেও পরাগ সংযোগের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়েছে আমাদের ফসল। এ রকম বৈশিষ্ট্য দেয়া নেয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের ফসল সমৃদ্ধ হয়েছে। মানুষ যে যুগে যুগে তার কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গাছ বাছাই করে নিতে পেরেছে তার কারণ কিন্তু ফসলের কৌলিবস্তুর আকস্মিক পরিবর্তন অর্থাৎ মিউটেশন এবং প্রাকৃতিক পর-পরাগায়ন অর্থাৎ সঙ্করায়ন।

উনবিংশ শতাব্দিতে প্রাকৃতিকভাবে পরাগ সংযোগ আর আকস্মিক প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট কৌলিবস্তুর পরিবর্তনের মাধ্যমে ফসল উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃত্রিমভাবে ফুলে ফুলে পরাগ সংযোগের ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। তবে পৃথিবীর সব দেশে এ কাজটি একই সময়ে একই ধারায় সকল ফসলে সংঘটিত হয়েছে তা কিন্তু নয়। ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে একজন কৃষক এস ডব্লিউ সিনডেল (SW Schindel) দুটি গম জাতের মধ্যে ক্রস করে উদ্ভাবন করেন ফোলক্যাস্টার (Fulcaster) নামক একটি জাত। কয়েক দশক পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে সফলভাবে এ জাতটির আবাদ হয়।

অস্ট্রেলিয়াতে বিজ্ঞানী উইলিয়ম ফার্নার (William Farner) ১৯০১ সালে ফালক্যাস্টার নামক একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গমের জাত তৈরি করতে সক্ষম হন। এ জাতটি তৈরি করবার জন্য তিনি ব্যবহার করেন তিনটি জাত। তার সঙ্করায়ন কর্মসূচিতে ব্যবহৃত একটি জাত হলো Fife। কানাডা থেকে নিয়ে আসা এ জাতটির গুণমান ছিল উত্তম। ভারত থেকে নিয়ে আসা জাত Etewah ছিল একটি আগাম জাত। আর অন্য যে জাতটি সঙ্করায়ন ব্যবহার করা হয়েছিল তার নাম ছিল Purple straw। এটি ছিল উত্তম উৎপাদনক্ষম একটি জাত।

তবে বিজ্ঞানভিত্তিক পরাগ সংযোগের কাজ শুরু হয় বিংশ শতাব্দির গোড়াতে এসে গ্রেগর যোহান মেন্ডেলের যুগান্তকারী বংশগতির সূত্র দুটির পুন:আবিষ্কারের পর। এ সূত্র দুটির মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানীরা কিভাবে পিতামাতা থেকে বৈশিষ্ট্য সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হয় তা ভালভাবে বোঝতে সক্ষম হন। ভিন্ন ভিন্ন জাত থেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন যে সঙ্করায়ন করে একত্রে একটি উদ্ভিদে আনা সম্ভব এ সত্যটি বিজ্ঞানীরা জেনে যান। সঙ্করায়নের মধ্য দিয়ে কোন ফসলে যে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয় তাকে কাজে লাগিয়ে যে জাত সৃষ্টি করা সম্ভব এটি তারা বোঝতে পারেন।

সারা পৃথিবী জুড়ে গত ১০০ বছরে ফসল উন্নয়নে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এ সাফল্যের বড় অংশ এসেছে মূলত কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি জাত বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটি প্রজাতির মধ্যে সঙ্করায়নের মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে সঙ্করায়নের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন উৎসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো একটি উদ্ভিদে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। এটি জাত তৈরির কাজের ভিত্তি। আসল যাচাই-বাছাই শুরু হয় এর পর থেকে। যাচাই-বাছাইয়ের কাজটি যেন কার্যকর হয় সেজন্য এ সময়ের মধ্যে নানা রকম উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। কতটা দক্ষভাবে হাজারো গাছের মধ্য থেকে থেকে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যধারী গাছকে আলাদা করে নেয়া যায় সেটাই হলো প্রজনন পদ্ধতি উদ্ভাবনের মূল উদ্দেশ্য।

১. গমের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন

উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝিতে জাপানের কৃষকেরা প্রচলিত কৃষকের জাতের পাশাপাশি আধা-খর্বাকৃতির গমের জাতও আবাদ করতো । এরকম একটি জাত হলো Daruma, যাকে পরবর্তীকালে নতুন নতুন গমের জাত উদ্ভাবনে খর্বাকৃতির জিনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এসব আধা-খর্বাকৃতির জাতসমূহের উন্নয়ন সাধনের জন্য জাপানিরা যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ ফলনশীল গমের জাতের সঙ্গে সঙ্করায়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯১৭ সালে জাপানী Daruma এবং যুক্তরাষ্ট্রের Fultz জাতের মধ্যে বহু সংখ্যক ক্রস করা হয়। Daruma- এর আধা-খর্বাকৃতির স্বভাবের সঙ্গে Fultz-এর উচ্চফলনশীলতা যুক্ত করাই ছিল মূল্য উদ্দেশ্য। ১৯৩৫ সালের দিকে এসব ক্রসের ফলাফল হিসেবে Norin 10 নামক জাতটি অবমুক্ত করা হয় এবং তার ফলে গমের ফলন তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বেড়ে যায় ।

১৯৪৫ এর পর জাপান থেকে Norin 10 জাতটির বীজ যুক্তরাষ্ট্রে নেয়া হয় এবং তাদের স্থানীয় গম জাতের সঙ্গে এর ক্রস করা হয়। ক্রসের মাধ্যমে সৃষ্ট বিভিন্নতা থেকে Gaines নামক একটি জাত সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। এজাতটি ছিল খাটো, শক্ত, উচ্চ ফলনশীল এবং যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিমের ভারী বৃষ্টিপাত এলাকায় অভিযোজনক্ষম। এজাতটির বাণিজ্যিক আবাদ বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই এলাকার গমের ফলন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু Gaines জাতটি সেই এলাকার জন্য বেশ ভাল ফলন দিলেও তা গ্রীস্মমন্ডলীয় এবং অবগ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ার জন্য ছিল চাষের অনুপযোগী। শীতকালীন গম হওয়ার Gaines জাতটির জন্য আগাম বৃদ্ধি পর্যায়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শীতকালের প্রয়োজন হতো। এ শীতকাল না পেলে এরা দানা তৈরি করতে ব্যর্থ হতো। এ জাতটি ছিল রাস্ট (rust) ছত্রাক সংবেদনশীল।

১৯৫৩ সালে কিছু Gaines এর বীজসহ Norin 10 এর কিছু ক্রসের বীজ পাঠানো হলো মেক্সিকোতে নরম্যান বোরলগের (Norman Borlaug) কাছে। রকফেলার ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে নরম্যান বোরলগ এবং তাঁর সহকর্মীরা বিশ্বের গম উৎপাদনকারী দরিদ্র দেশগুলোর বিষয়টি বিবেচনা করে তাদের উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেন। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে তারা গমের বহু জাতের বীজ সংগ্রহ করে একটি জিন ব্যাংক তৈরি করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নানা রকম আধা-খর্বাকৃতির উচ্চ ফলনশীল

গমের জাত উদ্ভাবন করা যেন এরা পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশে জন্মাতে সক্ষম হয়। ১৯৬২ সালে বিভিন্ন প্রকার ক্রস এবং তা থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে বেশ কতগুলো নতুন, উচ্চ ফলনশীল, আধা-খর্বাকৃতির জাত উদ্ভাবন করা হয়। এসব নতুন গম জাতগুলোর গুরুত্বপূর্ণ নতুন নতুন কিছু বৈশিষ্ট্যও ছিল। এরা পরিপক্ব হতো বেশ দ্রুত এবং এরা ছিল আলোক সংবেদনহীন। এরা ছিল রাস্ট প্রতিরোধক্ষম এবং এরা উষ্ণ পরিবেশেও বেশ ভালভাবে অভিযোজনক্ষম ছিল।

মাঠে এসব গমের জাত ছিল অত্যন্ত সফল। এসব জাত আবাদ করার জন্য ফসলের মাঠে সার প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। খর্বাকৃতির জাত বলে সারের ব্যবহার ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। প্রচলিত কৃষকের জাতের তুলনায় এসব জাত দ্বিগুণ ফলন দেয়। ১৯৬৩ সালের দিকে নরম্যান বোরলগ ভারত সফরে আসেন। তিনি ভারত থেকে মেক্সিকোতে ফিরে গিয়ে চারটি গম জাতের প্রতিটির ১০০ কেজি করে বীজ ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (Indian Agricultural Research Institute, IARI) এম এস স্বামিনথান (M. S. Swaminathan) এর কাছে পাঠিয়ে দেন। ভারতের ৭টি স্থানে এদের জন্মানো হয় ১৯৬৩ - ৬৪ সালে। এগুলো এতটাই সফল হয় যে, ভারতের মাটিতে ১৯৬৫ সালে ২৫০ টন এবং ১৯৬৬ সালে ১৮০০ টন বীজ পাঠাবার অনুরোধ পৌঁছে যায় বোরলগের নিকট।

১৯৬৩ সালে ভারত থেকে ফিরে যাবার সময় পাকিস্তানও সফর করেন বোরলগ। পাকিস্তানের জন্যও ২০৫ কেজি বীজ পাঠান তিনি। এখানেও চমৎকার ফলন দেয় এসব জাত। মেক্সিকোর এসব জাতের বেশ ক'টি জাত চলে আসে বাংলাদেশেও। এখানেও এগুলো বেশ সফল হয়। এতে বাংলাদেশে গম চাষের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ১৯৮০ সালে এসে দেখা যায় যে, দক্ষিণ এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার শতকরা ৮০ ভাগ গমের জমিতে এসব উচ্চ ফলনশীল জাতের গম আবাদ হচ্ছে।

২. ধানের আধুনিক জাত উদ্ভাবন

উচ্চ ফলনশীল গম উদ্ভাবনের পাশাপাশি ধানের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের চেষ্টাও শুরু হয় ভারত এবং জাপানে। অবশ্য আধা-খর্বাকৃতি উচ্চ ফলনশীল ধান উদ্ভাবনে সাফল্য আসে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে (International Rice Research Institute)। আসলে জাপোনিকা (japonica) ধানে এসব সাফল্য আসে আরও পূর্বেই। জাপান, তাইওয়ান, চীনের ইয়াংজি উপত্যকার নিচু অংশে এবং কোরিয়াতে জাপোনিকা ধান ভাল জন্মে। এ ধানের জন্য প্রয়োজন হয় সুনির্দিষ্ট পরিমাণ পানি সেচ, আগাছা এবং কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ। ফলে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকায় এরা সফল নয়। এদের কাণ্ড খাটো, এরা পরিপক্বতা লাভ করে বেশ আগেভাগে এবং সার প্রয়োগ করলে এগুলো ভাল ফলন দেয়। এসব জাতের ধানের ভাত একটি আর একটির সঙ্গে জড়িয়ে যায় এগুলোর মধ্যে গ্লুটানিনের পরিমাণ বেশি বলে।

চীনে Champa বলে একটি জাপোনিকা ধানের জাত আবাদ করতো কৃষকেরা -যা ছিল বেশ আগাম এবং এ জাতটি ছিল খরাসহিষ্ণু এবং ফলনও ভাল ছিল। বিংশ শতাব্দিতে চীনে কৃষকের জাতসমূহের কিছু সংখ্যক আবাদ হতো। তবে চীনে আবাদকৃত অধিকাংশ জাপোনিকা ধানের জাতগুলো সৃষ্টি করা হয়েছিল Champa

জাতের লাইনসমূহ থেকে। এর আগাম স্বভাব, খর্বাকৃতি বৈশিষ্ট্য আর ফলনশীলতার কারণে এর সঙ্গে সঙ্করায়ন থেকে উদ্ভূত লাইনসমূহের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্নের মাধ্যমে তৈরি হতো তখন এক একটি ধানের জাত। জাপানে খর্বাকৃতির আগাম স্বভাবের উচ্চ ফলনশীল জাত তৈরি করতে গত শতাব্দির পঞ্চাশের দশক লেগে গেছে। চীনে ও জাপানে জাপোনিকা ধানের এ সাফল্য বিজ্ঞানীদের indica ধানে এরকম জাত উদ্ভাবনে আগ্রহী করে তোলে।

Indica শ্রেণীর ধানের ভূমি কর্ষিতক (land race) বা আদি জাত বা কৃষকের জাতের স্বভাবই এমন যে একে উচ্চ ফলনশীল খর্বাকৃতি জাতে রূপান্তর সহজ কাজ নয়। এসব প্রচলিত জাত বেশ লম্বা, অঙ্গজবৃদ্ধি এদের অধিক, এদের সহজেই ঢলে পড়বার প্রবণতা রয়েছে। এদের পুষ্পায়ন দিবস-দৈর্ঘ্য নির্ভর। এসব স্বভাব উফশী জাতের স্বভাবের একেবারে উল্টো। উফশী জাতের স্বভাবগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো অর্ধ-খর্বাকৃতি, আগাম পরিপক্কতা এবং পুষ্পায়ন দিবস দৈর্ঘ্য নিরপেক্ষতা।

গত শতাব্দির পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ইন্ডিকা ধান উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালিয়ে যান। ইন্দোনেশিয়াতে স্থানীয় অভিযোজনক্ষম একটি জাতের সঙ্গে মুক্ত পরাগায়নের মাধ্যমে Peta নামক একটি উচ্চ ফলনশীল খরাসহিষ্ণু জাত পাওয়া সম্ভব হয়। এদিকে উনবিংশ শতাব্দির শেষ দিকে এসে জাপোনিকা ধানের জাত Dee-geo-woo-gen নামক আধা খর্বাকৃতির একটি জাত উদ্ভব হয়। একটি রোগ প্রতিরোধী স্থানীয় ইন্ডিকা জাতের সঙ্গে Dee-geo-woo-gen জাপোনিকা জাতের ক্রস করা হয় ১৯৫৬ সালে। তা থেকে পাওয়া সম্ভব হয় Taichung Native 1 (TN-1) নামক ৮৫ সে.মি. লম্বা একটি অর্ধখর্বাকৃতির জাত। এর কাণ্ড খাটো বলে এটি বেশ সার সংবেদনশীল হয় এবং এর কাণ্ড শক্ত বলে এটি ঢলে পড়ে না। TN-1 অবশ্য পরিপক্ক হতো কিছুটা দেরিতে এবং ধানের ব্লাস্ট রোগের প্রতি এটি ছিল সংবেদনশীল।

১৯৬২ সালে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (সংক্ষেপে ইরি) চালু হওয়ার পর আধা-খর্বাকৃতির উফশী ধান সৃষ্টির কাজ আরও বেগবান হয়। প্রথম বছরে ইরিতে যে ৩৮টি ক্রস করা হয় তার ১১ টিতেই আধা-খর্বাকৃতির জাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব ক্রসের একটি ক্রস ছিল Peta এবং Dee-geo-woo-gen জাত দুটির মধ্যে এবং এর বিভিন্ন বংশধরের গাছ গাছালির মধ্যে নির্বাচন চালিয়ে তৈরি করা হয় IR-8। এজাতটি অত:পর পাঠিয়ে দেয়া হলো বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড এবং কলাম্বিয়ার প্রজননবিদদের নিকট। এই IR-8 জাতটির মধ্যে ছিল অনেক ক'টি কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য। সে বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- উচ্চ ফলন, আগাম পরিপক্কতা, দিবস দৈর্ঘ্য নিরপেক্ষ পুষ্পায়ন, আধা-খর্বাকৃতির বৃদ্ধি স্বভাব ও ব্লাস্ট ছত্রাক প্রতিরোধক্ষমতা।

১৯৬৯ সালে এসে ধানের আর একটি খর্বাকৃতির উচ্চ ফলনশীল জাত IR 20 কৃষকদের আবাদের লক্ষ্যে অবমুক্ত করা হয়। এ জাতটি তৈরি করা হয় TN-1 এবং Peta জাতদ্বয়ের ক্রসের ফলে সৃষ্ট জাতক থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে। IR-8 এর চাল ধান ভাঙানোর সময় ভেঙে যেত আর রান্নার পর এর ভাতগুলো যেন ম্যাড় ম্যাড়ে হয়ে যেত বলে কৃষকের নিকট এ জাতটি গ্রহণযোগ্য হয়নি। পরবর্তীকালে IR-8 এর সঙ্গে

ক্রস করা হয় Sigadis নামক একটি জাত এবং তা থেকে নির্বাচন করে তৈরি করা হয় IR-24 জাতটি। এর পর সঙ্করায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত উদ্ভিদকূলে নির্বাচন পরিচালনা করে বাজারজাত করা হয় IR-26 ও IR-36 জাত।

একদিকে গমের আধুনিক জাত, অন্যদিকে জাপোনিকা এবং ইন্ডিকা শ্রেণীর ধানের আধুনিক জাত এবং ভুট্টার হাইব্রিড জাত মিলে সারা পৃথিবী জুড়ে দানা শস্যের উৎপাদনে এক অভূতপূর্ব সাফল্য নিয়ে আসে। এসব আধুনিক জাতের বিস্তার এবং কৃষক কর্তৃক এসব জাতের ব্যাপক আবাদ কৃষিতে 'সবুজ বিপ্লব' সৃষ্টি করে। ধান ও গমের খর্বাকৃতির জাতগুলোর কাণ্ড যথেষ্ট শক্ত হওয়ায় সার ও সেচ প্রয়োগ ফসলের যথেষ্ট বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন করলেও ফসল কিছুতেই ঢলে পড়তো না বলে ফলনও অধিক হয়। তাছাড়া কীটনাশক ও নানা রকম রোগ জীবাণুনাশকের ব্যবহার ফসলকে কীটপতঙ্গ ও রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে বলে এসব জাতের বৃদ্ধি ও বিকাশ পরিপূর্ণ হতে পারে এবং উদ্ভিদের খাদ্য বন্টন মানুষের চাহিদামাফিক হয় বলে ফলন বেড়ে যায়। ফলন বেড়ে যাওয়া অর্থ হলো খড় আর দানার অনুপাত বেড়ে যাওয়া, যাকে হার্ভেস্ট ইনডেক্স (harvest index) বলা হয়। আধুনিক ধানের জাতের হার্ভেস্ট ইনডেক্স হলো ০.৫। সঠিক ব্যবস্থাপনায় এ ধরনের জাতের ফলন হতে পারে প্রতি হেক্টরে ১০ টন পর্যন্ত।

৩. সঙ্করায়ন ও নির্বাচন

পরাগ সংযোগ তথা সঙ্করায়ন গত শতাব্দির ফসল উন্নয়নের একটি অন্যতম উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। গত শতাব্দির ষাটের দশকে এসে যে সবুজ বিপ্লব সাধিত হয়েছে কৃষিতে তারও মূল ভিত্তি ছিল এমনিতর সঙ্করায়ন। খর্বাকৃতির আধা-খর্বাকৃতির গম ও ধানের জাত সৃষ্টি এবং এদের ব্যাপক ব্যবহার ফসলের ফলন বাড়িয়েছে আশানুরূপ হারে। গত শতাব্দির শেষ ৩৫ বছর ধরে দানাশস্যের ফলন দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। ফসলের এ ফলন বৃদ্ধি ছাড়িয়ে গেছে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও। গত চল্লিশ বছর ধরে ফসলের যে ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে তা মূলত প্রতি হেক্টরে ফলন বৃদ্ধির জন্যই ঘটেছে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০০৩ সনের হিসাব অনুযায়ী ১৯৬০ থেকে ২০০০ সালে পর্যন্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গমের উৎপাদন বেড়েছে ২০৮%, ধানে বেড়েছে ১০৯%, ভুট্টা, গোলআলু এবং ক্যাসাভাতে এ সময়ের মধ্যে ফলন বেড়েছে যথাক্রমে ১৫৭%, ৭৪% এবং ৩৬%।

ফসলের পরাগায়নের স্বভাবের উপর নির্ভর করে উদ্ভাবন করা হয়েছে নানা রকম নির্বাচন পদ্ধতি। স্ব-পরাগী ফসলের স্বভাবই হলো এরা হোমোজাইগোসিটি অবস্থা ধারণ করে। ফলে এর সকল নির্বাচনের মূল লক্ষ্য হলো এদের হোমোজাইগাস অবস্থা সৃষ্টি করা। স্ব-পরাগী ফসল উন্নয়নে যেসব নির্বাচন পদ্ধতি রয়েছে এদেরকে দুটি গ্রুপে বিভক্ত করা যায়। কিছু নির্বাচন ধারা রয়েছে যেখানে নির্বাচন শুরু হয় একেবারে F_2 থেকেই। আবার কিছু নির্বাচন পদ্ধতিতে আসল নির্বাচন শুরু হয় বেশ পরে। একেবারে F_5 এবং F_6 বংশধরে গিয়ে।

৩.১. স্ব-পরাগী ফসলে নির্বাচন

স্ব-পরাগী ফসলের সবচেয়ে জনপ্রিয় নির্বাচন পদ্ধতি হলো পেডিগ্রি বা কুলজি পদ্ধতি (pedigree method)। এ পদ্ধতিতে F_2 থেকেই নির্বাচন শুরু হয় এবং নির্বাচিত

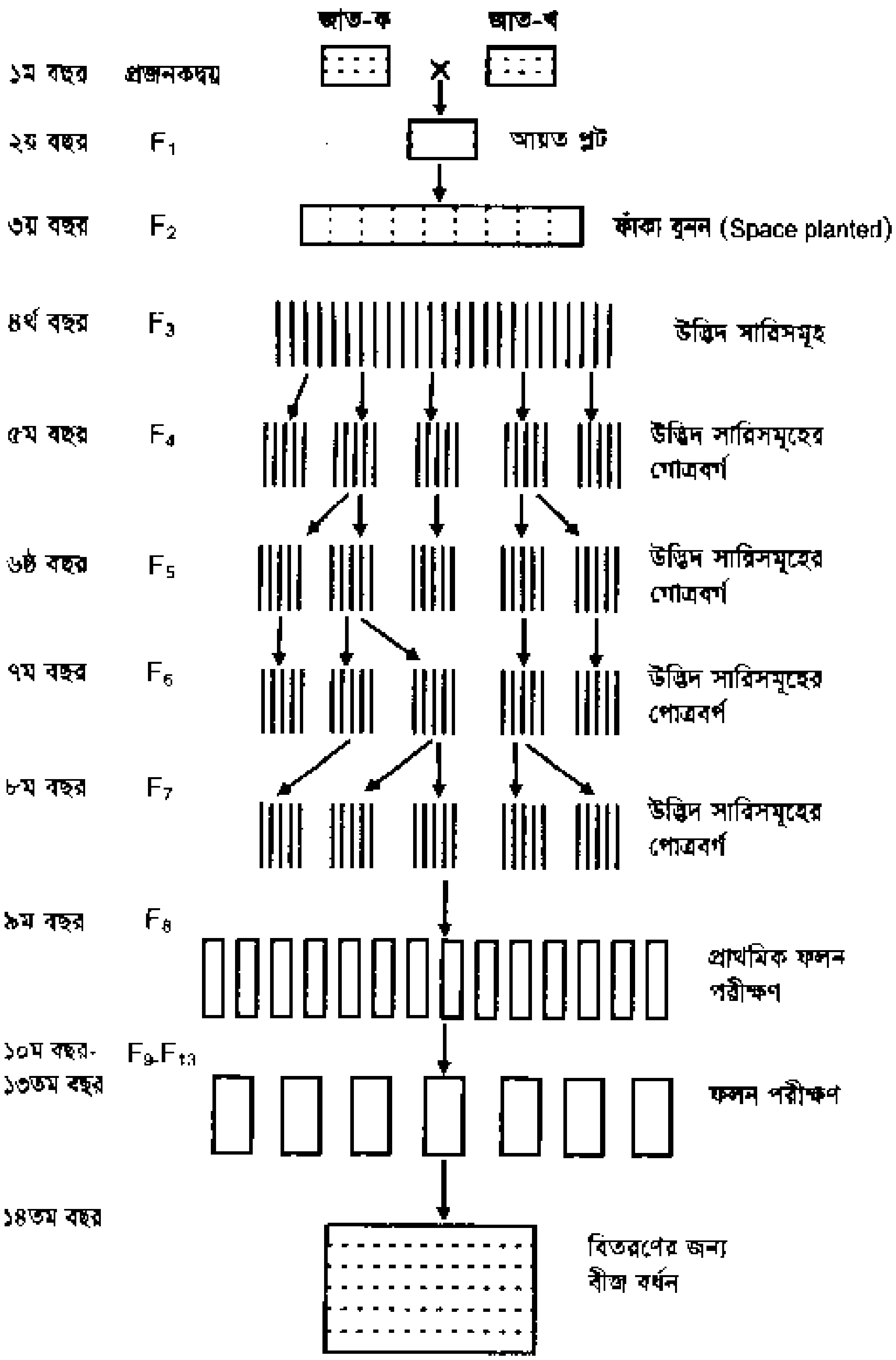

চিত্র- ৩.১ : স্ব-পরাগী ফসলে নির্বাচনের কুলজি পদ্ধতির কর্মধারা

গাছগুলোর বীজও আলাদা করে রাখা হয়। বহু স্ব-পরাগী ফসলের জাত তৈরি হয়েছে এ পদ্ধতির মাধ্যমে। বাল্ক পদ্ধতিতে (bulk method) আসল নির্বাচন শুরু হয় চার পাঁচ

বংশধর পর। যতটা সম্ভব ভাল গাছগুলোর বীজ সংগ্রহ করে একত্রিত করে চার পাঁচ বছর জন্মানো হয়। F_5 এবং F_6 বংশধরে এসে স্বতন্ত্র গাছগুলোকে ভালোভাবে যাচাই বাছাই করে কাঙ্ক্ষিত গাছগুলো কেবল নির্বাচন করে আলাদা আলাদাভাবে বীজ সংগ্রহ

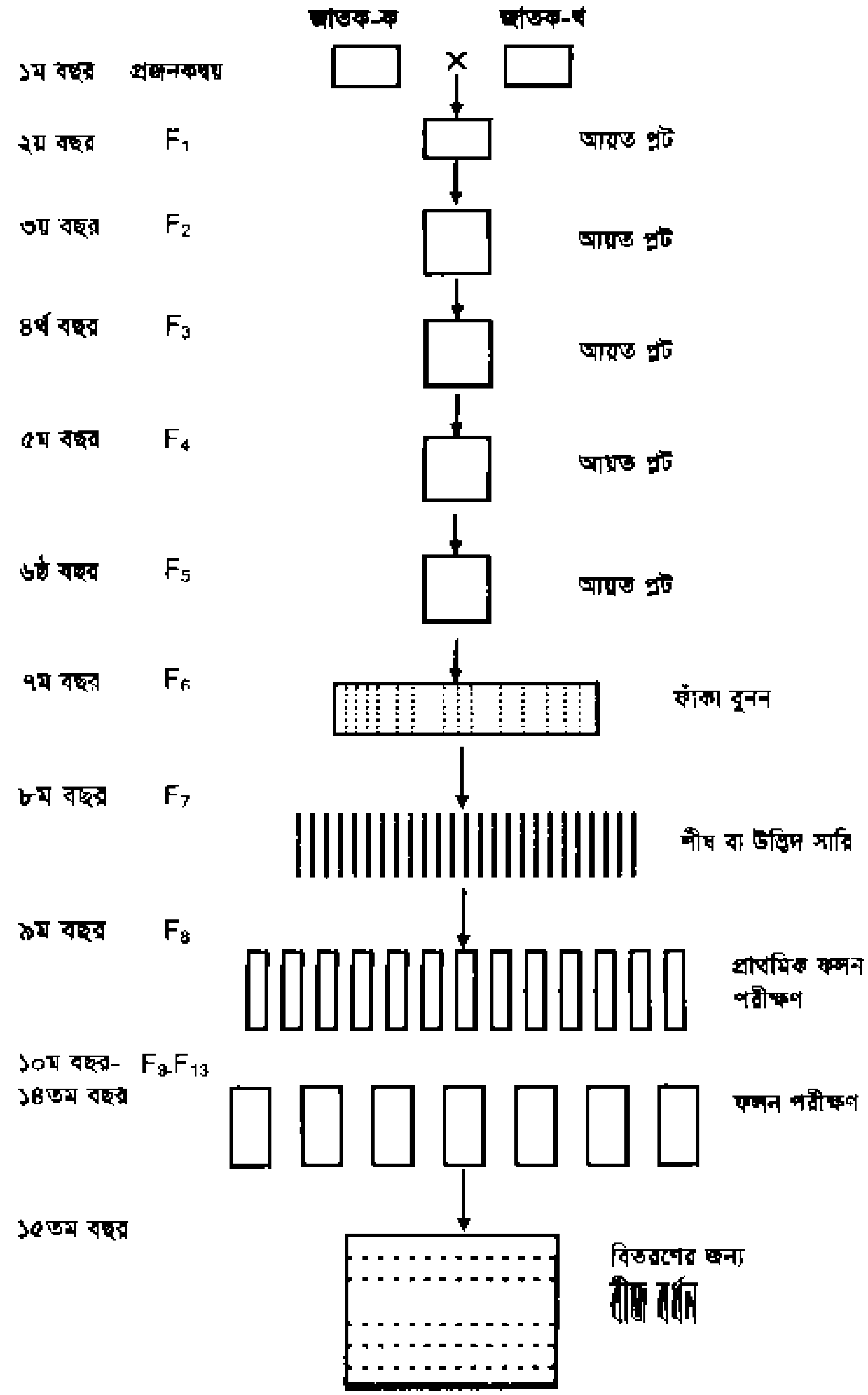

চিত্র ৩.২ : আয়ত প্রজনন পদ্ধতির কর্মধারা

করা হয়। ততোদিনে গাছগুলো কিন্তু হোমোজাইগোসিটি অর্জন করে ফেলে। বিজ্ঞানীরা যখন বুঝলেন যে আগেভাগে হোমোজাইগোসিটি অর্জন করে নিয়ে ভালভাবে নির্বাচন করাটা মন্দ নয় তখন তারা আরও দুটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। এর একটি হলো

দ্বিগুণিত হ্যাপ্লয়েড (doubled haploid) এবং অন্যটি একক বীজ বংশধর (single seed descent) পদ্ধতি। কোষকলা আবাদ করে সম্পূর্ণ গাছ পাওয়া যায় যেসব ফসলে সেসব ফসলে দ্বিগুণিত হ্যাপ্লয়েড পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। এখানে সঙ্করায়নের পর প্রাপ্ত F_1 গাছের পুংরেণু কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে জন্মিয়ে কলসিসিন নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবণ ব্যবহার করে পাওয়া সম্ভব হয় হ্যাপ্লয়েড গাছ। এসব ক্ষুদে গাছের ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণিত করা হয়। ফলে দ্রুত গাছগুলো এক জেনারেশনের মধ্যেই হোমোজাইগাস হয়ে পড়ে। এর পর চলে স্বতন্ত্র গাছের যাচাই বাছাই। টিস্যু কালচার সুবিধা থাকায় ধান, গম ও সরিষার জাত সৃষ্টিতে এ পদ্ধতি দিন দিন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

একক বীজ বংশধর পদ্ধতিতে সঙ্করায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত F_1 বীজকে সাধারণ পরিচর্যা দিয়ে জন্মানো হয় যেন প্রচুর F_2 বীজ পাওয়া সম্ভব হয়। অতঃপর F_2 বীজগুলোকে গ্রিন হাউজে জন্মানো হয় বেশ গাদাগাদি করে। উদ্দেশ্য উত্তম ফসল পাওয়া নয় বরং প্রতি গাছে কমপক্ষে একটি করে বীজ পাওয়া। প্রতি F_2 গাছ থেকে একটি করে বীজ সংগ্রহ করে আবার জন্মানো হয় একইভাবে। এভাবে বছরে গ্রিন হাউজ পরিবেশে পাওয়া সম্ভব তিনটি ফসল। অর্থাৎ এক বছরে তিনটি জেনারেশন এগিয়ে নেওয়া হয়। ততদিনে গাছগুলোও বেশ হোমোজাইগাস হয়ে পড়ে। এর পর শুরু হয় একক গাছ নির্বাচন। এসব পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো দুটি জেনেটিক দিক থেকে ভিন্নতর উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য এক জাতে নিয়ে আসা। ফলে দুটি উদ্ভিদ ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য উৎকৃষ্ট প্রকৃতির হলে এটি কার্যকর হয়। একটি উদ্ভিদে যদি কেবল একটি ভাল বৈশিষ্ট্য থাকে আর অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য অনাকাঙ্ক্ষিত হয় তাহলে বিভিন্ন বংশধরের গাছ থেকে উৎকৃষ্ট গাছ বাছাই করা কঠিন হয় এবং কখনও কখনও তা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আবার কোনো কোনো সময় এরকম হয় যে কোন একটি গাছ বুনো প্রকৃতির কিন্তু এর একটি বৈশিষ্ট্য বেশ ভাল যা ফসলে স্থানান্তর করা উচিত অথবা এমন হয় যে একটি জাতের একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য উত্তম অন্যগুলো খারাপ তাহলে প্রজননবিদদের লক্ষ্য থাকে কেবল সেই উত্তম জিনটিকে ফসলে সংযোজন করা।

সঙ্করায়নের একটি বড় সুবিধা এই যে, এর ফলে প্রথম বংশধরে উভয় গাছ থেকে শতকরা ৫০ ভাগ করে ক্রোমোজোম চলে আসে। তার মানে দুটি প্রজনক থেকে হাজার হাজার জিন সন্তানে চলে আসে। অথচ অনেক ক্ষেত্রে যে জাতটি উত্তম তার জিনগুলো কাঙ্ক্ষিত হলেও অন্য জাতটির কেবল একটি দুটি বৈশিষ্ট্য উত্তম বলে একটি দু'টি জিন ছাড়া অন্য সব জিনই অনাকাঙ্ক্ষিত। সেক্ষেত্রে প্রজননবিদের চাহিদা হলো এমন জাত উদ্ভাবন করা যেখানে একটি প্রজনক থেকে আসবে প্রায় সকল জিন আর অন্য প্রজনক থেকে জাতটিতে আসবে কাঙ্ক্ষিত একটি বা দুটি জিন। কাঙ্ক্ষিত প্রজনকের অনাকাঙ্ক্ষিত জিনগুলো অপসারণের জন্য প্রজননবিদেরা অতঃপর উদ্ভাবন করেছেন ব্যাকক্রস (back cross) পদ্ধতি। প্রথম বংশধর উদ্ভিদকে উত্তম পিতা বা মাতার সঙ্গে পরপর কয়েকবার ব্যাক ক্রস করলে উত্তম পিতা বা মাতার জিন উদ্ভিদে ক্রমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপায়ে ব্যাকক্রস করা হলে এমন গাছ পাওয়া যায় যা উত্তম গাছের আর সব বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি অপরাপর গাছটির উত্তম বৈশিষ্ট্যটি এতে যুক্ত হয়। এভাবে বহু ফসলের জাত সৃষ্টি করা হয়েছে বিভিন্ন ফসলে।

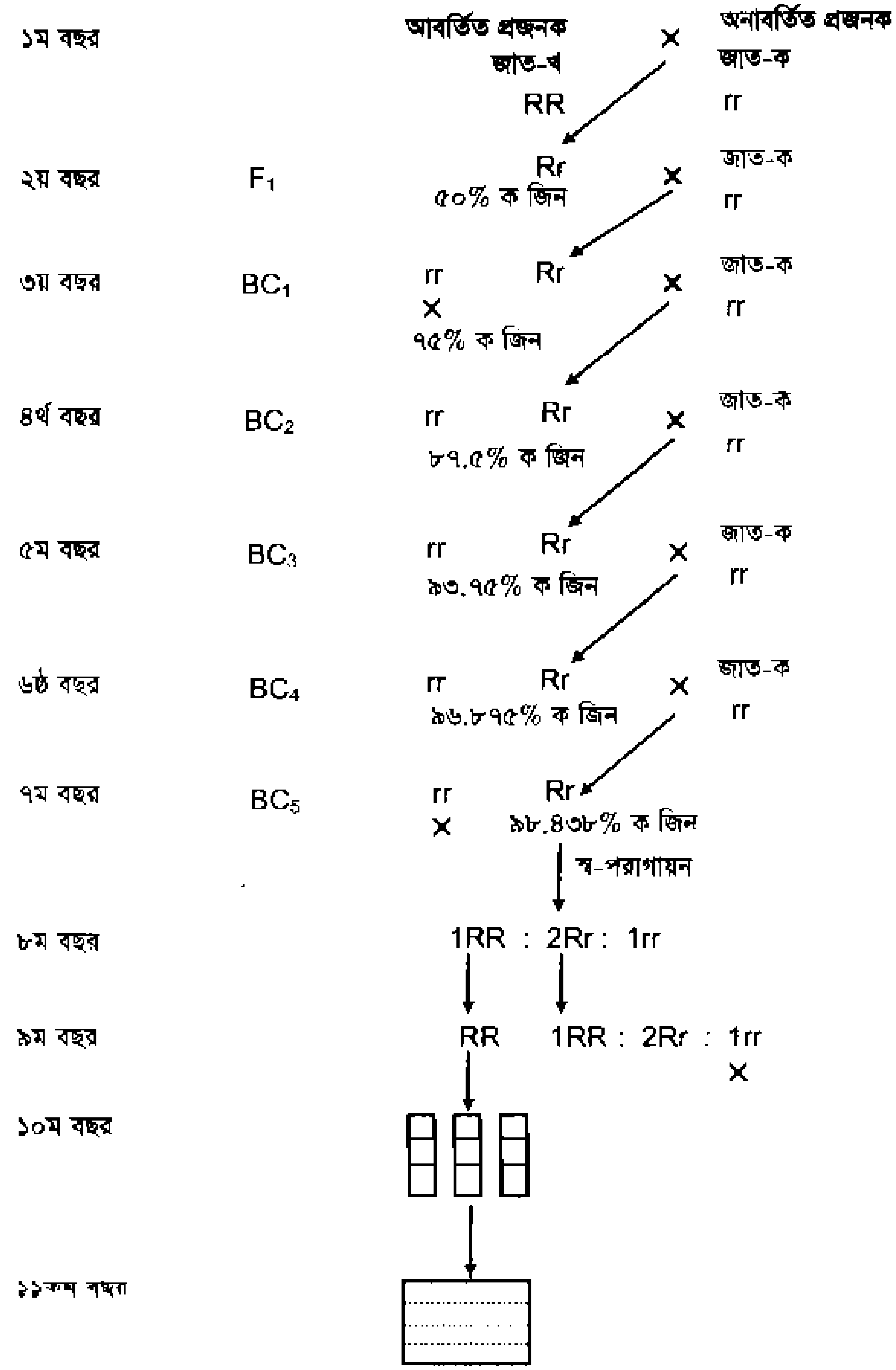

চিত্র ৩.৩ : স্ব-পরাগী ফসলে ব্যাক-ক্রসের মাধ্যমে একটি জিন নিয়ন্ত্রিত রোগ প্রতিরোধী জিন স্থানান্তরণ

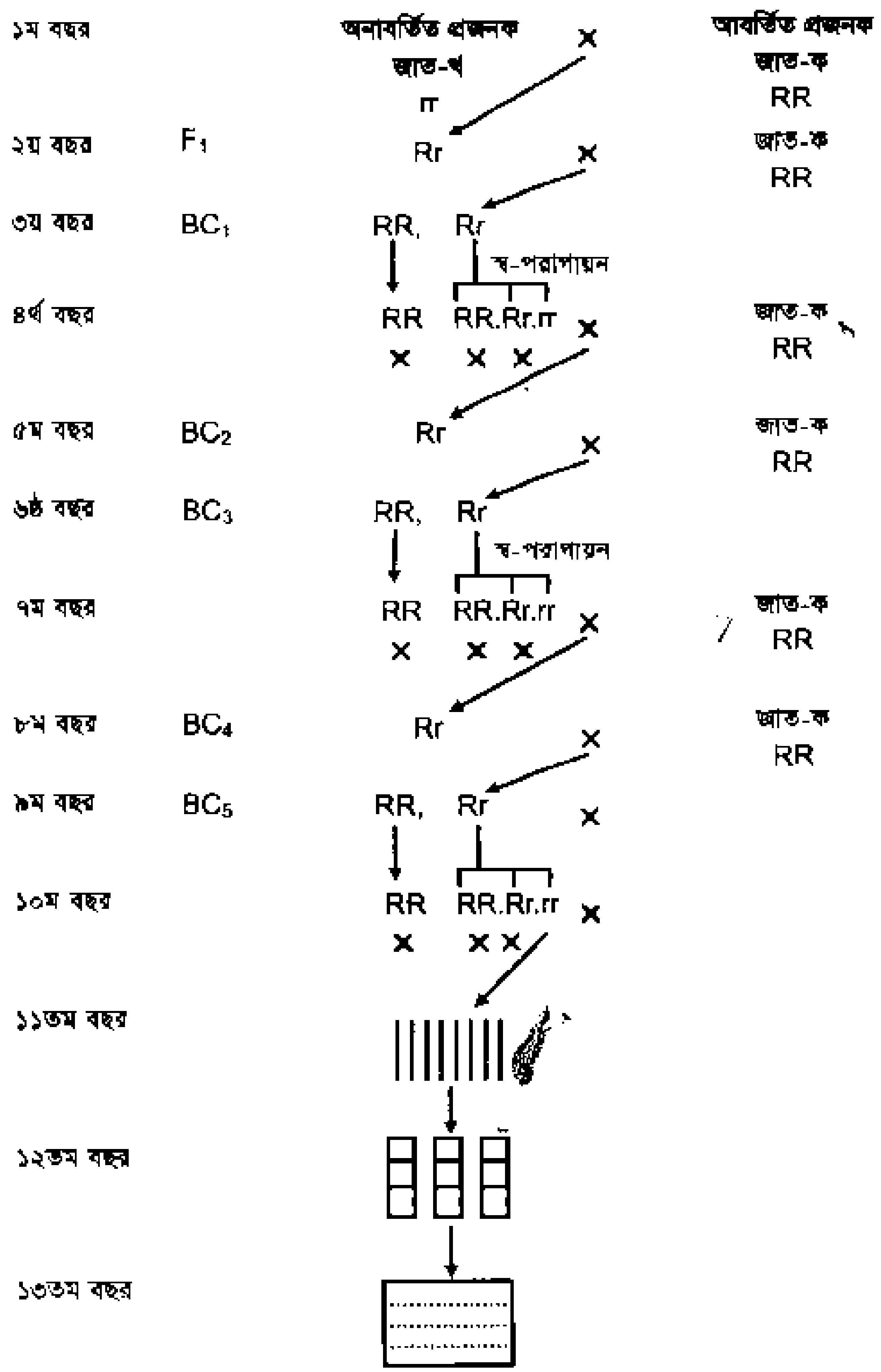

চিত্র ৩.৪ : স্ব-পরাগী ফসলে ব্যাকক্রসের মাধ্যমে জিন নিয়ন্ত্রিত রোগ প্রতিরোধ বৈশিষ্ট্যের স্থানান্তর

৩.২ পরপরাগী ফসলের নির্বাচন

পরপরাগী ফসলের প্রজনন কিছুটা জটিল এজন্যই যে, এদের পরপরাগায়ন স্বভাবের জন্য এদের বাঞ্ছিত গঠন রক্ষা করা খুব কঠিন। এদের জেনেটিক গঠন হেটেরোজাইগাস

প্রকৃতির। ফলে এদের জাতগুলোতে হেটেরোজাইগোসিটি রক্ষা করার প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানীরা নানা রকম রিকারেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি (recurrent selection method) উদ্ভাবন করেছেন। এ ধরনের নির্বাচনের মূলকথা হলো কাঙ্ক্ষিত ধরনের গাছ নির্বাচন করে পরবর্তী বংশধরে কেবল নির্বাচিতদের মধ্যে মুক্ত পরাগায়ন করার সুযোগ দেয়া এবং পুনরায় নির্বাচন করে ক্রস করার সুযোগ সৃষ্টি করা। উদ্দেশ্য হলো- যত বেশি সংখ্যক সম্ভব কাঙ্ক্ষিত জিন বাড়ানো। একসময় নতুন যে উদ্ভিদ সমষ্টি সৃষ্টি হয় তা যে উদ্ভিদ সমষ্টিতে নির্বাচন শুরু করা হয় তা থেকে উত্তম হয় বলে একে নতুন জাত হিসাবে বাজার জাত করা সম্ভব হয় অনেক ক্ষেত্রেই। হাইব্রিড জাত সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরাগ সংযোগ একটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রতি বছরই নির্দিষ্ট যোজনক্ষম দুটি প্রজনককে বিভিন্ন অনুপাতে এমনভাবে মাঠে লাগানো হয় যেন স্ত্রী লাইন সহজেই পুরুষ লাইনের পরাগরেণু দ্বারা পরাগায়িত হতে পারে। প্রাকৃতিকভাবে পরাগ সংযোগ যত সহজ ও কার্যকর হবে হাইব্রিড জাতের বীজ তৈরি করার উৎপাদন খরচ তত কম হবে এবং উৎপাদিত বীজের পরিমাণও তত বেশি হবে। হাইব্রিড জাত তৈরির জন্য অবশ্য নিয়মিত নির্দিষ্ট দুটি প্রজনকের মধ্যে প্রতি বছরই সঙ্করায়ন করতে হয়। পদ্ধতিটি স্ব-পরাগী এবং পরপরাগী ফসলে প্রায় একই রকম। পার্থক্য শুধু এটুকু যে পরপরাগী ফসলে দুটি প্রজনক পাশাপাশি লাগালে এদের পরপরাগী স্বভাবের জন্যই পরপরাগায়ন সম্পন্ন হয় কিন্তু স্ব-পরাগী ফসলে হয় হাত দিয়ে পুরুষ গাছের পুংরেণু স্ত্রীরেণুর গর্ভমুণ্ডে সংযোজন করার প্রয়োজন হয় অথবা অন্য কোনোভাবে কৃত্রিম পরাগায়ন সম্পন্ন করতে হয়। ধানের ক্ষেত্রে যেমন পরাগায়ন সম্পন্ন করার জন্য দড়ি দিয়ে টেনে দিতে হয়।

৩.৩. নতুন রূপের ধানের জাত উদ্ভাবন

এসব আধুনিক ধানের জাত সৃষ্টি করেও কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলেন না বিজ্ঞানীরা। কারণ একটাই। ধান উৎপাদন বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে দিন দিন কমে যাচ্ছে। গত শতাব্দির একেবারে শেষে এসে আমরা যে ধানের উল্লেখযোগ্য ফলন বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছি তা হয়েছিল মূলত দুটি কারণে। এর একটি হলো আধুনিক ধানের জাতের আবাদ বেড়ে যাওয়া এবং অন্যটি হলো ফসলের উন্নত ব্যবস্থাপনা করা। পৃথিবীতে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে করে ২০২০ সালে নাগাদ জনসংখ্যা হবে ৬.৫ বিলিয়ন আর এর ৫ বছর পর অর্থাৎ ২০২৫ সালে তা হবে ৮.২ বিলিয়ন। ধান আবাদের এলাকা আর বাড়ানো যাবে সে সম্ভাবনাও কম। ১৯৮০ সালে থেকেই ধানের আবাদের এলাকা থিতু হয়ে আছে। ফলে অল্প জমিতে অধিক ফসল ফলাবার অর্থই হলো প্রতি একক ক্ষেত্রে ফলন বৃদ্ধি করা। এরকম বাস্তবতাকে সামনে রেখে নতুন ধরনের ধান সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর হলেন বিজ্ঞানীরা। ভাবলেন এমন এক রকম ধান সৃষ্টি করতে যার মধ্যে অনেকগুলো জাত থেকে অনেকগুলো কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসা হবে ক্রসের মাধ্যমে।

১৯৮৯ সালে একটি নতুন উদ্ভিদাকৃতির ধান সৃষ্টির সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য ইরিতে অনুষ্ঠিত সভায় যোগ দেন উদ্ভিদ প্রজননবিদ, কৃষিতত্ত্ববিদ আর উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ববিদগণ। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তালো যথারীতি ইরির মুখ্য উদ্ভিদ

প্রজননবিদ ড. গুরুদেব খোশ (Dr. Gurdev Khush) এর উপর। ড. খোশ তাঁর দলবল নিয়ে কেমন হবে নতুন উদ্ভিদাকৃতিটি দেখতে তার রূপরেখা নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। প্রথমেই তাঁদের কাছে এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে বিদ্যমান ধানের কাঠামো থেকে হার্ভেস্ট ইনডেক্স বড়ানো সম্ভব নয়। সে জন্য এমন কাঠামোসম্পন্ন ধান উদ্ভাবন করতে হবে যার মোট জীবভর (biomass) হবে বিদ্যমান আধুনিক ধানের চেয়ে অধিক। পাশাপাশি এদের হার্ভেস্ট ইনডেক্স অর্থাৎ দানা ও খড়ের অনুপাত হবে অধিক। নতুন উদ্ভিদাকৃতির ধানের কাণ্ড হবে আরও শক্তিশালী যেন মাথায় দানার প্রচুর ভার নিয়েও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এদের মূল হবে বড় -যাতে মাটির ভেতরে আগের তুলনায় বহুদূর পৌঁছে যেতে পারবে । এদের পাতাগুলো হবে পুরু আর গভীর সবুজ। এদের প্রতিটি শীষে দানার সংখ্যা হবে ২০০-২৫০ যেখানে আধুনিক উফশী জাতে এ সংখ্যা ১০০ থেকে ১২০ মাত্র। তাদের এ ধানের কুঁশি উৎপাদন ক্ষমতা হবে আগের ধানের তুলনায় কম অর্থাৎ চার পাঁচটি কুঁশিই যথেষ্ট। আধুনিক ধানের জাতগুলো তৈরি করে ২৭টি পর্যন্ত কুশি যেখানে উৎপাদনশীল কুঁশির সংখ্যা মাত্র ১৫টি বা ১৬টি। নতুন ধরনের এই জাতে একটিও অনুৎপাদনশীল কুঁশি থাকবে না। খাদ্য এমনি এমনি খরচ হয়ে যাবে তা মেনে নিতে রাজী নয় বিজ্ঞানীরা। নতুন উদ্ভিদ কাঠামোতে থাকবে মাত্র ৪টি কি ৫টি কুঁশি এই হলো তাদের প্রত্যাশা। প্রত্যাশিত সে উদ্ভিদাকৃতি পাবার লক্ষ্যে ইরিতে কাজ শুরু হলো। তারা ইন্দোনেশিয়ার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জাপোনিকা ধানের তথাকথিত “বুলু” জাতের মধ্য থেকে বাছাই করে নিলেন প্রধান কাঁচামাল। শুরু হলো সঙ্করায়নের দীর্ঘ পর্ব। অনেক উৎস থেকে জিনগুলো একত্রিত করা হবে বলে সঙ্করায়নের পরিকল্পনাও সেভাবে করা হলো। অবশেষে তাদের কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদাকৃতি মিললো বটে কিন্তু কাঙ্ক্ষিত কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের অভাবও থেকে গেল এতে। শুরুতে এদের ফসল পাকতে সময় লেগে গেল ১৮০ দিন। ক্রমে এর পরিপক্বতা কালকে কমিয়ে আনা হলো ১১০ দিনে যেন কৃষক অনায়াসে বছরে দুটি ফসল জন্মাতে পারে। নতুন আকৃতির উদ্ভিদ ব্যর্থ হলো কাঙ্ক্ষিত হার্ভেস্ট ইনডেক্স দিতে। এদের অনেকগুলো দানা পূর্ণ হতে ব্যর্থ হলো। এদের দানার অপূর্ণতা সমস্যা কাটিয়ে উঠতে লেগে গেল আরও তিনটি বছর।

বিজ্ঞানীরা এবার লক্ষ্য করলো যে, ৪-৫টি কুঁশিসম্পন্ন ধান গাছ অপেক্ষা ৯-১০টি কুঁশি সম্পন্ন গাছ অধিক কার্যকর হতে পারে। এবার সঙ্করায়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলো আধুনিক উচ্চ ফলনশীল জাতগুলো থেকে বাছাই করে নেয়া ক'টি জাত। এদের রোগ ও কীটপতঙ্গের আক্রমণ সইবার ক্ষমতা রয়েছে । নতুন উদ্ভিদকৃতিতে সংযোজিত হলো নানারকম রোগ আর কীট প্রতিরোধিতা। সমস্যা দেখা দিল অন্য আর একটি। এদের দানাগুলো ছোট আর হৃষ্টপুষ্ট। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকার লোকজনের পছন্দ হলো লম্বা ও সরু দানা। সে লক্ষ্যেই নতুন করে সঙ্করায়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলো আরও কিছু জাত। এসব নতুন উদ্ভিদাকৃতি সম্পন্ন ধান ইরি থেকে পৌঁছে দেয়া হলো অন্য কিছু দেশে। উদ্দেশ্য ছিল নিজ নিজ পরিবেশে এসব ধানের অভিযোজ্যতার পাশাপাশি নিজস্ব চাহিদানুযায়ী এদের উন্নয়ন সাধন। গত ১৯৯৯ সালে চীনে এরকম

একটি লাইন ছাড়করণ করা হয় কৃষকের আবাদের জন্য। উক্ত লাইনটি তাদের চাহিদা সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারেনি। তবে এর উন্নয়নের কাজ চলছে সেখানেও। ইরির উদ্ভাবিত নতুন উদ্ভিদাকৃতি বাংলাদেশেও এসে পৌঁছেছে। এখানেও মাঠ পর্যায়ে যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। নতুন শতাব্দিতে অধিক ফলনশীল 'সুপার ধান' কৃষকের মাঠে পৌঁছে যাবে প্রথম দশকেই এমনটি অনুমান করা চলে।

৩.৪. আন্তঃপ্রজাতি ও আন্তঃগণ সঙ্করায়ন

ফসলের কোনো প্রজাতির দুই বা দুইয়ের অধিক জাতের মধ্যে বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ একটি উদ্ভিদে নিয়ে আসার লক্ষ্যেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাগ বিনিময় ঘটানো হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার এক প্রজাতির উদ্ভিদ থেকে বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর করতে হয়েছে অন্য প্রজাতির উদ্ভিদে। এ কাজটি যে খুব সহজ ছিল তা নয়। যে সব ফসলের ক্ষেত্রে এক প্রজাতির সঙ্গে অন্য প্রজাতির সঙ্করায়ন সহজে সংঘটিত হয় সেখানে বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর করা বেশ সহজ। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আন্তঃপ্রজাতি সঙ্করায়ন করা বেশ কঠিন। অনেক ক্ষেত্রে পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে অঙ্কুরিত হয় না। কোনো কোনো আবার পরাগরেণু গজিয়ে যে নল তৈরি হয় তা গর্ভদণ্ডের মধ্য দিয়ে অল্প কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর থেমে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরাগ নল আবার ডিম্বকে পৌঁছার পূর্বেই থেমে যায়। এসব নানা কারণে ভ্রূণ তৈরি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সস্য (endosperm) তৈরি হয় না বলে সঙ্কর বীজ পাওয়াই অসম্ভব হয়ে পড়ে। আন্তঃপ্রজাতি এবং কোনো কোনো ফসলে আন্তঃগণ পরাগ সংযোগ করেও উন্নয়ন তরান্বিত করা হয়েছে। গমের ক্ষেত্রে আন্তঃ প্রজাতি এবং আন্তঃগণ দুই রকমের সঙ্করায়ন করেই বুনো আধা-বুনো প্রজাতি বা গণ থেকে একটি বা দু'টি বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর করা হয়েছে আবাদি গমে। প্রচলিত পরাগ সংযোগ পদ্ধতিতে বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর সম্ভব হয়েছে কেবল সেসব প্রজাতির মধ্যে যেগুলোর সঙ্গে সঙ্করায়ন করা সম্ভবপর হয়েছে। ভ্রূণ আবাদ কৌশল প্রয়োগ করে জিন স্থানান্তরের সীমাটিকে বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে প্রজননবিদগণ। অসঙ্গতিপূর্ণ বহু সঙ্করায়ন কৃতকার্য করা হয়েছে ভ্রূণ আবাদ কৌশল প্রয়োগ করে।

নানা উপায় অবলম্বন করে বিজ্ঞানীরা এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর করবার চেষ্টা করেছেন। কখনও এক প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা বাড়িয়ে সঙ্করায়ন ঘটিয়েছেন অন্য প্রজাতির সঙ্গে। কখনও আবার সঙ্করায়নের পূর্বে ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণীত করা হয়েছে দুটি প্রজাতিরই। কখনও আবার ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক করে নেয়া হয়েছে একটি বা দুটি প্রজাতিরই। এমনও ঘটেছে কখনও কখনও যে, প্রথম বৈশিষ্ট্যটি স্থানান্তর করা হয়েছে একটি প্রজাতি থেকে তৃতীয় একটি প্রজাতিতে। পরবর্তীকালে তৃতীয় প্রজাতি থেকে তা ক্রসের মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয়েছে ফসলের প্রজাতিতে।

আজকাল অবশ্য কোষকলা আবাদ কৌশলের কারণে অনেক ক্ষেত্রে আন্তঃপ্রজাতি বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর সহজতর হয়েছে। যেসব আন্তঃপ্রজাতি সঙ্করায়ন ভ্রূণ তৈরি করে কিন্তু সস্য তৈরি করতে ব্যর্থ হয় সেসব ক্ষেত্রে কচি বীজ থেকে আলতোভাবে ভ্রূণটাকে জীবাণুমুক্ত অবস্থায় তুলে এনে কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে সহজেই জন্মানো যায়। এভাবে

সঙ্কর বীজ না পেলেও পাওয়া সম্ভব হয় সংকর উদ্ভিদ। এ কৌশল আবিস্কৃত হওয়ায় কেবল আন্তঃ প্রজাতি নয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে জিন স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে এক গণ থেকে অন্য গণেও। আন্তঃ জাত সঙ্করায়নের ক্ষেত্রে যেমন দুটি প্রজাতির অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম চলে আসে সন্তানে। আন্তঃপ্রজাতি সঙ্করায়নের ক্ষেত্রেও তা ঘটে বটে। তবে নানা কায়দায় এক প্রজাতির উদ্ভিদের অধিকাংশ ক্রোমোজোম রক্ষা করে অন্য প্রজাতির একটি দুটি কাঙ্ক্ষিত ক্রোমোজোম বা কাঙ্ক্ষিত ক্রোমোজোম অংশ কিংবা কাঙ্ক্ষিত জিন ঐ প্রজাতিতে সংযোজন করার চেষ্টা নেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে বুনো প্রজাতির সঙ্গে আবাদি প্রজাতির সঙ্করায়ন করা হয় বলে লক্ষ্য থাকে বুনো প্রজাতির কেবলমাত্র কাঙ্ক্ষিত জিনটিকে আবাদি প্রজাতিতে নিয়ে আসা। আন্তঃপ্রজাতি বা আন্ত :গণ সঙ্করায়নের উদ্দেশ্য হলো কোনো প্রজাতির বিভিন্ন জাতের মধ্যে পাওয়া যায়না তেমন বৈশিষ্ট্য অন্য প্রজাতি বা গণ থেকে আবাদি প্রজাতিতে নিয়ে আসা। এভাবে রোগ বালাই প্রতিরোধী জিন সংযোজন করা হয়েছে আমাদের ফসলে। সংযোজন করা হয়েছে কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী জিন। কখনও আবার গুণমানও সংযোজন করে নেয়া হয়েছে কোনো কোনো ফসলে।

৪. বাংলাদেশের ফসলে সঙ্করায়ন

বাংলাদেশে ফসল উন্নয়নের জন্য সঙ্করায়ন কর্মসূচি শুরু হয় বেশ বিলম্বে। গত শতাব্দির দ্বিতীয় দশকের একেবারে গোড়াতে যদিও স্থানীয় জাতসমূহের মধ্যে সঙ্করায়ন ঘটানো হয় কিন্তু সে সময় ফসল উন্নয়ন নয় বরং উদ্ভিদের নানা বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ নিয়ে গবেষণা করা ছিল মূল বিষয়।

৪.১. ধান উন্নয়ন

আগাম জাতের আউশের সঙ্গে উচ্চতর ফলনশীল নাবী জাতের সঙ্করায়ন করা হয় আগাম উচ্চতর ফলনশীল আউশ জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে। 'পসুর' এবং 'দুলার' নামক দুটি জাতও পাওয়া যায় এসব সঙ্করায়ন থেকে। রোপা আমনের দানার গুনগত মান বৃদ্ধি এবং আগাম পরিপক্ব স্বভাবের রোপা আমনের জাত সৃষ্টির জন্য সঙ্করায়ন কর্মকাণ্ড শুরু হয় প্রথম দিকে। কখনো রোপা আমনের বিভিন্ন জাতের মধ্যে সঙ্করায়ন করা হয় আবার রোপা আমন জাতের সঙ্গে বিদেশ থেকে সংগৃহীত জাতেরও সঙ্করায়ন করা হয় কখনো। এসব ক্রস থেকে বাছাই করতে করতে পাওয়া যায় 'দাউদিন', 'চিতরাজ', 'ইসাশাইল', 'জিন্নাহ শাইল' এবং 'লিয়াকতশাইল' জাতের রোপা আমন। চল্লিশের দশকে মূলত এসব জাত অবমুক্ত করা হয়।

পঞ্চাশের দশকে এসে সঙ্করায়ন কর্মসূচির ফলে রোপা আমন ধানের দু'টি জাত Hbj. A. VI এবং Hbj. A. VII অবমুক্ত করা হয় হবিগঞ্জ স্টেশন থেকে। সমসাময়িক সময়ে [illegible] সংকরায়ণ করে অবমুক্ত করা হয় দুটি জাত। এদের নাম হলো Hbj. B. VII এবং Hbj. B. VIII। এদের ফলন স্থানীয় জাত অপেক্ষা কিছুটা উন্নত ছিল [illegible] আধুনিক ধানের জাতের চেয়ে এদের ফলন ছিল বেশ কম।

১৯৬৬ সালে এসে উন্নত স্থানীয় জাতের সঙ্গে এদেশে চীন থেকে প্রবর্তিত কিন্তু এদেশে ভালো ভাবে অভিযোজিত তেমন চীনা লাইনের সংকরায়ণ শুরু করা হয়। এ

কর্মসূচি থেকে নতুন জাত বেড়িয়ে আসতে আমাদের অপেক্ষা করতে হয় ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত। 'বিপ্লব' নামক জাতটি অবমুক্ত করা হয় লতিশাইলের সঙ্গে ইরি লাইন IR 506-133-1এর ক্রসের ফলে প্রাপ্ত জাতক থেকে। খর্বাকৃতির জাতগুলোর অভিযোজনক্ষমতা দেশের বিভিন্ন কৃষি প্রতিবেশিক এলাকায় ভিন্নতা প্রর্দশন করায় ব্রি বিজ্ঞানীরা কিছুটা ভিন্নতর উদ্ভিদাকৃতির কিন্তু উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত সৃষ্টির কর্মকাণ্ড শুরু করেন। খর্বাকৃতির জাতের পরিবর্তে আধা-খর্বাকৃতির জাত সৃষ্টি করে এ সমস্যা সমাধান করেন। বিজ্ঞানীরা BR-4 জাতে নতুন উদ্ভিদাকৃতি পেতে সক্ষম হন। এরই ধারাবাহিকতায় আসে BR8, BR9, BR10, BR11 এবং BR14 জাতগুলো (সারণি ৩.১)।

সারণি ৩.১ : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে সঙ্করায়নের (প্রবর্তিত কৌলিবস্তু ও ইনস্টিটিউটে সৃষ্ট কৌলিবস্তু) মাধ্যমে প্রাপ্ত ধানের জাত।

নাম	সঙ্করায়নে ব্যবহৃত প্রজনকসমূহ	অনুমোদন সাল	প্রতিষ্ঠান
বি আর ১ (চান্দিনা)	আইআর২৬২-২৪-৩ × টিকেএম৬	১৯৭০	BRRI
বি আর ২ (মালা)	সিপি-এসএলও × সিগাডিস	১৯৭১	BRRI
বি আর ৩ (বিপ্লব)	আইআর৫০৬-১-১৩৩ × লতিশাইল	১৯৭৩	BRRI
বি আর ৪ (ব্রিশাইল)	আইআর২০ × আইআর৫-১১৪-৩-১	১৯৭৫	BRRI
বি আর ৫ (দুলাভোগ)	বাদশাহভোগের সঙ্গে প্রাকৃতিক সঙ্করায়ন	১৯৭৬	BRRI
বি আর ৬ (আই আর ২৮)	আইআর৮৩৩-৬-২-১-১ ×আইআর১৫৬১-১৪৯-১ × আইআর১৭৩৭	১৯৭৫	BRRI
বি আর ৭ (ব্রি বালাম)	আইআর১৪১৬-১৩১-৫ × আইআর২২ × সি-৪-৬৩	১৯৭৭	BRRI
বি আর ৮ (আশা)	আইআর২৭২-৪-১-২-জে১ ×আইআর৩০৫-৩-১৭-১-৩	১৯৭৮	BRRI
বি আর ৯ (সুফলা)	আইআর২৭২-৪-১-২-জে১ ×আইআর৮	১৯৭৮	BRRI
বি আর ১০(প্রগতি)	আইআর২০ × আইআর৫-১১৪-৩-১	১৯৮০	BRRI
বি আর ১১ (মুক্তা)	আইআর২০ × আইআর৫-৪৭-২	১৯৮০	BRRI
বি আর ১২ (ময়না)	বিআর১ (চান্দিনা) × আইআর৪২৫-১-১-৩-৮-৩	১৯৮৩	BRRI
বি আর ১৪ (গাজী)	আইআর৫ (ডি) × বিআর৩ (বিপ্লব)	১৯৮৩	BRRI
বি আর ১৫ (মোহিনী)	আইআর১৫৬১-১১৮-১-১ × আইআর১৭৩৭ × সিআর৯৪-১৩	১৯৮৩	BRRI
বি আর ১৬ (শাহী বালাম)	আইআর১৪১৬-১৩১-৫ × আইআর১৩৬৪-৩৭-৩-১ × আইআর১৫৪৮৪-ই৬৬৬	১৯৮৩	BRRI
বি আর ১৭ (হাসি)	জেবাক × আইআর৪৮	১৯৮৫	BRRI

বি আর ১৮ (শাহজালাল)	পেলিটা১-১ × আইআর১১০৮-২	১৯৮৫	BRRI
বি আর ১৯ (মঙ্গল)	আইআর২১৮০-২ × আইআর২১৭৮-১	১৯৮৫	BRRI
বি আর ২০ (নিজামী)	আইআর২৭১-৪-১-২-জে১ × আইআর৫(২৬৪)	১৯৮৬	BRRI
বি আর ২১ (নিয়ামত)	সি২২ × আইইটি১৪৪৪	১৯৮৬	BRRI
বি আর ২২ (কিরণ)	নাইজারশাইল × বিআর৫১-৪৬-৫	১৯৮৮	BRRI
বি আর ২৩ (দিশারী)	ডিএ২৯ × বিআর৪(ব্রিশাইল)	১৯৮৮	BRRI
বি আর ২৪ (রহমত)	সি২২ × আইআর৯৭৫২-১৩৬-২	১৯৯২	BRRI
বি আর ২৫ (নয়া পাজাম)	পাজাম × আইআর২৬	১৯৯২	BRRI
বি আর ২৬ (শ্রাবণী)	আইআর১৮৩৪৮-৩৬-৩-৩ × আইআর২৫৮৬৩-৬১-৩-২ × আইআর৫৮	১৯৯৩	BRRI
ব্রিধান ২৭	কেএন১ বি-৩৬১-১-৮-৬-৯ × সি১৬৮	১৯৯৪	BRRI
ব্রিধান ২৮	বিআর৬ (আইআর২৮) × পূর্বাচী জাত	১৯৯৪	BRRI
ব্রিধান ২৯	বিজি৯০-২ × বিআর৫১-৪৬-৫	১৯৯৪	BRRI
ব্রিধান ৩০	আইআর২০৫৮-৭৮-১-৩-২-৩ × বিআর৪	১৯৯৪	BRRI
ব্রিধান ৩১	বিআর১১ × এআরসি১০৫৫০	১৯৯৪	BRRI
ব্রিধান ৩২	বিআর৪ × বিআর২৬৬২	১৯৯৪	BRRI
ব্রিধান ৩৩	বিজি৩৮৮ × বিজি৩৬৭-৪	১৯৯৭	BRRI
ব্রিধান ৩৪	খাসকানি স্থানীয় ধান থেকে বাছাইকরণ এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়	১৯৯৭	BRRI
ব্রিধান ৩৫	বিআর৪ ×বিআর২৬-৭-৪-১ × এআরসি১৪৫২৯	১৯৯৮	BRRI
ব্রিধান ৩৬	আইআর৬৪ × আইআর৩৫২৯৩-১২৫-৩-২-৩	১৯৯৮	BRRI
ব্রিধান ৩৭	বাসমতি (ডি) × বিআর৫	১৯৯৮	BRRI
ব্রিধান ৩৮	বাসমতি (ডি) × বিআর৫	১৯৯৮	BRRI
ব্রিধান ৩৯	বিআর১১৮৫-২বি-৫৬-২-১-১ × [illegible] বিআর[illegible]	১৯৯৯	BRRI
ব্রিধান ৪০	আইআর৪৮১৬৩-৪-১-১৫ × বিআর১০ (প্রগতি)	২০০০	BRRI
ব্রিধান ৪১	বিআর২৩ × বিআর১১৮৫-৩বি-১৬-১	২০০০	BRRI

সারা দেশের জন্য অভিযোজনক্ষম জাত সৃষ্টির পাশাপাশি নির্দিষ্ট স্থানভিত্তিক জাত তৈরির কাজও এগিয়ে চলে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে। নিচু হাওর এলাকার এরকম তেমনি জাত হলো BR17, BR18, এবং BR19। ১৯৮৬ সালে এসে

উচু ভূমিতে সরাসরি বীজ বপণ করে ফলাবার জন্য তৈরি করা হয় BR20 এবং BR21 জাত দুটি। বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধী জিনের সন্নিবেশন ঘটিয়ে তৈরি করা হয়েছে ধানের জাত। ধানের জাত তৈরি করা হয় কীট প্রতিরোধী জিনের সংযোজন ঘটিয়েও।

এতো গেলো আশির দশকের কথা। গত শতাব্দির শেষ দশকে এসেও ধানের বেশ ক'টি জাত বাজার জাত করা হয়েছে নতুনভাবে। ব্রি-বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি বিনা-বিজ্ঞানীরাও এই দশকে সৃষ্টি করেছে নতুন ধানের জাত।

ব্রি-বিজ্ঞানীরা নব্বইয়ের দশকে তৈরি করেছেন ১৬টি ধানের জাত। এর মধ্যে আউশ ধানের জাত ৩টি, আমন ধানের জাত ৯টি এবং বোরো ধানের জাত ৪টি। বি আর ২৪ থেকে বিআর ৩৯ জাতগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। এ সবগুলো জাতই উদ্ভাবিত হয়েছে এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের পরাগ সংযোগ ঘটিয়ে। ভিনদেশি জাত আর লাইনের মধ্যে যেমন পরাগ সংযোগ ঘটিয়েছেন বিজ্ঞানীরা তেমনি দেশি জাতের সঙ্গে তারা ইরি লাইনের পরাগ সংযোগও ঘটিয়েছেন। কখনও আবার সংঙ্করায়ন ঘটিয়েছেন একাধিক জাত বা লাইনের সঙ্গে একটি জাতকে নতুন জাত সৃষ্টির জন্য। তবে এ দশকে এসে কোনো দেশি ধানের জাত প্রত্যক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি সংঙ্করায়ন কর্মসূচিতে।

বিনা-বিজ্ঞানীরা কেবল যে নানা রকম বিকিরণক্ষম রশ্মি আর রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে বিভিন্ন ফসলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটাবার চেষ্টা করেছেন তা কিন্তু নয়। কখনও কখনও তারা বিভিন্নতা সৃষ্টি করার জন্য সংঙ্করায়ন এবং রশ্মি প্রয়োগ করেছেন যুগপৎভাবে। বিনাধান-৪ পাওয়া গেছে তেমনি বিআর-৪ এর সাথে ইরাটম-৩৮ এর সংঙ্করায়ন করার পর দ্বিতীয় বছরের প্রাপ্ত বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে এবং তা থেকে উদ্ভিদ নির্বাচন করে। ১৯৯৮ সালে এটি চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়। এমনকি কখনও সঙ্করায়ন ও রশ্মি প্রয়োগ আবার কখনও রশ্মি প্রয়োগ ও সঙ্করায়ন করে বেশ ক'টি জাত উদ্ভাবন করেছেন বিনা এর বিজ্ঞানীরা (সারণি ৩.২)।

সারণি ৩.২ : 'বিনা'তে রশ্মি প্রয়োগ ও সঙ্করায়ন অথবা সঙ্করায়ন ও রশ্মি প্রয়োগ করে উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসল

ফসল বা জাতের নাম	ছাড়পত্র প্রাপ্তির বছর	চাষাবাদ কাল	গড় ফলন (হেঃ প্রতি)	উদ্ভাবনের ইতিহাস
ধান				
১। বিনাধান-৪	১৯৯৮	আমন মৌসুম	৪.৭০ টন	বি.আর-৪ এর সাথে ইরাটম-৩৮ এর সঙ্করায়ন করার পর দ্বিতীয় বছরের প্রাপ্ত বীজে (F2 seed) গামা রশ্মি প্রয়োগ করা হয় এবং পরবর্তী বছরগুলোতে বাছাইয়ের মাধ্যমে (৩০০ গ্রে হতে) এই মিউট্যান্ট জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।

ফসল বা জাতের নাম	ছাড়পত্র প্রাপ্তির বছর	চাষাবাদ কাল	গড় ফলন (হেঃ প্রতি)	উদ্ভাবনের ইতিহাস
২। বিনাধান-৫	১৯৯৮	বোরো মৌসুম	৭.০ টন	বি.আর-২৪ এর সাথে দুলার এর সঙ্করায়ন করার পর দ্বিতীয় বছরের প্রাপ্ত বীজে (F2 seed) গামা রশ্মি প্রয়োগ করা হয় এবং পরবর্তী বছরগুলোতে বাছাইয়ের মাধ্যমে (৩০০ গ্রে হতে) এই মিউট্যান্ট জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
৩। বিনাধান-৬	১৯৯৮	বোরো মৌসুম	৭.৫০ টন	ইরাটম-২৪ এর সাথে দুলার এর সঙ্করায়ন করার পর দ্বিতীয় বছরের প্রাপ্ত বীজে (F2 seed) গামা রশ্মি প্রয়োগ করা হয় এবং পরবর্তী বছরগুলোতে বাছাইয়ের মাধ্যমে (৩০০ গ্রে হতে) এই মিউট্যান্ট জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
মুগ				
৪। বিনামুগ-২	১৯৯৪	খরিফ-১ মৌসুম	১.৪০ টন	এম.বি ৫৫(৪) নামক একটি মিউট্যান্ট ও এভিআরডিসি হতে সংগৃহীত একটি গ্রীষ্মকালীন লাইন ভি-২৭৭৩ এর সাথে সঙ্করায়ন করে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
৫। বিনামুগ- ৩	১৯৯৭	রবি মৌসুম	১.০০ টন	গামারশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্ভাবিত মিউট্যান্ট লাইন এমভি-৫৫(৪) এবং এভি আর ডিসি লাইন ভিসি-১৫৬০ এর সঙ্করায়ন করে এ জাতটি উদ্ভাবিত হয়।
৬। বিনামুগ-৪	১৯৯৭	রবি মৌসুম	১.১০ টন	গামারশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্ভাবিত মিউট্যান্ট লাইন এমভি-৫৫(৪) এবং এভি আর ডিসি লাইন ভিসি-১৫৬০ এর সঙ্করায়ন করে এ জাতটি উদ্ভাবিত হয়।

ফসল বা জাতের নাম	ছাড়পত্র প্রাপ্তির বছর	চাষাবাদ কাল	গড় ফলন (হেঃ প্রতি)	উদ্ভাবনের ইতিহাস
৭। বিনামুগ-৫	১৯৯৮	খরিফ-১ মৌসুম	১.৫০ টন	এম.ভি-৫৫(৪) নামক একটি মিউট্যান্ট ও এভিআরডিসি হতে সংগৃহীত একটি গ্রীষ্মকালীন লাইন ভি.সি-১৫৬০ ডি.(এভিআরডিসি হতে সংগৃহীত) এর সাথে সঙ্করায়ন করে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
৮। বিনাছোলা-৪	২০০১	রবি মৌসুম	১.৬৩ টন	বিনা উদ্ভাবিত মিউট্যান্ট জাত হাইপ্রোছোলা একটি বিদেশি জাত K-৮৫০ (ICRISAT হতে প্রাপ্ত) এর সাথে সঙ্করায়ন করে পরবর্তী বছরগুলোতে বাছাইয়ের মাধ্যমে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
টমেটো				
৯। বাহার	১৯৯২	রবি মৌসুম	৬৫ টন	দেশি একটি টমেটো জাতের বিজে গামা রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে "আনবিক" নামে একটি মিউট্যান্ট উদ্ভাবন করা হয়। উক্ত মিউট্যান্টের সাথে সঙ্করায়ন করে উক্ত জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
১০। বিনাটমেটো-২	১৯৯৭	গ্রীষ্ম কালীন	৩৮ টন	একটি স্থানীয় জাতের বীজে গামারশ্মি প্রয়োগ করে এস-১ নামে মিউট্যান্ট উদ্ভাবন করা হয়। উক্ত মিউট্যান্টের সাথে শীতকালীন টমেটো জাত বাহারের সাথে সঙ্করায়ন করে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
১১। বিনাটমেটো-৩	১৯৯৭	গ্রীষ্মকালীন	৪০ টন	একটি স্থানীয় জাতের বীজে গামারশ্মি প্রয়োগ করে এস-১ নামে মিউট্যান্ট উদ্ভাবন করা হয়। উক্ত মিউট্যান্টের সাথে শীতকালীন টমেটো জাত বাহারের সাথে সঙ্করায়ন করে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়

৪.২. আখ উন্নয়ন

আখে পরাগ বিনিময়ের কাজটি আমাদের দেশে বেশ আগে শুরু হয়েছে। তবে আখে বরাবরই ভিনদেশি জাতের অধিক প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেছে। ভারতের কোইম্বাটরে উদ্ভাবিত জাত এদেশের আখ জাতের প্রধানতম উৎস হিসেবে কাজ করেছে। সরাসরি কোইম্বাটরে উদ্ভাবিত জাত থেকে কোনো কোনো জাত এদেশে যাচাই-বাছাই করে অবমুক্ত করা হয়েছে, তবে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, ভারত থেকে আমদানি করা বিভিন্ন জাতের মধ্যে পরাগ সংযোগ করে এদেশে অনেক আখ জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। ১৯৬৭ সালে অবমুক্ত আখে ৯টি জাতের মধ্যে ৬টি জাতই উদ্ভাবন করা হয়েছে ভারত থেকে প্রাপ্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতের মধ্যে ক্রস করে ও নির্বাচন সম্পন্ন করে। ঈশ্বরদী ২/৫৪, ৪/৫৫, ৬/৫৬, ৭/৫৭, ৮/৫৭, ৯/৫৭ সহ সাতষট্টিটি অবমুক্ত জাত আন্তঃজাত সঙ্করায়নের ফসল।

সারণি ৩.৩ : বাংলাদেশ আখ গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে সঙ্করায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত আখের জাত

ক্রমিক নং	জাতের নাম	পিতা-মাতার পরিচয়	অবমুক্তির বছর
১.	Isd. 1/53	Co. 638 × ?	১৯৬৭
২.	Isd. 2/54	Co. 535 × Co. 381	১৯৬৭
৩.	Isd. 3/54	Co. 535 × ?	১৯৬৭
৪.	Isd. 4/55	Co. 370 × Co 620	১৯৬৭
৫.	Isd. 5/55	Co. 356 × ?	১৯৬৭
৬.	Isd. 6/56	Co. 645 × ?	১৯৬৭
৭.	Isd. 7/57	Co. 508 × Co 356	১৯৬৭
৮.	Isd. 1/57	Cos 146 × ?	১৯৬৭
৯.	Isd. 9/57	Cos 146 × Co 642	১৯৬৭
১০.	Isd. 10/58	Cos 149 × Co 642	১৯৬৯
১১.	Isd. 11/58	Cos 149 × Co 642	১৯৬৯
১২.	Isd. 12/58	Cos 146 × Co 742	১৯৬৯
১৩.	Isd. 13/58	Cos 146 × Co 642	১৯৬৯
১৪.	Isd. 14/60	Cos 146 × Co 642	১৯৬৯
১৫.	B.S. 96	Cos 640 × Bo 32	১৯৭৪
১৬.	Isd. 16	Cp 36/13 × Bo 32	১৯৮১
১৭.	L. Jaba-C	Local selection	১৯৮২
১৮.	Isd. 17	Co 631 × Bo 22	১৯৮৪
১৯.	Isd. 18	Co 631 × Bo 22	১৯৮৮
২০.	Isd. 19	CoL. 33 × Co 6502	১৯৮৮

ক্রমিক নং	জাতের নাম	পিতা-মাতার পরিচয়	অবমুক্তির বছর
২১.	Isd. 20	CO 1148 × Misrilal	১৯৯০
২২.	Isd. 21	F 31/762 × CO 969	১৯৯০
২৩.	Isd. 27	CP 70-1133 × POJ 2878	১৯৯৩
২৪.	Isd. 28	CO 1158 × CO 530	১৯৯৬
২৫.	Isd. 29	Isd. 16 × CP 50-72	১৯৯৮
২৬.	Isd. 30	I 24-76 × I 147-77	২০০০
২৭.	Isd. 31	I 322-86 × CP 50-72	২০০০
২৮.	Isd. 32	CO 1158 × BO 43	২০০২
২৯.	Isd. 33	CoL 29 × My 54129	২০০২

উনসত্তরে অবমুক্ত ইক্ষুর ৫টি জাত ঈশ্বরদী- ১০/৫৮, ১২/৫৮, ১৩/৫৮ ও ১৪/৬০ আন্তঃজাত ক্রসের ফলে সৃষ্ট জাত। আমেরিকার ইক্ষু জাত সি.পি. (Canal point) ৩৬/১৩ এর সঙ্গে ভারতীয় জাত বি.ও.(বিহার উড়িষ্যা) ৩২ এর পর- পরাগায়ন থেকে পাওয়া গেছে ইক্ষুর বিখ্যাত জাত ঈশ্বরদী ১৬। ইক্ষুতে কেবল দু'টি নির্দিষ্ট প্যারেন্টের মধ্যেই ক্রস করা হয়েছে তা নয়। কখনো কখনো একটি জাতের সঙ্গে অনেকগুলো জাতের পর-পরাগায়ন ঘটানো হয়েছে । এ ধরনের পলিক্রস থেকেও তৈরি করা হয়েছে ইক্ষুর দু' একটি জাত। এরই একটি হলো ঈশ্বরদী-৩৬ যার হেক্টর প্রতি ফলন ৮৮ টন (সারণি ৩.৩)।

ধানে এবং ইক্ষুতে যত বেশি সঙ্করায়ন এদেশে করা হয়েছে অন্য আর কোনো ফসলে এত সঙ্করায়ন করা হয়নি। এর কারণ দুটি। এক, অন্য অনেক ফসলে বাইরের কোন উৎস থেকে যে প্রজনন লাইন পাওয়া গেছে তা দিয়েই ফসল উন্নয়নের কাজ চলেছে এবং দুই, সঙ্করায়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে ফসলে বিভিন্নতা সৃষ্টি করার কাজটি একেবারে সহজ নয়। বিদেশ থেকে প্রাপ্ত প্রজনন লাইনের উপর তাদের নির্ভরতা অধিক। সঙ্করায়ন একটি অতি শক্তিশালী বিভিন্নতা সৃষ্টির মাধ্যম। দুটি প্রজনকের জিনগুলো নতুন সংযোগ ও পুনঃ সংযোগ তৈরির মাধ্যমে যে বিভিন্নতা পাওয়া যায় তার কোনো তুলনা হয় না। আমাদের নিজস্ব সঙ্করায়ন কর্মসূচি থাকা দরকার প্রতিটি ফসলেই।

৪.৩ সরিষা উন্নয়ন

সঙ্করায়নের মাধ্যমে গত শতাব্দিতে সরিষার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য জাত উদ্ভাবন করা হয়নি এদেশে। তবে সুইডেনে এদেশের কিছু জাত এবং সুইডেনের কিছু জাতের মধ্যে সঙ্করায়ন এবং ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণীত করার মাধ্যমে এদেশের বিজ্ঞানীরা নতুনভাবে পুনঃউদ্ভাবন করেছেন সরিষার *Brassica napus* প্রজাতি -তা থেকে বিভিন্ন বংশধরে এদেশের আবহাওয়ায় নির্বাচন চালিয়ে এদেশে আবাদযোগ্য নেপাস সরিষার দুটি জাত ১৯৯৪ সালে অবমুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এদেশে নেপাস সরিষার আবাদ শুরু হয়েছে একেবারে নতুন করে।

স্বল্পমেয়াদি উচ্চ ফলনশীল জাত সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে সরিষার আন্তঃ প্রজাতি সঙ্করায়ন লেখক শুরু করেছেন। *Brassica campestris* প্রজাতির সঙ্গে সঙ্করায়ন করা হয়েছে *Brassica napus* প্রজাতির। উদ্দেশ্য ছিল স্বল্পমেয়াদি উচ্চ ফলনশীল জাত বাছাই করে নিয়ে আসা নানা বংশধর ধরে নির্বাচন চালিয়ে। এ কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালে এসে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে স্বল্পমেয়াদি (৭০-৮০ দিন) হেক্টর প্রতি ১.৭-২.০ টন ফলন দিতে সক্ষম 'এস এ ইউ সরিষা-১ নামক জাত। এর কিছুদিন পর উদ্ভাবন করা হয়েছে এস এ ইউ-২ নামক জাতটি।

৪.৪. গম উন্নয়ন

গমের ক্ষেত্রে এদেশে সঙ্করায়নের সংখ্যা ন্যূনতম। গম উন্নয়নের মূল উৎস হিসেবে কাজ করেছে বরাবরই CIMMYT-এ সঙ্করায়ন থেকে প্রাপ্ত পুরোগামী লাইনসমূহ।

৪.৫. পাট উন্নয়ন

পাটের ক্ষেত্রে পাটের প্রধান দুটি প্রজাতির মধ্যে সঙ্করায়ন করে ভিন্নতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি এদের পারস্পরিক অসঙ্গতির কারণে। তবে স্ব স্ব প্রজাতির অন্তর্গত জাতগুলোর মধ্যে পরাগ সংযোগের কাজ শুরু হয়েছে ১৯৭৭ এর পর। দেশি পাটে সঙ্করায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট বিভিন্নতা থেকে নির্বাচিত জাত সিসি ৪৫ (জো-পাট) ১৯৭৯ সালে অবমুক্ত করার মধ্য দিয়ে পাটের জাত উদ্ভাবন একটি নতুন মাত্রা পায়। এ জাতটি ছিল আগাম পরিপক্ব স্বভাবের এবং আলোক সংবেদনহীন।

বি জে আর আই দেশি-৫ জাতটি উদ্ভাবন করেছে প্রতিকূল পরিবেশ ক্ষমতাসম্পন্ন ডি-১৫৪ ও অকাল ফলমুক্ত দীর্ঘ বপনকালোপযোগী জাত সিসি-৪৫ এর সঙ্গে পরাগ সংযোগ করে। প্রচলিত জাতের মধ্যে ক্রস করেও সৃষ্টি করা হয়েছে দেশি পাটের উন্নত জাত। প্রচলিত জাত সিভিএল ১ এর সঙ্গে আশু পরিপক্ব জাত ফুলেশ্বরীর যৌন মিলনে তৈরি করেছে বি জে আর আই-দেশি ৬ জাতটি। এটি অবমুক্ত করা হয় ১৯৯৫ সালে। নীল বীজযুক্ত সাদা পাট (CBS) এর সঙ্গে ডি ১৫৪ জাতটির সঙ্করায়ন থেকে এসেছে বিজেসি ২১৪২। ঘুরে ফিরে সঙ্করায়নে জনপ্রিয় পাট জাত ডি-১৫৪ কে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি আসলে ১৯১৯ সালে স্থানীয় জাত থেকে বিশুদ্ধ লাইন নির্বাচন করে পাওয়া একটি জাত। আঁশের জন্য মেস্তা ও কেনাফের আবাদ শুরু হয় সত্তরের দশকের শেষের দিকে। যথেষ্ট প্রশস্ত কৌলিক ভিত্তি না থাকায় এদের সঙ্করায়ন কর্মসূচি শুরু হয়েছে বেশ বিলম্বে অর্থাৎ বিগত শতাব্দির আশির দশকে আইজেও কর্তৃক বিশ্ব জার্মপ্রাজম সংগ্রহ করা হলে আন্তঃজাত প্রজাতি সঙ্করায়ন শুরু হয়।

৪.৬. অন্যান্য ফসল উন্নয়ন

যেসব ফসলের হাইব্রিড জাতে এদেশে উদ্ভাবন করা হয়েছে, যদিও এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য, প্রতিটি হাইব্রিডের জন্য নির্বাচিত দুটি করে জাত বা লাইনের মধ্যে পরপরাগায়ন ঘটিয়ে এগুলো উদ্ভাবন করা হয়েছে। ১৯৮৬ সালে বারি সবজি বিজ্ঞানীরা পদ্মা নামে একটি তরমুজের F_1 জাত আবাদের জন্য অবমুক্ত করেন। যদিও এ জাতটি যে

জনপ্রিয়তা পেয়েছে সে তথ্য আমাদের জানা নেই। এ প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা অবমুক্ত করেছেন বারি টমেটো ১০ এবং বারি টমেটো ১৩ হাইব্রিড দুটি জাত যথাক্রমে ১৯৯৮ ও ২০০০ সালে। দুটি বেগুনের হাইব্রিড জাতও অবমুক্ত করেছে বারি ১৯৯২ সালে 'শুকতারা' আর 'তারাপুরি' নামে। প্রতিবছর নির্দিষ্ট প্যারেন্টের মধ্যে ক্রস করে উৎপাদন করতে হয়েছে এসব হাইব্রিডের বীজ।

সবজিতে এদেশে নিজস্ব সঙ্করায়ন কর্মসূচি নেয়া দরকার জরুরি ভিত্তিতে। সঙ্করায়ন আর নির্বাচনের পাশাপাশি অনেক সবজিতে উদ্ভাবন করা সম্ভব হাইব্রিড জাত অতি সহজেই। সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সবজি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে উদ্ভিদ প্রজননবিদদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি না করতে পারার কারণে সবজি উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে বলে অনেক বিজ্ঞানীদের ধারণা। দেশের স্বার্থে এ সমস্যা কাটিয়ে উঠাও জরুরি। গত শতাব্দিতে এদেশের সবজিতে যথেষ্ট ভিন্নতা থাকলেও অনেক ফসলে জিন দেয়ানেয়ার কাজটি শুরু করা হয়নি। এমনকি সরিষা, সয়াবিন, তুলা কিংবা গোলআলুতেও এদেশে শুরু করা যায়নি সঙ্করায়নের মতো সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকর ফসল উন্নয়ন পদ্ধতি। অনেক সাফল্যের সঙ্গে এ ব্যর্থতার দায়ভার বিজ্ঞানীদের নিতে হবে। আগামী দিনগুলোতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক পরাগ সংযোগের কর্মটি শুরু করার যে কোনো বিকল্প নেই এ সত্যটি আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করে ফসলের উন্নয়ন

কোষে দুই প্রস্থ ক্রোমোজোম রয়েছে এমন জীবই কিন্তু প্রকৃতিতে বেশি। প্রাণীদের মধ্যে সব উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীই আসলে ডিপ্লয়েড কোষবিশিষ্ট। অর্থাৎ এদের কোষে দুই সেট ক্রোমোজোম রয়েছে– এর এক সেট ক্রোমোজোম এসেছে পিতার কাছ থেকে আর অন্য এক সেট এসেছে মাতার কাছ থেকে। দুই সেটের অধিক ক্রোমোজোম রয়েছে এমন প্রাণীর দেখা মেলা ভার। প্রাণীদের ক্ষেত্রে একটি দুটি ক্রোমোজোমের হ্রাস-বৃদ্ধি বা পুরো এক সেট ক্রোমোজোম হ্রাস-বৃদ্ধি এদের জীবন এবং সন্তান উৎপাদন ক্ষমতাকে সঙ্কটাপন্ন করে তোলে। এদের দৈহিক ও মানসিক অস্বাভাবিকতা ও অনুর্বরতার কারণে পরিণত বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকা এবং সন্তান সৃষ্টি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

গাছ-গাছালির ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি সইবার ক্ষমতা অনেক বেশি। ক্রোমোজোম সেটের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটা বা একটি দুটি ক্রোমোজেমের বাড়তি কমতি অনেক উদ্ভিত প্রজাতিতেই লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য আমাদের অধিকাংশ ফসলই কিন্তু দুই প্রস্ত বা সেট ক্রোমোজোমবিশিষ্ট। এদের তাই ডিপ্লয়েড বা দ্বিপ্রস্থি প্রজাতি, উদ্ভিদ বা ফসল বলে। আমাদের ফসলের মধ্যে দুই সেট, তিন সেট, চার সেট, ছয় সেট বা আট সেট ক্রোমোজোম রয়েছে এমন ফসলের সংখ্যা একেবারে কম নয়। এক হিসেবে জানা গেছে, দুইয়ের অধিক ক্রোমোজোম সেট রয়েছে সেরকম সপুষ্পক উদ্ভিদ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

১. প্রাকৃতিক উপায়ে ক্রোমোজোম সংখ্যা বৃদ্ধি

কোনো প্রজাতির ক্রোমোজোম সেট বৃদ্ধির বিষয়টি কিন্তু সকল ক্ষেত্রে একরকম নয়। কোনো কোনো প্রজাতির উদ্ভিদে দেহ কোষের বা জনন কোষের কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোম সংখ্যা আকস্মিকভাবে প্রাকৃতিক কারণে দ্বিগুণ হয়ে যায়। দেহকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া মানে হলো এর পরের প্রতিটি কোষই হবে দ্বিগুণিতক। এর থেকে যে ফুল, ফল ও বীজ হবে সব কিছুতেই ক্রোমোজোম হবে দ্বিগুণিতক। অন্যদিকে জনন কোষে যদি ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়, তবে স্ত্রী ও পুরুষ গ্যামেট অর্থাৎ পুংরেণু ও ডিম্বাণু হবে দ্বিগুণিতক ক্রোমোজোমবিশিষ্ট। দ্বিগুণিত পুংরেণু ও দ্বিগুণিত ডিম্বাণু মিলে যে বীজ তৈরি হবে তাও কিন্তু হবে দ্বিগুণিত অর্থাৎ দুই সেট অধিক ক্রোমোজোমবিশিষ্ট।

একই গাছের ক্রোমোজোম সংখ্যা এভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে যে পলিপ্লয়েড গাছ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় বা অটোপলিপ্লয়েড (autopolyploid)। দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সঙ্করায়নের ফলে প্রাপ্ত হাইব্রিডের ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণিতক হয়েও কিন্তু

উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। এরকম দ্বিগুণিত উদ্ভিদকে বলা হয় এলোপলিপ্লয়েড (allopolyploid)। পলিপ্লয়েড উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে এদের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ।

এদেশে দু'য়ের অধিক ক্রোমোজোম সেট সম্পন্ন অনেক স্বার্থক ফসল রয়েছে। প্রাকৃতিক উপায়ে আকস্মিকভাবে নিজস্ব ক্রোমোজোম সেটের বৃদ্ধির মাধ্যমে এসব ফসল অধিক সংখ্যক ক্রোমোজোম প্রাপ্ত হয়েছে। ট্রিপ্লয়েড ফসলের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো কলা। ট্রিপ্লয়েড বলেই এদের মিয়োসিস অস্বাভাবিক। এ কারণেই এদের গ্যামেট অনুর্বর। ফল সৃষ্টি হলেও তাই এদের মধ্যে কোনো বীজ তৈরি হয় না। টেট্রাপ্লয়েড ফসলের মধ্যে অন্যতম হলো গোলআলু। হেক্সাপ্লয়েড ফসলের মধ্যে একটি সফল ফসল হলো মিষ্টিআলু। নিজস্ব উদ্ভিদের কোষস্থ ক্রোমোজোম সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে এসব ফসল প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এদের প্রজনন কোষে দুই সেটের অধিক ক্রোমোজোম বিদ্যমান থাকায় এদের মিয়োসিস স্বাভাবিক প্রকৃতির নয়। ফলে এদের অধিকাংশ গ্যামেট অনুর্বর এবং এসব ফসল সাধারণত বীজ তৈরি করে না। এদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, এদের প্রত্যেকটি অযৌন উপায়ে বংশ বৃদ্ধি করে থাকে।

দুই বা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাকৃতিক সঙ্করায়ন এবং ক্রোমোজোম দ্বিগুণনের মাধ্যমে যেসব ফসল উৎপন্ন হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গম, তুলা, তামাক, যই, বাদাম, কফি, আলফা-আলফা, নেপাস সরিষা ও জুনসিয়া বা রাই সরিষা। এদের গ্রন্থি সংখ্যা বেশি হলেও বীজ তৈরিতে এগুলো ভারী দক্ষ। বীজ দিয়েই এদের বংশবিস্তার করা হয়। আর একটি সার্থক পলিপ্লয়েড ফসল হলো আখ। এর ক্রোমোজোম সেট আটটি। এসব পলিপ্লয়েড ফসলের সাফল্য দেখে অন্যান্য ডিপ্লয়েড ফসলের ক্রোমোজোম সংখ্যা বাড়ালে অবস্থা কেমন হয় তা দেখার জন্য বিজ্ঞানীরা গবেষণা করতে থাকেন।

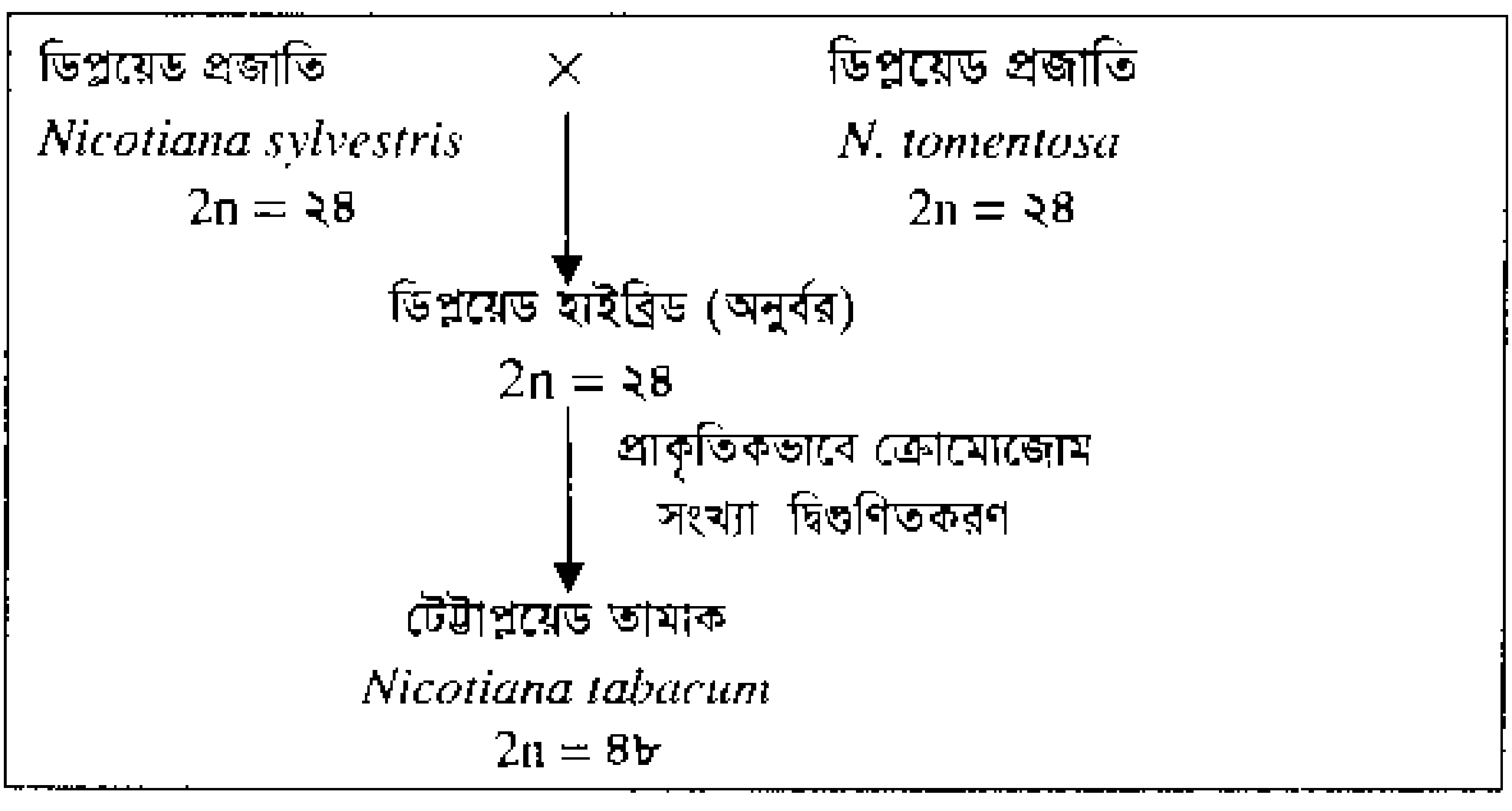

রেখাচিত্র ৪.১ : প্রাকৃতিকভাবে ক্রোমোজোম সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে আবাদি তামাকের উৎপত্তি

ডিপ্লয়েড সরিষা প্রজাতি × আবাদি ডিপ্লয়েড সরিষা প্রজাতি
Brassica nigra *B. campestris*
2n = ১৬, BB 2n = ২০, AA

↓

হাইব্রিড (অনুর্বর)
2n = ১৮, AB

↓ প্রাকৃতিকভাবে ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণিতকরণ

রাই সরিষা (টেট্রাপ্লয়েড)
B. juncea
2n = ৩৬, AABB

রেখাচিত্র ৪.২ : প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট হাইব্রিডের ক্রোমোজোম সংখ্যা প্রাকৃতিকভাবে দ্বিগুণিতকরণের মাধ্যমে আবাদি রাই সরিষার উৎপত্তি

২. কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভিদে ক্রোমোজোম সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

উদ্ভিদে ক্রোমোজোমের সংখ্যাগত পরিবর্তনের বিষয়টি ইনোথেরা (Oenothera) উদ্ভিদে ১৯০৭ সালে প্রথম লক্ষ্য করেন বিজ্ঞানী লাজ (Lutz)। ১৯২০ সালে উদ্ভিদবিদ বেলিং (Belling) ধুতুরার একটি প্রকরণের কোষে স্বাভাবিক ক্রোমোজোম সংখ্যার পরিবর্তে একটি ক্রোমোজোম অধিক দেখতে পান। অবশ্য এর চার বছর পূর্বে বিজ্ঞানী উইন্‌কলার (Winkler) কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রথম কাকমাছি উদ্ভিদে স্বচতুর্প্লয়েড বা অটোটেট্রাপ্লয়েড সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। তিনি কাকমাছি উদ্ভিদের কাণ্ডের অগ্রভাগ কেটে ফেলেন। কাটা অংশের কেলাস কোষ থেকে উৎপন্ন কয়েকটি মুকুল টেট্রাপ্লয়েড হিসেবে দেখা দেয়। বিজ্ঞানী উইঙ্গি (Winge) ১৯১৭ সালে মত প্রকাশ করেন যে আন্ত: প্রজাতি সঙ্করায়ন এবং ক্রোমোজোম দ্বিগুণিতকরণের মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদ প্রজাতি উদ্ভাবন করা সম্ভব।

১৯৩৬ সালে *Autumn crocus* নামক প্রজাতি থেকে আলাদা করে নেয়া হলো কলচিসিন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ যার বালাইনাশক গুণাগুণ আছে বলে দাবী করা হলো। কালচিসিনের যে ক্রোমোজোম দ্বিগুণীতকরণ করার ক্ষমতা রয়েছে বিজ্ঞানী ব্ল্যাকস্‌লি (Blakeslee) এবং নেবেল (Nebel) তা পরের বছর উপস্থাপন করেন। এ বছরই কলচিসিন নির্যাস আলাদা করে নেবার প্রমিত পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেন ফরাসী বিজ্ঞানী পেরি গিভেন্ডন (Pierre Givandon)। এরপর অল্প কয়েক বছরের মধ্যে ৫০টি উদ্ভিদ প্রজাতিতে কলচিসিন প্রয়োগ করে ক্রোমোজোম সংখ্যাটা দ্বিগুণ করা হয়। ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হলে ফলনও দ্বিগুণ হয়ে যাবে বা অন্তত কিছুটা হলেও বাড়বে এ আশা নিয়েই শুরু হয় কলচিসিন প্রয়োগ। কিন্তু অচিরেই এটি বিজ্ঞানীরা বুঝতে সক্ষম হন যে, বেধড়ক কলচিসিন প্রয়োগ কোনো সুফল বয়ে আনবে না।

দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে সঙ্করায়ন ঘটেছে এবং এদের সঙ্কর উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা প্রাকৃতিকভাবেই দ্বিগুণ হয়েছে এমণ উদাহরণ রয়েছে ভুরি ভুরি। এদের কোনো কোনোটি নতুন প্রজাতি হিসেবে খুব সফল হওয়ায় এগুলো এক সময় ফসল হিসেবে আবাদের আওতায়ও এসেছে। এরকম প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বহুপ্রস্থি ফসলের মধ্যে রয়েছে রেপ সরিষা ও রাই সরিষা, তামাক, তুলা, যই (oat), আখ। আমরা এখন যে গমের আবাদ করছি তা সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিকভাবে তিনটি প্রজাতির মধ্যে সঙ্করায়ন ও ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণিত হওয়ার মাধ্যমে।

আন্তঃপ্রজাতি সঙ্করায়ন করে সঙ্কর উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণীত করে নতুন ফসল সৃষ্টির চেষ্টাও শুরু করেন বিজ্ঞানীরা। সেই ১৯২৭ সালে রুশ বিজ্ঞানী Kerpechenko এক উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ক্রস করেন সরিষার সঙ্গে মুলার। তার লক্ষ্য ছিল এমন এক ধরনের ফসল নির্মাণ করা যার মাটির নিচে হবে মুলা আর উপরে ধরবে সরিষা। বাস্তবে তিনি সঙ্কর উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ করে যে ফসলটি পেলেন সেটি ছিল এর সম্পূর্ণ উল্টোটি। এর মূলটি ছিল সরিষার মূলের মত আর উপরের অংশটি ছিল মুলার গাছের মত। তার গবেষণার ফলাফল আপাতদৃষ্টিতে হতাশাজনক হলেও পরবর্তীকালে তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে অন্য ফসলের প্রজাতির মধ্যে ক্রসের মাধ্যমে।

গত শতাব্দির একেবারে মাঝামাঝিতে এসে বিজ্ঞানী ও'মারা (O Mara) Iowa State University-তে রাই ফসল এবং ডুরাম গমের বন্ধ্যা হাইব্রিডে কলচিসিন প্রয়োগ করে এদের ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ করে উর্বর আন্তঃগণ হাইব্রিড উৎপাদন করতে সক্ষম হন যা Triticale নামে পরিচিতি লাভ করে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর গবেষণা শেষে মানুষের উদ্ভাবিত এ ফসলটি আশির দশকের মাঝামাঝিতে এসে বিশ লক্ষ একরের অধিক পরিমাণ জমিতে আবাদ করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউরোপের মধ্যে মূলত ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং দক্ষিণ আমেরিকাতে এর আবাদ করা হয়। Triticale একটি সঙ্কর দানাদার ফসল। এর আমিষের পরিমাণ গম অপেক্ষা শতকরা ২৮ ভাগ বেশি। এতে রয়েছে প্রায় সব অত্যাবশকীয় এমিনো এসিড। এর গন্ধটা বেশ স্বাদু এবং এতে রয়েছে উচ্চ মাত্রা আঁশ। কাজেই গম এবং রাই উভয় প্রজনকের (parent) চেয়ে এর গুণমান অনেক উন্নত। এর দানার পূর্ণতা প্রাপ্তিজনিত কিছু সমস্যার কারণে এটি আর এতটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

তুলাতেও বেশ কিছু আন্তঃপ্রজাতি সঙ্করায়ন ঘটিয়ে বেশ ক'টি হাইব্রিড জাত সৃষ্টি করা হয়েছে ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণীত করে। আমেরিকান তুলার (*Gossypium hirsutum*) সঙ্গে মিশরীয় তুলার (*G. barbadense*) সঙ্করায়ন থেকে অবমুক্ত করা হয় হাইব্রিড তুলা Varalakshmi।

প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এসব প্রজাতির সাফল্যের কারণে মানুষ কৃত্রিম উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ক্রস করে সঙ্কর উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণিত করার মাধ্যমে ফসল উন্নয়নের চেষ্টা শুরু করে বিজ্ঞানীরা। এ গবেষণায় কলচিসিনের আবিষ্কার এক নতুন মাত্রা যুক্ত করে। প্রকৃতিতে বিদ্যমান বহুপ্রস্থি ফসল পূনঃনির্মাণ

করার ফলেও পাওয়া গেছে বিস্তর বিভিন্নতা। এসব বিভিন্নতা থেকে কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ বাছাই করে পাওয়া সম্ভব হয়েছে নতুন নতুন ফসলের জাত কোনো কোনো ক্ষেত্রে।

নিজস্ব ক্রোমোজোম সংখ্যা বাড়িয়ে সাফল্য পাওয়া গেছে যেসব ফসলের ক্ষেত্রে তার কিছু উদাহরণ এখানে উপস্থাপন করা দরকার। সুগারবিট পৃথিবীর বহু দেশে চিনি উৎপাদনকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। সাধারণ সুগারবিট ডিপ্লয়েড। নিজস্ব একসেট ক্রোমোজোম বাড়িয়ে তৈরি করা হয়েছে ট্রিপ্লয়েড সুগারবিট। এরা মূল ডিপ্লয়েড সুগারবিট অপেক্ষা লম্বা এবং প্রতি একক ক্ষেত্রে চিনির পরিমাণও এদের অধিক। দানাশস্যের মধ্যে নিজস্ব ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ করার মাধ্যমে টেট্রাপ্লয়েড রাই ফসলের জাত সৃষ্টি করা হয়েছে যাদের দানা বড় হয়েছে, এরা প্রতিকূল পরিবেশে চারা গজাবার অধিকতর ক্ষমতা অর্জন করেছে আর পেয়েছে অধিক আমিষ উপাদান।

আঙুরের আকৃতি বাড়াবার জন্য ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণিত করা হয়েছে। এক প্রকার টেট্রাপ্লয়েড আঙুর সৃষ্টি করা হয়েছে যাদের আঙুরের আকৃতি বড় এবং এদের মধ্যে কমেছে বীজের সংখ্যাও। বীজহীন তরমুজতো আবাদ হচ্ছে পৃথিবীর অনেক দেশে। ট্রিপ্লয়েড তরমুজ বীজহীনতার কারণে ভীষণ সমাদৃত জাপান আর আমেরিকাতে। গবাদিপশুর খাদ্যের ফলন বৃদ্ধির জন্য ক্রোমোজোম সংখ্যা বাড়িয়ে সুফল পাওয়া গেছে ক্লভারসহ কোনো কোনো ফসলে। ফুল এবং অলংকারিক উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা বাড়িয়ে কমিয়ে এসব ফসলে পাওয়া গেছে কিছু নতুন জাত।

৩. ক্রোমোজোম সংযোজন বা প্রতিস্থাপন

সরাসরি দুটি প্রজাতির ৫০% ক্রোমোজোমের সংযোগ ঘটিয়ে প্রাপ্ত সঙ্কর উদ্ভিদ অনেক ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত ফলন দিতে ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞানীরা একটি প্রজাতিতে অন্য একটি প্রজাতির একটি বা দুটি ক্রোমোজোম সংযোজন করে দিয়ে উদ্দেশ্য সাধন করতে চাইলেন। এভাবে একটি প্রজাতিতে নানা জটিল প্রজনন পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে একটি দুটি ক্রোমোজোম সংযোজনও করা হলো। তাতে নির্দিষ্ট জীনের সুফল পাওয়া গেল বটে, সঙ্গে পাওয়া গেল ক্রোমোজোমে বিদ্যমান অন্যান্য জিনের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাবও। ফলে খুব বেশি সফল হলো না এ পরিকল্পনাটি।

তবে আত্মীয় অনাবাদি প্রজাতির সঙ্গে আবাদি প্রজাতির সঙ্করায়নের মাধ্যমে একটি ক্রোমোজোম সংযোজন বা প্রতিস্থাপন করে কোনো কোনো ফসলে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। গম, তামাক, তুলা এবং যই ফসলে এ ধরনের জিন স্থানান্তর সম্ভব হয়েছে। তুলার ক্ষেত্রে আঁশের শক্তিক্ষমতা স্থানান্তর করা হয়েছে *G. thurberi* থেকে *G. hirsutum* এ। এতে কাঙ্ক্ষিত জিনের পাশাপাশি কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যও স্থানান্তরিত হয়েছে। তামাকে মোজাইক রোগ প্রতিরোধক্ষমতা স্থানান্তর করা হয়েছে *Nicotiana glutinosa* থেকে *N. tabacum* এ। গমের ক্ষেত্রে চোখাকৃতি দাগ (eye spot) রোগের প্রতিরোধিতা আসে *Aegilops ventricosa* থেকে।

বিজ্ঞানীরা ভাবলেন অতিরিক্ত ক্রোমোজোম নয় বরং একটি প্রজাতির দুটি ক্রোমোজোম সরিয়ে দিয়ে সেস্থলে অন্য প্রজাতির দুটি ক্রোমোজোম প্রতিস্থাপন করা যায় কি না। বাড়তি ক্রোমোজোমের ঝামেলা তাতে কমবে, কমবে মিয়োসিসের

অনাবাদি প্রজাতি 'ক' × অনাবাদি প্রজাতি 'খ'

উত্তম জিন ↓ সেতু প্রজাতি

আবাদি প্রজাতি 'গ' × হাইব্রিড প্রজাতি 'ক' জিন + প্রজাতি 'খ' জিন

↓

আবাদি প্রজাতি 'গ' এর ফসলে প্রজাতি 'ক' এর উত্তম জিন স্থানান্তর

রেখাচিত্র ৪.৩ : প্রজাতি 'খ' কে সেতু হিসেবে ব্যবহার করে 'ক' প্রজাতির জিন 'গ' প্রজাতির ফসলে স্থানান্তর

নানাভাবে বিজ্ঞানীরা ক্রোমোজোম সংখ্যা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নতুন নতুন ফসলের জাত তৈরি করবার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে রোগ এবং কীট-প্রতিরোধী জিন আত্মীয় আবাদি বা অনাবাদি প্রজাতি থেকে আবাদি ফসল প্রজাতিতে স্থানান্তরের চেষ্টাই বেশি হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়া গেলেও সামগ্রিক বিচারে এসব ফসল উন্নয়ন প্রচেষ্টা যতটা কৌশলগত উৎকর্ষতা প্রদর্শন করেছে নতুন কাঙ্ক্ষিত জাত সৃষ্টির ক্ষেত্রে ততটা সফল হতে পারেনি।

৬. বাংলাদেশে ক্রোমোজোম হ্রাস বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা

ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করে বাংলাদেশে ফসল উন্নয়ন ঘটানোর বিষয়টি এখনও বেশিদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয়নি। তবে আন্তঃপ্রজাতি সঙ্করায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট হাইব্রিডের ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণিত করার প্রভাব কি এটি জানার জন্য কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন হচ্ছে স্নাতকোত্তর পড়াশুনার সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো কোনো গবেষণায়। বাংলাদেশের শীতকালীন আবহাওয়ায় ইউরোপ থেকে প্রবর্তিত *B. napus* নামক একপ্রকার সরিষার প্রজাতি আবাদযোগ্য করার জন্য বাংলাদেশ ও সুইডেনে গবেষণা পরিচালনা করেন দু'জন বাংলাদেশী বিজ্ঞানী। ইউরোপের *B. napus* প্রজাতির সরিষার বীজগুলো বেশ বড় সড় এবং এদের তেলের শতকরা হারও অধিক। এদের বড় সমস্যা হলো দীর্ঘ পরিপক্বতা সময়কাল যা ছিল প্রায় ছ'মাসের কাছাকাছি। আমাদের দেশজ কিছু স্বল্পকালীন সরিষার জাত ও সুইডেনের কিছু জাত ব্যবহার করে *B. napus* নতুন করে পুনঃসংশ্লেষণ করার কাজটি করেন বিজ্ঞানীদ্বয়। এভাবে সৃষ্ট *B. napus* সরিষা সাড়ে তিন মাস চার মাসেই পরিপক্ব হয়ে উঠে। তাদের এ কর্মের ফলে *B. napus*-এর বেশ ক'টি জাত এখন বাংলাদেশে অবমুক্ত করা হয়েছে। BARI এর তৈলবীজ প্রকল্প এবং BINA থেকে দুটি করে মোট চারটি *B. napus* জাত এ দেশে অবমুক্ত করা হয়েছে।

এদেশে বীজহীন কিছু প্রাকৃতিক লেবুর নমুনা প্রায়শই প্রদর্শিত হয় নানা ফল মেলায়। এধরনের লেবু যে ট্রিপ্লয়েড তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অঙ্গজ বংশবিস্তারের ব্যবস্থা নিলে এসব বীজহীন লেবুর জাত এদেশে জনপ্রিয়তা পাবে কোনো সন্দেহ নেই।

পঞ্চম অধ্যায়

আকস্মিক জিন পরিবর্তনকরণের মাধ্যমে ফসলের উন্নয়ন

জীবের কৌলিবস্তুর আকস্মিক পরিবর্তন যা বংশপরম্পরায় সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হতে পারে তাকে ইংরেজিতে মিউটেশন (Mutation) বলা হয়। জিন জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। কৌলিবস্তুর পরিবর্তন হলো ডি এন এ- এর পরিবর্তন অর্থাৎ জিনের পরিবর্তন। জিনের পরিবর্তন ঘটালে পরিবর্তন ঘটে বৈশিষ্ট্যেও। নতুন বৈশিষ্ট্য কাঙ্ক্ষিত হলে তা প্রজননবিদের মনযোগ আকর্ষণ করে। এটি বাছাই করে নেয় বিজ্ঞানীরা। পরীক্ষা শেষে যদি এটি অধিকতর সফলতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয় তবে তা তৈরি করে নতুন জাত।

বিজ্ঞানী Muller ১৯২৭ সালে ড্রসোফিলার উপর তার গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করতে যেয়ে মিউটেশন শব্দটির ব্যবহার শুরু করেন একেবারে গত শতাব্দির শুরুতে। রঞ্জন রশ্মি যে জিনগুলো পাল্টে দিতে পারে এ বিষয়টি প্রথম তিনি আমাদের সামনে নিয়ে আসেন । এর এক বছর পর আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন বিজ্ঞানী Stadler। তিনি বার্লি আর ভুট্টা নিয়ে গবেষণা করার সময় গামা রশ্মি আর রঞ্জন রশ্মির প্রভাব স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। বিজ্ঞানী Muller কে এ কাজের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

১. জিন সৃষ্টির প্রচেষ্টা

বিজ্ঞানী Muller এর যুগান্তকারী আবিষ্কারের পর পরই তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জার্মানিতে মিউটেশন সৃষ্টি করে ফসল উন্নয়নের কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে যায়। ইতোমধ্যে নানা রকম ভৌত ও রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর মিউটেশন প্রয়োগ করে ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বেশ বেগবান হয়। এরই মধ্যে মানুষ আণবিক কলাকৌশল অনেক বেশি জেনে যায় এবং এগুলো তখন বেশ সহজলভ্য হয়ে উঠে।

পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকে বেশ কিছু দেশে মিউটেশনের মাধ্যমে নতুন নতুন জিন সৃষ্টি করে ফসলের জাত সৃষ্টির কাজ শুরু হয়ে যায়। পঞ্চাশের শেষের দিকে কৃত্রিমভাবে মিউটেশন ঘটিয়ে সরাসরি জাত সৃষ্টি করা হয় প্রথম শ্বেত সরিষা, মটর, বার্লি এবং চীনাবাদামে। সুইডিশ বিজ্ঞানীদের প্রজনন কর্মকাণ্ডের ফলে ১৯৬০ সালে পাওয়া যায় Mari নামক বার্লি জাতটি। এটি ছিল দিবা দৈর্ঘ্য সহনশীল। তখন এটি ব্যাপক এলাকা জুড়ে আবাদ হয়েছে। কখনও কখনও মিউটেশন ঘটানো উদ্ভিদ সমষ্টি সরাসরি ফসলের জাত সৃষ্টি করেছে। আবার কখনও মিউট্যান্টকে অন্য দেশি বা বিদেশি জাতের সঙ্গে ক্রস করিয়ে তৈরি করা হয়েছে নানা জাত। মিউটেশন ঘটাতে সক্ষম এমন কোনো রাসায়নিক পদার্থ বা কোনো রশ্মি দুটি সাধারণ পেরেন্টকে ক্রস

করে বংশপরে প্রয়োগ করা হয়েছে। অতঃপর কয়েক বংশধর চলেছে যাচাই-বাছাই। ফলে সৃষ্টি হয়েছে ফসলের কোনো কোনো জাত।

প্রাকৃতিকভাবে মিউটেশন ঘটেছে বলে প্রকৃতিতে এত বৈচিত্র্যপূর্ণ গাছপালা আর ফসল তৈরি হয়েছে। তবে প্রাকৃতিক মিউটেশনের হার বেশ কম। এর উপর নির্ভর করে আধুনিককালে ফসল উন্নয়ন করা কার্যকর নয় বলে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে মিউটেশন সৃষ্টির নানা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। ভৌত এবং রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে এখন সহজেই সৃষ্টি করা যায় মিউটেশন। নানা রকম রশ্মি হলো ভৌত পদার্থের অন্তর্গত। আলফা, বিটা, আর গামা রশ্মি, অতিবেগুনি রশ্মি, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি ভৌত উপায়ে তৈরি করা হচ্ছে মিউটেশন। মিউটেশন ঘটানো হচ্ছে একাধিক রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করেও। এদের মধ্যে রয়েছে ইথাইল সালফোনেট, সোডিয়াম এজাইড ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ।

সব রকম পদার্থ গাছের সব রকম অংশের উপর সমানভাবে ব্যবহৃত হয় তা নয়। চারাগাছ, গাছের ডালপালা ইত্যাদিতে নানা রকম রশ্মি প্রয়োগ করা অধিকতর সহজ। বীজের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে মিউটেশন ঘটানো হয়। মিউটেশন ঘটানো মানেই যে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ পাওয়া যাবে তা নয়। যথেষ্ট ধৈর্য্য নিয়ে একাধিক বংশধর ধরে কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদটিকে খুঁজতে হয়। প্রকট বৈশিষ্ট্য হলে তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব প্রথম বংশধরেই; প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য আরও এক বংশধর অপেক্ষা করতে হয়। আর বৈশিষ্ট্যটি যদি নিয়ন্ত্রিত হয় একাধিক জিন দিয়ে তবে অপেক্ষা করতে হয় বেশ ক'টি বংশধর।

সাধারণত কোনো ফসলে মিউটেশন ঘটানো হয় তখনই, যখন প্রাকৃতিকভাবে ফসলটিতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না, যখন ফসল উন্নয়নের আর কোনো বিকল্প থাকে না। তখন জিন সৃষ্টির প্রয়াস নেবার প্রয়োজন হয়। এ যাবৎ পৃথিবীব্যাপী মিউটেশন ঘটিয়ে সৃষ্টি করা ফসলের জাতের সংখ্যা দু' হাজারেরও বেশি।

২. বিভিন্ন ফসলে মিউটেশন গবেষণা

মিউটেশন প্রয়োগ করে বার্লি ফসলে বেশ ক'টি জাত তৈরি করা হয়েছে। এসব জাতের কোনো কোনোটির ফলন বেড়েছে, কোনো কোনোটি দিবস দৈর্ঘ্য সংবেদনশীল হয়েছে আর কোনো কোনোটি মিলডিও (mildew) রোগ প্রতিরোধক্ষমতা অর্জন করেছে। পঞ্চাশের দশকে জাপানে ধানে রঞ্জন রশ্মি আর গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পাওয়া গেছে আধা-খর্বাকৃতির ধান। এ ধান নিম্ন তাপমাত্রায় জন্মাবার ক্ষমতা অর্জন করে। ক্যারোলিনাতে বাদামের জাত তৈরি করা হয়েছে যার খোসা ছিল বেশ পুরু। সহজে এগুলোকে ভাঙা যেত না। পঞ্চাশের দশকে চেরি গাছের পরাগরেণুতে রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করে তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল একটি স্ব-প্রজননক্ষম জাত। সুইডেন থেকে যুক্ত রাজ্যে নিয়ে আসা মাঠ শিমে (Field bean) মিউটেশন ঘটিয়ে বিজ্ঞানীরা এর বৃদ্ধি স্বভাবটাকেই পাল্টে দেয়।

ইটালিতে গম ফসলে মিউটেশন ঘটিয়ে পাওয়া জাতটি ব্যবহৃত হতো ময়দা (pasta) তৈরিতে। নিউট্রন বা রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করা হয়েছিল তেমন দুটি গমের

জাতের মধ্যে ক্রস করে Creso নামক ডিউরাম গমের জাত তৈরি করা হয়। এ জাতটি ফলন দেয় অধিক, এর ফলনশীলতা ছিল টেকসই, অভিযোজনক্ষমতা অধিক এবং দানার গুণমানও ছিল অধিক। নব্বইয়ের দশকে ইটালির ডিউরাম গমের এক তৃতীয়াংশ এ জাতটি দখল করে নিয়েছিল।

ক্যালিফোর্নিয়াতে ধানের বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে Calrose 76 জাতটি তৈরি করা হয়। জাতটি ১৯৭৬ সালে আবাদের জন্য বাজারজাত করা হয়। সুইস উদ্যানতত্ত্ববিদ Klaus Ammann গমের মিউট্যান্ট জাত নিয়ে এক চমকপ্রদ তথ্য দেন। তার মতে, পৃথিবীতে যে কয়েক'শ গমের জাতের আবাদ হচ্ছে তার মধ্যে প্রায় দু'শটি তৈরি হয়েছে রঞ্জন রশ্মি, নিউট্রন বা কোনো না কোনো রাসায়নিক মিউটাজেন প্রয়োগ করে। মিউটেশন ঘটিয়ে Above নামে একটি গমের জাত তৈরি করা হয়েছিল। এ জাতটির আগাছানাশকের ক্ষতিকর প্রভাব সইবার ক্ষমতা ছিল। ফলে এ জাতে আগাছানাশক ব্যবহার করলে আগাছা মারা যেত ঠিকই, কিন্তু গমের গাছ বেশ ভালভাবেই টিকে থাকত।

ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভারত ও বাংলাদেশে ধানের অনেকগুলো মিউট্যান্ট জাত অবমুক্ত করা হয়। ভারতে ছোলা, মটর, গোসিম, অড়হড়, বাদাম, পাট, গম, ধান, তুলা, ইক্ষু ও তামাক ফসলে মিউটেশন ঘটিয়ে নতুন নতুন জাত সৃষ্টি করা হয়েছে। মসলা ফসলের মধ্যে ভারতে ঝিরা (cumin), আদা, হলুদ, মেথি ইত্যাদি ফসলেও মিউটাজেন প্রয়োগ করে নতুন জাত অবমুক্ত করা হয়েছে।

পৃথিবীব্যাপী মিউট্যান্ট জাত সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কখনো এক ছিল না। কৃষকের চাহিদাকে মাথায় রেখে নানা রকম বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন এনেছে বিজ্ঞানীরা। মিউটেশন ঘটিয়ে ফসলের ফলন বৃদ্ধি, উচ্চতা হ্রাস, আগাম পরিপক্কতা, পীড়ন সহিষ্ণুতা, অধিক গুণগতমান প্রাপ্তি, রোগ প্রতিরোধিতা, অধিক অভিযোজন ক্ষমতা ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে নানা ফসলে।

ফসলের নানা রকম বৈশিষ্ট্য উন্নয়নে মিউটেশন প্রজনন ব্যবহৃত হয়েছে। ধানে আমিষের পরিমাণ বৃদ্ধি, সরিষায় তেলের পরিমাণ বৃদ্ধি, আর আখের চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে এ পদ্ধতিতে। রেড়ি (castor), ধান, সয়াবিন, তুলা, ছোলা মাসকলাই, অড়হড় এবং আখেতে আগামত্ব স্বভাব অর্জন সম্ভব হয়েছে। রেড়িতে যেখানে পূর্বে পরিপক্ক হতে ২৭০ দিন লেগে যেত সেখানে পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট জাতের লাগত মাত্র ১৪০ দিন। খর্বাকৃতির জাত তৈরি করা সম্ভব হয়েছে গম, ধান, সরগাম এবং কাউনে। গমে স্ট্রিপ রাস্ট, বার্লিতে মিল্ডিউ, চীনাবাদামে লিফ স্পট এবং কাণ্ড মরিচা রোগ, আখের লাল পচা, আপেল মিল্ডিউ ইত্যাদি রোগ-প্রতিরোধিতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। রেপবীজ ও সরিষাতে নিম্ন মাত্রার ইরিউসিক এসিড উপাদানসমৃদ্ধ জাত এবং খেসারিতে নিম্নমাত্রায় নিউরোটক্সিন উপাদান সম্পন্ন জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে।

এযাবত বহু ফসলে নানা রকম রশ্মি প্রয়োগ করে মিউট্যান্ট জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। বীজ ফসলের তুলনায় অঙ্গজ ফসলে ভৌত রশ্মি বিকরণশীল পদার্থ প্রয়োগ

করে অধিক সংখ্যক জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। বীজ ফসলে রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগ সহজ বলে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে কিছু ফসলের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

ফসলে দুটি বা তিনটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনসমূহ কখনও কখনও একই ক্রোমোজোমে অবস্থিত থাকায় এরা একত্রে সন্তান-সন্ততিতে বাহিত হয়। পরস্পর অন্বিত (linked) এসব জিন পিতামাতা থেকে সন্তানে বাহিত হবার ভাল দিক যেমন আছে তেমনি মন্দ দিকও আছে। ভাল দিক এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো উত্তম প্রকৃতির হলে তা একত্রে সন্তানে বাহিত হলে তা আমাদের জন্য বেশ কাঙ্ক্ষিত। মন্দ দিকটা দেখা দেয় তখনই যখন ঘনিষ্টভাবে অবস্থিত উত্তম বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত একটি জিন অন্য একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত জিনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে সংযুক্তি ভেঙে ফেলা জরুরি। মিউটেশন এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত সংযুক্তি ভাঙতে পারে অনেক বেশি সহজে। যই ফসলে ভিক্টোরিয়া ধসা প্রতিরোধিতা সংযুক্ত ছিল ক্রাউন রাস্ট (rust) প্রতিরোধহীনতার সঙ্গে যা মিউটেশন ঘটিয়ে ভাঙা সম্ভব হয়েছে।

এখন অনেক ফসলে হাইব্রিড জাত তৈরির জন্য পুংবন্ধ্যা লাইন ব্যবহার করা হচ্ছে। কোনো কোনো ফসলে পুংবন্ধ্যা লাইন পাওয়া বেশ কষ্টকর হচ্ছে আত্মীয় প্রজাতির মধ্যে পুংবন্ধ্যা বৈশিষ্ট্যটি না থাকায়। মিউটেশন ঘটিয়ে পুংবন্ধ্যা লাইন উদ্ভাবন এখন আর অসম্ভব নয়। বিকিরণ প্রয়োগ করে কৌলিক পুংবন্ধ্যা (genetic male sterility) সৃষ্টি করা হয়েছে ডুরাম গমে, বার্লি, সুগারবিট, কাউন/চিনা এবং তুলায়। ইথিডিয়াম ব্রোমাইডকে বেশ কার্যকরভাবেই পুংবন্ধ্যা তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়েছে বার্লি এবং বাজরাতে।

হোমোজাইগাস প্রজনক (parent) সৃষ্টির লক্ষ্যে ফসলে হ্যাপ্লয়েড (haploid) সৃষ্টি করা প্রয়োজন হয়। রঞ্জন রশ্মি দিয়ে পরাগরেণুতে বিকিরণ ঘটিয়ে বেশ কিছু ফসলে হ্যাপ্লয়েড গাছ পাওয়া গেছে। এসব হ্যাপ্লয়েডের ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণিত করে তৈরি করা হয়েছে অনেক ইনব্রেড (inbred) লাইন। এসব ইনব্রেড লাইনকে বাণিজ্যিকভাবে F_1 হাইব্রিড তৈরির কাজে বা সাধারণ ক্রসিং কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অনেক ফসলে স্ব-অসঙ্গতির (self incompatibility) অর্থাৎ নিজ ফুলের পরাগরেণুর সাহায্যে নিষেক না ঘটার ঘটনা রয়েছে। এরা অন্য জাতের পরাগরেণু পেলে তবে বীজ তৈরি করে। কোনো কোনো ফসলের জাতের স্বঅসঙ্গতি দূর করার জন্য কিরণপাত বেশ কার্যকর। বেশ কিছু ফসলের প্রজাতিতে সুনির্দিষ্ট মাত্রায় স্বনিষেক অবস্থাটি ফিরে এসেছে গাছটিতে কিরণপাতের ফলে।

কোন ফসল কতটা এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হতে পারবে তা নির্ভর করে ঐ ফসলের অভিযোজ্যতার উপর। মেস্তা (*Hibiscus sabdariffa*) প্রজাতির অভিযোজন ক্ষমতার অনেক উন্নয়ন ঘটেছে এর মধ্যে রশ্মি প্রয়োগ করে। মিউটেশনের মাধ্যমে অধিক অভিযোজন ক্ষমতা অর্জনের কারণেই এর স্বাভাবিক আবাদি এলাকা থেকে ১৬০০ কিলোমিটার উত্তরে এটি জন্মাতে পেরেছে।

৩. মিউটেশন ও ফসলের জাত

মিউটেশন প্রয়োগ করে ১৯৬৯ সালে বিভিন্ন ফসলের জাতে সংখ্যা পাওয়া যায় ৭৭টি। এর ঠিক দশ বছর পরে এ সংখ্যাটি দাঁড়ায় ৩০৪ টিতে। এদের মধ্যে শুধু শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদে তৈরি করা হয় ১৪২ টি জাত। আর দানাশস্যের ৯৫টি জাতের মধ্যে ৪০টি তৈরি করা হয় বার্লিতেই। ১৯৮৩ এর পরিসংখ্যানে লক্ষ্য করা যায় যে, এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩৭ টি। ১৯৮৯ এর হিসাব অনুযায়ী মিউট্যান্ট জাতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩২২টিতে যা ১৯৯০ সালে পৌঁছায় ১৫৪২ এ এবং এর দুই বছর পর ১৭৩৭ টিতে। এ সংখ্যা গত শতাব্দির শেষে এসে ২০০০ টিতে উন্নীত হয়েছে। ২০০৪ সালে প্রকাশিত গ্লোবাল নলেজ সেন্টার ফর ক্রপ বায়োটেকনোলজির Pocket K No. ১৩ তে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী এযাবৎ বাজার জাত করা মিউট্যান্ট জাতের সংখ্যা ২২৫২ বলে প্রকাশ করা হয়। তাদের তথ্যানুযায়ী, এর মধ্যে ১০১৯টি জাত অবমুক্ত করা হয় শুধু গত ১৫ বছরে।

নব্বই দশকের শুরুতে এসে দেখা যায় যে, অবমুক্ত মিউট্যান্ট জাতগুলোর বড় অংশ বাজারজাত করা হয়েছে বীজ ফসলে। বীজ ফসলে অবমুক্ত জাতের সংখ্যাটি ছিল ১০১৯টি। অন্যদিকে অঙ্গজ ফসলে এ সংখ্যা ছিল ৫২৩। তবে মিউটেশন ঘটানো উদ্ভিদগুলো যে সবসময় সরাসরি নতুন জাত তৈরি করেছে, তা নয়। অনেক সময় মিউট্যান্ট উদ্ভিদকে অন্য স্বাভাবিক উদ্ভিদের সঙ্গে সঙ্করায়ন করে পাওয়া উদ্ভিদের বিভিন্ন বংশধরের সন্তান-সন্ততিতে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্নের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে নতুন নতুন জাত। নব্বই দশকের শুরুতে এসে দেখা যায় যে মিউটেশন ঘটিয়ে সরাসরি অবমুক্ত করা হয়েছে তেমন বীজ ফসলের জাতের সংখ্যা ৬০৯ টি আর সঙ্করায়নে মিউট্যান্ট উদ্ভিদ ব্যবহার করে জাত সৃষ্টির সংখ্যা ৪১০টি। অঙ্গজ ফসলে অবমুক্ত করা মিউট্যান্ট জাতের সিংহভাগেই এসেছে সরাসরি মিউট্যান্ট উদ্ভিদ থেকে। বীজ ফসলের মধ্যে সর্বাধিক মিউট্যান্ট জাত তৈরি করা হয়েছে ধান, বার্লি আর গমে। এসব জাতের একটি বড় অংশ অবমুক্ত করা হয়েছে চীনে। ভারত, রাশিয়া এবং জাপানেও বেশ কিছু সংখ্যক জাত অবমুক্ত করা হয়েছে মিউটেশন ঘটিয়ে। দানা শস্য ও শোভাবর্ধক গাছপালা ছাড়াও তৈল ফসল, ফল, সবজি এবং আঁশজাতীয় ফসলেও বেশ কিছু সংখ্যক মিউট্যান্ট জাত তৈরি করা হয়েছে।

৪. বাংলাদেশে মিউটেশন গবেষণা

বাংলাদেশে মিউটেশন ঘটিয়ে জাত উদ্ভাবনের কাজ স্বাধীনতার কিছু পূর্বে শুরু করা হলেও ফসলের মিউট্যান্ট জাত বাজারে অবমুক্ত করার প্রথম অনুমতি পায় ১৯৭৫ সালে। ১৯৭৫ সালে পরমাণু শক্তি কমিশনের আওতায় পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট অর্থাৎ 'ইনা' চালু হবার পর ১৯৮০ সালে এটি পূর্ণাঙ্গরূপে রূপান্তরিত হয় বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে যা 'বিনা' নামে পরিচিত। এ প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা নানা রকম ভৌত ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে এ পর্যন্ত তৈরি করেছেন প্রায় ৩০টি জাত।

এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম জাত হলো ইরাটম-২৪ নামক ধানের জাত। নামেই বলে দেয় এর সৃষ্টি হয়েছে কিভাবে। ইরি ৮ ধানে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পাওয়া গেছে এ জাতটি। এ জাতটি আগাম পাকার স্বভাব অর্জন করেছিল। দেশি ধান নাইজারশাইলের বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে ১৯৮৭ সালে অবমুক্ত করা হয় বিনাশাইল ধানের জাত। বিলম্বে বপনের জন্য এ জাতটি খুব উপযোগী বলে বিবেচিত হয়। বিআর ৪ এর সাথে ইরাটম ৩৮ এর সঙ্করায়ন করে দ্বিতীয় বছরের প্রাপ্ত বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে যাচাই-বাছাই করে পাওয়া যায় বিনাধান- ৪। একইভাবে F_2 বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে তৈরি করা হয় বিনাধান ৫ ও ৬। বিনাধান ৫ তৈরি করার জন্য সঙ্করায়ন করা হয় বিআর ২৪ এবং দুলার ও বিনাধান ৫ এর ক্ষেত্রে সঙ্করায়ন ঘটানো হয় ইরাটম ২৪ এর সঙ্গে দুলারের (সারণি ৫.১)।

সারণি ৫.১ : 'BINA'তে মিউটেশন ঘটিয়ে উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের জাত

ফসল/ জাতের নাম	ছাড়পত্র প্রাপ্তির বছর	চাষাবাদ কাল	গড় ফলন (হেঃ প্রতি)	প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলি
ধান ১। ইরাটম-২৪	১৯৭৫	বোরো/আউশ মৌসুম	বোরো ঃ ৬.০ টন আউশ ঃ ৩.৫ টন	গামা রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে ইরি-৮ ধানের বংশগতি ধারায় স্থায়ী পরিবর্তন আনয়ন করে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
২। বিনাশাইল	১৯৮৭	আমন মৌসুম	৪.২ টন	দেশি ধান নাইজারশাইলে গামা রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে বংশগতি ধারায় স্থায়ী পরিবর্তন আনয়ন করে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
৩। বিনাধান-৪	১৯৯৮	আমন মৌসুম	৪.৭০ টন	বি.আর-৪ এর সাথে ইরাটম-৩৮ এর সঙ্করায়ন করার পর দ্বিতীয় বছরের প্রাপ্ত বীজে (F2 seed) গামা রশ্মি প্রয়োগ করা হয় এবং পরবর্তী বছরগুলিতে বাছাইয়ের মাধ্যমে (৩০০ গ্রে হতে) এই মিউট্যান্ট জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
৪। বিনাধান-৫	১৯৯৮	বোরো মৌসুম	৭.০ টন	বি.আর-২৪ এর সাথে দুলার এর সঙ্করায়ন করার পর দ্বিতীয় বছরের প্রাপ্ত বীজে (F2 seed) গামা রশ্মি প্রয়োগ করা হয় এবং পরবর্তী বছরগুলোতে বাছাইয়ের মাধ্যমে (৩০০ গ্রে হতে) এই মিউট্যান্ট জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
৫। বিনাধান-৬	১৯৯৮	বোরো মৌসুম	৭.৫০ টন	ইরাটম-২৪ এর সাথে দুলার এর সঙ্করায়ন করার পর দ্বিতীয় বছরের প্রাপ্ত বীজে (F2 seed) গামা রশ্মি প্রয়োগ করা হয় এবং পরবর্তী বছরগুলোতে বাছাইয়ের মাধ্যমে (৩০০ গ্রে হতে) এই মিউট্যান্ট জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।

সরিষা ৬। সফল	১৯৯১	রবি মৌসুম	১.৭০ টন	YS-৫২ বীজে ৭০০ গ্রে গামারশ্মি প্রয়োগ করে মাঠ পর্যায়ে একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে এ জাতটির উদ্ভাবন করা হয়।
৭। অগ্রণী	১৯৯১	রবি মৌসুম	১.৮০ টন	YS-৫২ বীজে ৭০০ গ্রে গামারশ্মি প্রয়োগ করে মাঠ পর্যায়ে একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে এ জাতটির উদ্ভাবন করা হয়।
৮। বিনাসরিষা-৩	১৯৯৭	রবি মৌসুম	১.৯ টন	নেপাস সরিষার (ন্যাপ-৩) বীজে বিভিন্ন মাত্রায় গামারশ্মি প্রয়োগ করে মাঠ পর্যায়ে একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
৯। বিনাসরিষা-৪	১৯৯৭	রবি মৌসুম	২.০ টন	নেপাস সরিষার (ন্যাপ-৩) বীজে বিভিন্ন মাত্রায় গামারশ্মি প্রয়োগ করে মাঠ পর্যায়ে একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
১০। চিনাবাদাম-১	২০০০	রবি মৌসুম	২.৮০ টন	স্থানীয় জাত ঢাকা-১ এ গামা রশ্মি (২০০ গ্রে) প্রয়োগ করে স্থায়ী কৌলিক সারিতে পরিবর্তনের মাধ্যমে মিউট্যান্ট-৬ উদ্ভাবন করা হয়। পরে মিউট্যান্ট-৬ কে পুনরায় গামারশ্মি (২০০ গ্রে) প্রয়োগের মাধ্যমে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
১১। চিনাবাদাম-২	২০০০	রবি মৌসুম	২.৫০ টন	স্থানীয় জাত ঢাকা-১ এ গামা রশ্মি (২০০ গ্রে) প্রয়োগ করে স্থায়ী কৌলিক সারিতে পরিবর্তনের মাধ্যমে মিউট্যান্ট-৬ উদ্ভাবন করা হয়। পরে মিউট্যান্ট-৬ কে পুনরায় গামারশ্মি (২০০ গ্রে) প্রয়োগের মাধ্যমে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
১২। চিনাবাদাম-৩	২০০০	রবি মৌসুম	২.৫০ টন	স্থানীয় জাত ঢাকা-১ এ গামা রশ্মি (২০০ গ্রে) প্রয়োগ করে স্থায়ী কৌলিক সারিতে পরিবর্তনের মাধ্যমে মিউট্যান্ট-৬ উদ্ভাবন করা হয়। পরে মিউট্যান্ট-৬ কে পুনরায় গামারশ্মি (২০০ গ্রে) প্রয়োগের মাধ্যমে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
<u>মুগকলাই</u> ১৩। বিনামুগ-১	১৯৯২	আগাম রবি মৌসুম	০.৯০ টন	দেশিয় ও বৈদেশিক জার্মপ্লাজম সংগ্রহ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কিছু বীজ সংগ্রহ করা হয়। তারপর সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে মাঠ পর্যায়ে একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।

১৪। বিনামুগ-২	১৯৯৪	খরিফ-১ মৌসুম	১.৪০ টন	এম,বি ৫৫(৪) নামক একটি মিউট্যান্ট ও এভিআরডিসি হতে সংগৃহীত একটি গ্রীষ্মকালীন লাইন ভি-২৭৭৩ এর সাথে সঙ্করায়ন করে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
১৫। বিনামুগ- ৩	১৯৯৭	রবি মৌসুম	১.০০ টন	গামারশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্ভাবিত মিউট্যান্ট লাইন এমভি-৫৫(৪) এবং এভি আর ডিসি লাইন ভিসি-১৫৬০ এর সঙ্করায়ন করে এ জাতটি উদ্ভাবিত হয়।
১৬। বিনামুগ-৪	১৯৯৭	রবি মৌসুম	১.১০ টন	গামারশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্ভাবিত মিউট্যান্ট লাইন এমভি-৫৫(৪) এবং এভি আর ডিসি লাইন ভিসি-১৫৬০ এর সঙ্করায়ন করে এ জাতটি উদ্ভাবিত হয়।
১৭। বিনামুগ-৫	১৯৯৮	খরিফ-১ মৌসুম	১.৫০ টন	এম.ভি-৫৫(৪) নামক একটি মিউট্যান্ট ও এভিআরডিসি হতে সংগৃহীত একটি গ্রীষ্মকালীন লাইন ভি.সি-১৫৬০ ডি.(এভিআরডিসি হতে সংগৃহীত) এর সাথে সঙ্করায়ন করে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
ছোলা ১৮। হাইপ্রোছোলা	১৯৮১	রবি মৌসুম	১.৪০ টন	গামারশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশি ছোলার জাত "ফরিদপুর-১" এর বংশগতি ধারায় চিরস্থায়ী পরিবর্তন আনয়ন করতঃ এ জাতটি উদ্ভাবিত হয়।
১৯। বিনাছোলা-২	১৯৯৪	রবি মৌসুম	১.৫০ টন	দেশি ও বিদেশি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ কর্মসূচির অংশ হিসেবে গবেষণাগার ও মাঠ পর্যায়ে একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে এ জাতটি উদ্ভাবন করা' হয়।
২০। বিনাছোলা-৩	২০০১	রবি মৌসুম	১.৬০ টন	একটি দেশি জাত (G-97, ICRISAT হতে প্রাপ্ত)-এর বীজে বিভিন্ন মাত্রায় গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পরবর্তী বছরগুলোতে বাছাইয়ের মাধ্যমে (২০০ গ্রে হতে) এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
২১। বিনাছোলা-৪	২০০১	রবি মৌসুম	১.৬৩ টন	বিনা উদ্ভাবিত মিউট্যান্ট জাত হাইপ্রোছোলা একটি বিদেশি জাত K-৮৫০ (ICRISAT হতে প্রাপ্ত) এর সাথে সঙ্করায়ন করে পরবর্তী বছরগুলোতে বাছাইয়ের মাধ্যমে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
মাসকলাই ২২। বিনামাস-১	১৯৯৪	খরিফ মৌসুম-২	১.০০ টন	একটি স্থানীয় জাত (BINA Acc.B-10) এর বীজে বিভিন্ন মাত্রায় গামারশ্মি প্রয়োগ করে পরবর্তী বছরগুলোতে বাছাইয়ের মাধ্যমে (৬০০ গ্রে হতে) এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।

২৩। বিনামসুর-১	২০০১	রবি মৌসুম	১.৮০ টন	পাবনা লোকাল নামক স্থানীয় জাতের বীজে ধুতরার নির্যাস প্রয়োগ করে মিউটেশন পদ্ধতির মাধ্যমে বংশগতি ধারায় স্থায়ী পরিবর্তন আনয়ন করে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
খেসারি ২৪। বিনাখেসারী-১	২০০১	রবি মৌসুম	১.৯০ টন	একটি স্থানীয় জাত (এল-১) এর বীজে বিভিন্ন মাত্রায় গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পরবর্তী বছরগুলোতে বাছাইয়ের মাধ্যমে (২৫০ গ্রে হতে) এ জাতটি উদ্ভাবিত হয়।
পাট ২৫। এটমপাট-৩৮	১৯৮৭	খরিফ-১ মৌসুম	৩.০০ টন	ডি-১৫৪ জাতের বীজে গাম রশ্মি প্রয়োগ করে এবং বংশগতি ধারয়ে স্থায়ী পরিবর্তনের মাধ্যমে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট উচ্চ ফলনশীল এটমপাট-৩৮ উদ্ভাবন করা হয়।
২৬। বিনাদেশিপাট-২	১৯৯৭	মার্চের ১ম সপ্তাহ	৩.০০ টন	সিডিএল-১ জাতের বীজে সোডিয়াম এ্যাজাইড প্রয়োগ করে এবং বংশগতি ধারার পরিবর্তনোর মাধ্যমে আংশিক আলোক অসংবেদনশীল এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
টমেটো ২৭। বাহার	১৯৯২	রবি মৌসুম	৬৫ টন	দেশি একটি টমেটো জাতের বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে "আনবিক" নামে একটি মিউট্যান্ট উদ্ভাবন করা হয়। উক্ত মিউট্যান্টের সাথে সঙ্করায়ন করে উক্ত জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
২৮। বিনাটমেটো-২	১৯৯৭	গ্রীষ্ম কালীন	৩৮ টন	একটি স্থানীয় জাতের বীজে গামারশ্মি প্রয়োগ করে এস-১ নামে মিউট্যান্ট উদ্ভাবন করা হয়। উক্ত মিউট্যান্টের সাথে শীতকালীন টমেটো জাত বাহারের সাথে সঙ্করায়ন করে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।
২৯। বিনাটমেটো-৩	১৯৯৭	গ্রীষ্মকালীন	৪০ টন	একটি স্থানীয় জাতের বীজে গামারশ্মি প্রয়োগ করে এস-১ নামে মিউট্যান্ট উদ্ভাবন করা হয়। উক্ত মিউট্যান্টের সাথে শীতকালীন টমেটো জাত বাহারের সাথে সঙ্করায়ন করে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।

সরিষা ফসলে বিনা গামা রশ্মি প্রয়োগ করে তৈরি করেছে ৬টি জাত। YS ৫২ নামক একটি লাইনে রশ্মি প্রয়োগ করে সৃষ্টি করা হয়েছে 'সফল' এবং 'অগ্রণী' নামে দুটি জাত। এ জাত দুটি কেমপেসট্রিস প্রজাতির অন্তর্গত। ন্যাপ-৩ নামক নেপাস সরিষার লাইনে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পাওয়া গেছে দুটি জাত- বিনা সরিষা ৩ ও বিনা সরিষা ৪। চীনাবাদামের ক্ষেত্রে স্থানীয় জাত ঢাকা-১ এ গামা রশ্মি প্রয়োগ করে সৃষ্টি করা হয়েছে তিন তিনটি জাত- বিনাচীনাবাদাম ১, ২ ও ৩।

বিনামুগ ২ পাওয়া গেছে এম.বি ৫৫(৪) নামক মিউটান্টের সঙ্গে তাইওয়ান থেকে পাওয়া একটি লাইনের সঙ্করায়ন করে। তাইওয়ানের আর একটি লাইনের সঙ্গে এম.বি ৫৫(৪) এর সঙ্করায়ন থেকে তৈরি করা হয়েছে বিনামুগ-৩ এবং বিনামুগ-৪ এবং ৫ জাতগুলো। একটি স্থানীয় জাতে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে সৃষ্টি করা হয়েছে বিনামাস-১ আর বিনা মসুর ১ উদ্ভাবন করা হয়েছে পাবনা লোকাল নামক একটি স্থানীয় জাতে ধুতুরার নির্যাস প্রয়োগ করে। খেসারিতে স্থানীয় জাত (এল-১) এর বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে তৈরি করা হয় বিনা খেসারি-১ জাতটি। ছোলাতে দেশি ছোলার জাত ফরিদপুর-১ এ গামারশ্মি প্রয়োগ করে পাওয়া গেছে হাইপ্রোছোলা। ICRISAT থেকে প্রাপ্ত জাত G-97 এর বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে তৈরি করা হয়েছে বিনাছোলা-৩। বিনাছোলা ৪ উদ্ভাবন করা হয়েছে মিউট্যান্ট হাইপ্রোছোলা'র সঙ্গে ICRISAT- এর জাত K-850 এর সঙ্করায়ন ঘটিয়ে (সারণি ৫.১)।

ডি- ১৫৪ জাতের পাটের বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে সৃষ্টি করা হয় এটমপাট-৩৮ জাতটি। সিভিএল-১ জাতের বীজে সোডিয়াম এ্যাজাইড প্রয়োগ করে পাওয়া গেছে বিনাদেশি পাট-২। টমেটোতে তিনটি জাত তৈরি করা হয় গামা রশ্মি প্রয়োগ এবং মিউট্যান্টের সঙ্গে অন্য জাতের সঙ্করায়ন করে। 'আণবিক' নামক মিউট্যান্টের সঙ্গে 'অক্সহার্ট' জাতের সঙ্করায়ন করে সৃষ্টি করা হয়েছে 'বাহার' জাতটি। একটি স্থানীয় জাতের বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে এস-১ নামে উদ্ভাবিত মিউট্যান্টের সঙ্গে 'বাহার' জাতটির সঙ্করায়ন করে সৃষ্টি করা হয়েছে বিনাটমেটো-২। এরই আর একটি লাইন থেকে পাওয়া গেছে বিনাটমেটো ৩ জাতটি।

বিনা ছাড়াও কোনো কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ফসলে মিউটেশন ঘটানো হয়েছে এবং তাতে পাওয়া গেছে বেশ ক'টি ফসলের জাত। সরিষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মিউটেশন প্রয়োগ করে *Brassica juncea* প্রজাতির কৌলিসম্পদ থেকে বাছাই করা সম্ভব হয়েছে 'দৌলত' নামক একটি জাত। চিনাবাদামে 'ঢাকা-১' জাতটিতে মিউটেশন ঘটিয়ে BARI বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন বারিবাদাম-৫। এর বীজগুলো বেশ বড় বড়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হাইব্রিড জাত সৃষ্টির মাধ্যমে ফসলের উন্নয়ন

বিজ্ঞানীরা মিশ্রিত জাত থেকে একটি দুটি কাঙ্ক্ষিত লাইন আলাদা করে নিয়ে নতুন জাত উদ্ভাবন করেছেন সে বিষয়টি ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে। উদ্ভিদ প্রজননবিদগণ কেবল মিশ্রিত জাত থেকে অনুন্নত লাইন বা মিশ্রণ সরিয়ে দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। বিজ্ঞানীদের মনে বরাবরই দুটি বা তিনটি জাতের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলো একটি জাতে নিয়ে আসবার প্রবল বাসনা কাজ করেছে। বংশগতিবিদ্যার মূল রহস্য উন্মোচনের বহু পূর্বেই দুই জাতের ভিন্ন রকমের গাছগাছালির মধ্যে সঙ্করায়ন ঘটাবার মাধ্যমে ফসল উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। এসব সঙ্কর উদ্ভিদ প্রায়শই এদের পিতা-মাতা থেকে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক জাত অপেক্ষা অধিক ফলনশীল হয় এ রহস্য ধরা পড়ে বেশ পূর্বেই বিজ্ঞানীদের কাছে। ১৭৬৩ সালে বিজ্ঞানী Kolreuter মাতা পিতা থেকে অধিক তেজ সম্পন্ন হাইব্রিড লক্ষ্য করেন তামাক গাছে। সঙ্করায়ন নিয়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণাটি অবশ্য প্রকাশিত হয়েছে ১৭৬৬ সালে। জাতসমূহের মধ্যে ক্রস করা হলে প্রথম বংশধর অধিক তেজসম্পন্ন হয় এ বিষয়টি নজরে এসেছে মেন্ডেল পূর্ববর্তী অনেক বিজ্ঞানীরই। এমনকি বিষয়টি নজর এড়িয়ে যায়নি মেন্ডেলেরও। মটরের হাইব্রিডে ১৮৬৫ সালে তিনিও সঙ্কর সাবল্য (hybrid vigour) লক্ষ্য করেন।

বিজ্ঞানী Beal ১৮৭৭ সাল থেকে টানা এক নাগাড়ে পাঁচ বছর বিভিন্ন জাতের মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে প্রাপ্ত সঙ্করের ফলনশীলতা যাচাই করেন। ভুট্টার ক্ষেত্রে তিনি সঙ্কর উদ্ভিদে শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি লক্ষ্য করেন। বিজ্ঞানী Beal-এর পর্যবেক্ষণ যে সঠিক তা প্রমাণ করেন বিজ্ঞানী Sanborne। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, সঙ্কর উদ্ভিদ শতকরা ৩০ ভাগেরও অধিক ফলন দেয়। ১৮৯১ সালে বিজ্ঞানী Johnson সঙ্কর সাবল্যের কারণ কি এর একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর প্রথম পর্যবেক্ষণ হলো, স্ব-প্রজননের চেয়ে সঙ্করায়ন অধিক ফলন দেয়। স্ব-প্রজননের ফলে কোনো জাতে যে ত্রুটি থাকে তা থেকেই যায় কিন্তু যখন ত্রুটিপূর্ণ দুটি জাতের মধ্যে সঙ্করায়ন ঘটানো হয়, তখন একটি জাত অন্যটির সম্পূরক হয়ে পড়ে এবং ফলে সঙ্কর উদ্ভিদে সাবল্য পরিলক্ষিত হয়। একটি জাতের ত্রুটি পুষিয়ে দেয় অন্য জাতের জিন। আবার দ্বিতীয় জাতের ত্রুটি পুষিয়ে যায় প্রথম জাতের জিন দিয়ে। অর্থাৎ সঙ্কর জাতে আর কোনো ত্রুটি থাকে না বরং তা হয়ে পড়ে তেজসম্পন্ন। তিনি সঙ্কর সাবল্যের মূল বিষয়টি সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন। তিনি যেহেতু জিন বা ফ্যাক্টর সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। ফলে বংশগতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং সঙ্কর সাবল্য সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করেনি।

১. ফসলে সঙ্কর-সাবল্য ধারণা

হেটোরাসিস বা সঙ্কর-সাবল্য নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেন আমেরিকার বিজ্ঞানী G.H. Shull। ভুট্টা নিয়ে তিনি ব্যাপকভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করেন এবং কয়েক বছর ধরে তিনি স্ব-পরাগায়ন এবং পরপরাগায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট সন্তান-সন্ততিতে ফলনের তুলনামূলক পর্যালোচনা করেন। তিনি তাঁর গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে গিয়ে লক্ষ্য করেন যে, যখন দুটি জাতের মধ্যে সঙ্করায়ন করা হয়, তখনই হাইব্রিড উদ্ভিদ অধিক সবল ও অধিক ফলনশীল হচ্ছে। অন্যদিকে এসব সন্তান-সন্ততিতে স্ব-পরাগায়ন করলে এদের তেজ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। স্ব-পরাগায়ন যতো বংশধর পর্যন্ত চলে স্থিতাবস্থা অর্জন না করা পর্যন্ত সঙ্কর তেজ বা সাবল্যও হ্রাস পেতে থাকে। আবার দুই জাতের এ ধরনের তেজ হ্রাস প্রাপ্ত উদ্ভিদের মধ্যে সঙ্করায়ন ঘটালে আবার সঙ্কর তেজ ফিরে আসে। মেন্ডেল পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানী Shull-এর এ গবেষণা সঙ্কর সাবল্যের কারণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা এবং এর প্রয়োগ ঘটিয়ে ফসল উন্নয়ন ঘটানোর সুযোগ সৃষ্টি করে।

বিজ্ঞানী Shull এর যুগান্তকারী গবেষণা কর্মের পাশাপাশি সঙ্কর-সাবল্য নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করেন বিজ্ঞানী East। ১৯০৪ সাল থেকে এক যুগ সময় তিনি এবং বিজ্ঞানী Hayes যৌথভাবে এ নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁদের তিনজনের গবেষণা সঙ্কর সাবল্যের সবচেয়ে সফলজনক গবেষণা বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং এর ফলে সঙ্কর-সাবল্যের বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

সঙ্কর-সাবল্যের কারণ কি-এ নিয়ে ইতোমধ্যে অনেক তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন বিজ্ঞানীরা। এসব তত্ত্বের মধ্যে যেমন কৌলিক বা জেনেটিক তত্ত্ব রয়েছে, তেমনি রয়েছে শরীরতত্ত্বীয় এবং আণবিক তত্ত্বও। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে আলোচিত তত্ত্ব দুটি হলো জেনেটিক তত্ত্ব। ১৯০৮ সালে এটি উপস্থাপন করেছেন বিজ্ঞানী Davenport। উদ্ভিদে অধিক সংখ্যক প্রকট জিনের সমাহার ঘটে বলে সঙ্কর-সাবল্য বা হেটেরোসিস দেখা দেয়। তাঁর তত্ত্ব মতে, সঙ্কর উদ্ভিদে হেটেরোসিসের মূল কারণ হলো প্রচ্ছন্ন জিনের ক্ষতিকারক প্রভাবকে প্রকট জিনের উপস্থিতির কারণে অবদমন করে রাখা। বিজ্ঞানী East এবং বিজ্ঞানী Shull যৌথভাবে ঠিক একই বছরে সঙ্কর-সাবল্যের আর একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তাঁদের মতে, প্রকট ও প্রচ্ছন্ন এলিল পাশাপাশি থাকায় যে হেটারোজাইগোসিটি সৃষ্টি হয় তার ফলেই সঙ্কর-সাবল্য দেখা দেয়। অর্থাৎ কোনো সঙ্কর উদ্ভিদে হেটারোজাইগোসিটির মাত্রা যত বেশি হবে তার সঙ্কর-সাবল্যও ততো বেশি হবে।

২. পরপরাগী ফসলে হাইব্রিড জাত সৃষ্টি

কোন তত্ত্ব কত বেশি সত্য তা নিয়ে যত মতভেদই থাকুক না কেন সঙ্কর-সাবল্যকে কাজে লাগিয়ে ফসল উন্নয়ন ঘটানোর কাজটি কিন্তু শুরু হয়ে যায় ১৯৩০ এর মাঝামাঝিতে এসে তত্ত্ব বিষয়ক জটিলতাকে জিইয়ে রেখেই। তাতে ফসল উন্নয়ন ব্যাহত হয়নি বরং ফসলের ফলন বেড়েছে। ভুট্টা ফসলটিতেই সঙ্কর-সাবল্যকে কাজে লাগিয়ে প্রথম হাইব্রিড জাত তৈরি করা হয়। ভুট্টাকে প্রথম বেছে নেবার অনেকগুলো

কারণও রয়েছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা মূলত ভুট্টার সঙ্কর-সাবল্য নিয়ে গবেষণা করেছেন। ভুট্টার মুক্তপরাগী জাতগুলোর ফলন আশানুরূপ না হওয়ায় বিকল্প কোনো জাতের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। তখন প্রয়োজন ছিল নতুন কোনো কৌশল উদ্ভাবন করা। সে রকম একটি প্রয়োগিক কৌশল হলো ফসলের জাত সৃষ্টিতে সঙ্কর-সাবল্যকে কাজে লাগানো। ভুট্টাকে বেছে নেবার আর একটি বড় কারণ হলো এর অদ্ভুত পুষ্পবিন্যাস। ভুট্টাগাছের শীর্ষ দেশে রয়েছে পুরুষ ফুলের অবস্থান। আর নিচের দিকে কাণ্ড লগ্ন হয়ে জন্ম নেয় এক একটি স্ত্রী ফুল। ভুট্টাগাছের পুরুষ ফুলটি কর্তন করে দিলে সম্পূর্ণ গাছটি স্ত্রী গাছ হয়ে পড়ে। দানাদার খাদ্য শস্যের মধ্যে ভুট্টার আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এর পরপরাগায়ন স্বভাব। তার চেয়েও বড় কথা ভুট্টার রয়েছে একটি মোচায় অনেকগুলো বীজ উৎপাদন করার ক্ষমতা। এসব কারণে F_1 বীজ স্বল্প খরচে অল্প শ্রমে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে ভুট্টা ফসলে। যে দুটি জাতের মধ্যে পরাগায়ন সম্পন্ন করে হাইব্রিড জাত তৈরি করা হয় তাদের মধ্যে একটি জাতকে স্ত্রী প্রজনক এবং অন্য একটি জাত পুরুষ প্রজনক হিসেবে ধরে স্ত্রী জাতের কয়েক সারির পর লাগানো হয় পুরুষ জাতের একটি বা দুটি সারি তার পর স্ত্রী জাতের কয়েক সারি এবং পুরুষ জাতের একটি বা দুটি সারি। পরাগায়নের পূর্বে স্ত্রী প্রজনকের পুরুষ ফুল কেটে দেয়া হয় আগেভাগেই যেন স্ত্রী ফুলগুলো কেবল পুরুষ প্রজনকের পরাগরেণুর সাহায্যে পরাগায়িত এবং নিষিক্ত হতে পারে। গোড়াতে কিন্তু এভাবেই তৈরি করা হতো ভুট্টার সিঙ্গেল ক্রস হাইব্রিডগুলো। এভাবে হাতের সাহায্যে উৎপন্ন ভুট্টার হাইব্রিড জাতের খরচ বেশি পড়ে যায় বলে শুরু হয় বিকল্প কোনো কৌশল খোঁজার পালা। এরই ধারাবাহিকতায় খুঁজে নেয়া হয় ফুলের পুংবন্ধ্যাত্ব (male sterility) স্বভাব।

পুংবন্ধ্যাত্ব বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে ভুট্টার হাইব্রিড জাত সৃষ্টিতে এক যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন হয় তিন রকমের লাইন। একটি হলো স্ত্রী লাইন। শুধু স্ত্রী ফুল তৈরি করাই এর কাজ। এর পুরুষ ফুল বন্ধ্যা প্রকৃতির বলেই সেটি অনুর্বর। এ লাইনটিকে বলা হয় 'A' লাইন। 'A' লাইন কিন্তু একা একাই বীজ উৎপাদন করতে পারে না। এর বীজ বর্ধনের জন্য প্রয়োজন হয় আর একটি লাইনের। একে বলা হয় 'B' লাইন। 'A' লাইন এবং 'B' লাইন হুবহু একরকম। পার্থক্য শুধু এই যে, 'A' লাইন পুংবন্ধ্যা আর 'B' লাইন উর্বর। 'A' লাইনের সঙ্গে মাঠে ক্রস করে যে লাইন টি F_1 বীজ উৎপাদনে সাহায্য করে তাকে বলা হয় 'R' লাইন। মাঠে 'A' লাইনের ৬-৮ সারির পর লাগানো হয় ২ সারি 'R' লাইন। এভাবে মাঠে বুনে দেয়া 'A' লাইন আর 'R' লাইনের মধ্যে পরপরাগায়নের ফলে পাওয়া সম্ভব হয় স্বল্প ব্যয়ে হাইব্রিড ভুট্টার বীজ। এরই ধারাবাহিকতায় ক্রমে ক্রমে আসে ডাবল ক্রস হাইব্রিড এবং থ্রি-ওয়ে ক্রস হাইব্রিড জাত। ভুট্টাতে হাইব্রিত জাত এতটাই সফল হয়ে উঠে যে যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কিছু উন্নত দেশে ভুট্টা ফসল উৎপাদনে এখন হাইব্রিড জাত ব্যবহার করা হয় শতকরা একশত ভাগ ভুট্টার জমিতে।

যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সালে প্রথম ভুট্টার হাইব্রিড জাত বাণিজ্যিকভাবে আবাদের জন্য নিয়ে আসা হয়। এর দু' দশক পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ভুট্টার জমির শতকরা একশ ভাগই

দখল করে হাইব্রিড জাত, যা আজও চলছে। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে ভুট্টার ফলন বেড়েছে চারগুণ। ভুট্টার অভূতপূর্ব সাফল্যের পেছনে রয়েছে হাইব্রিড জাত আবাদের পাশাপাশি রাসায়নিক সার, বালাইনাশকের ব্যবহার এবং ফসল আবাদে যন্ত্রের ব্যবহার।

গোড়াতে হাইব্রিড জাত তৈরির কাজটি ছিল বেশ সময় সাপেক্ষ এবং জটিল। একটি উন্নত উপজাত পেতে শত শত ক্রস করতে হতো । এর জন্য প্রয়োজন হতো প্রচুর সংখ্যক দক্ষ শ্রমিক। এক সারি পুরুষ গাছের পর মাঠে লাগানো হতো চার সারি স্ত্রী গাছ। পুরুষ গাছ দেবে পরাগ আর স্ত্রী গাছ দেবে হাইব্রিড বীজ এটিই ছিল লক্ষ্য সেখানে। পরাগায়নের পূর্বে স্ত্রী গাছের পুরুষ ফুলগুলো ভালতোভাবে সরিয়ে নিতে হতো। পুরুষ ফুল সরিয়ে নিতেই প্রয়োজন হতো প্রচুর দক্ষ শ্রমিকের। ভুট্টা গাছ থেকে পুরুষ ফুল সরিয়ে নেবার কঠিন কাজটি খুব বেশি দিন আর কঠিন রইলো না। ভুট্টা গাছে প্রাকৃতিকভাবে কৌলিবস্তুতে আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে পাওয়া গেল এক রকম মিউট্যান্ট যার কোনো পুরুষ ফুল নেই। তৈরি করে শুধু স্ত্রী ফুল। সত্যি সত্যি গাছটিই হয়ে গেল স্ত্রী গাছ। প্রজননবিদ্‌দের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি এ গাছ। তারা বুঝতে পারলেন মিউট্যান্ট গাছের এ স্বভাবটি যদি হাইব্রিড জাত তৈরিতে ব্যবহৃত একটি প্রজনকে ঢুকিয়ে দেয়া যায় তাহলে আর কষ্ট করে স্ত্রী গাছ বানাবার প্রয়োজন হবে না। এটি যে জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি বৈশিষ্ট্য সে সত্যও ততদিনে জেনে যান বিজ্ঞানীরা। যে গাছটি কেবল স্ত্রী গাছ হয়ে গেল সেটিই যে সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারলো তা নয়। গাছটি কেবল স্ত্রী হলে চলবে না বরং সেটিকে তৈরি করতে হবে বীজ। তার জন্য প্রয়োজন কাঙ্ক্ষিত কোনো পুরুষ গাছের পুংরেণু– যা পরাগায়ন ঘটাবে আর তা থেকে সৃষ্টি হবে বীজ। বিজ্ঞানীরা সে রকম পুরুষ গাছও খুঁজে পেল যে, গাছের পরাগ সংযোগ পুংবন্ধ্যা গাছে শতকরা ১০০ ভাগ বীজ তৈরি করে। এসব গবেষণা পুরো হাইব্রিড জাত তৈরির কৌশলটাই পাল্টে দিল ভীষণভাবে।

হাইব্রিড গবেষণা থেকে পাওয়া গেল তেমন 'A' লাইন যে হবে পুং বন্ধ্যা অর্থাৎ কিনা স্ত্রী লাইন। এ লাইনকে বলা হয় 'A' লাইন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, একটি লাইন থেকে পুরুষ বন্ধ্যা স্বভাবটি স্থানান্তর করা যায় অন্য একটি লাইনে। এর জন্য প্রয়োজন হয় ব্যাকক্রস। এভাবে ইচ্ছে করলে পুংবন্ধ্যা বৈশিষ্ট্যটি স্থানান্তর করা যায় যত খুশী সংখ্যক লাইনে। সুতরাং কোনো ফসল প্রজাতির কোনো নিকটাত্মীয় বা মাঝারি বা দূর আত্মীয় বা অন্য কোনো প্রজাতিতে পুংবন্ধ্যা বৈশিষ্ট্যটির সন্ধান পেলে আর যদি সে আত্মীয় বা প্রজাতি ফসল প্রজাতির সঙ্গে ক্রস করে সন্তান উৎপাদনে সফল হয়, তাহলে বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে আসা যায় ফসল প্রজাতিতে। এরকম পুংবন্ধ্যা লাইন আপনা-আপনি নিজের বংশ যেমন রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, তেমনি একা একা F_1 বীজ উৎপাদনেও ব্যর্থ হয়। পুংবন্ধ্যা লাইন থেকে পুংবন্ধ্যা লাইন পাবার জন্য এর নিজের বীজ উৎপাদন একটি জরুরি বিষয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট লাইনের সঙ্গে পুংবন্ধ্যা লাইনের ক্রসের ফলে যে বীজ তৈরি হয় সে বীজের উদ্ভিদগুলো হয় একশত ভাগ পুংবন্ধ্যা। এই নির্দিষ্ট লাইনকে বলা হয় 'B' লাইন। 'B' লাইনকে খুঁজে পাওয়া খুব সহজ কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন হয় বিশাল এক ক্রসিং কর্মসূচি। এটি হলো 'B' লাইনকে খুঁজে পাবার

আয়োজন। অনেক ফসলেই এসব তিনটি লাইনই খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা, আর এদের কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হচ্ছে হাইব্রিড জাত আর হাইব্রিড জাতের বীজ।

ভুট্টার হাইব্রিড জাতের সাফল্যের পথ ধরে পরবর্তীকালে হাইব্রিড জাত তৈরি করা হয় অনেক পরপরাগী ফসলেই। এখন ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিকভিত্তিতে হাইব্রিড জাত ব্যবহার করা হচ্ছে সরগাম, সুগার বিট, পেঁয়াজ, তুলা, ব্রাসেলস্ স্প্রাউট, মুলাসহ বহু সবজি ফসল এবং বহু সংখ্যক ফুল ফসলেও। ফসলের লিঙ্গরূপতাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে হাইব্রিড জাতের বীজ উৎপাদন করা যায়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মেলে শসা গোত্রের ফসলে। শসা গোত্রের প্রায় সকল ফসলের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এদের ফুলগুলো একলিঙ্গিক। লাউ, মিষ্টিকুমড়া, শসা, ঝিঙ্গি, তরমুজ ইত্যাদি ফসলে গাছগুলো কিন্তু উভলিঙ্গিক যদিও ফুলগুলো একলিঙ্গিক। অর্থাৎ এদের ফুল হয় কেবল পুরুষ নয় তো কেবল স্ত্রী। পটল আর কাকরোলের ফুলও একলিঙ্গিক গাছটিও এক লিঙ্গিক। গাছটি হয় কেবল পুরুষ ফুল তৈরি করছে, নয়তো স্ত্রী ফুল। এ দুটি ফসলে সঙ্কর তৈরি করতে পারলে সঙ্কর বংশপরম্পরায় রক্ষা করা বেশ সহজ এদের অঙ্গজ বংশবিস্তার স্বভাবের জন্য। অন্যদের ক্ষেত্রে বংশবিস্তার হয় বীজ দিয়ে। আর লাউ, শসা, মিষ্টিকুমড়া এসব ফসলের এক একটি ফল ধারণ করে শত শত বীজ। এদের এত অধিক সংখ্যক বীজ উৎপাদন স্বভাব হাইব্রিড বীজ তৈরি করাটাকে লাভজনক করে দিয়েছে। অল্প কটি ক্রসিং থেকে পাওয়া যায় প্রচুর সংখ্যক বীজ। এসব ফসলে এটি একটি বাড়তি সুবিধা। আর একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুলের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বলে সহজেই পুরুষ ফুলকে উপড়ে নিয়ে তৈরি করা যায় স্ত্রী ফুলসম্পন্ন গাছ অর্থাৎ স্ত্রী গাছ। অন্য একটি উপযুক্ত জাতের পরাগরেণু কীটপতঙ্গের মাধ্যমে এসে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হলেই তৈরি হয় হাইব্রিড বীজ। যদি কীটপতঙ্গের অভাব ঘটে কোথাও হাত দিয়েও কিন্তু পরাগায়ন সম্পন্ন করা যায়। বর্তমানে হাইব্রিড বীজ উৎপাদন মাঠে মৌমাছির বাসা রেখে দিয়ে আনায়াসে পরপরাগায়ন ঘটানো যায়।

বিজ্ঞানীরা এক লিঙ্গিক ফুলবিশিষ্ট স্ত্রী গাছ বানাবার কৌশল রপ্ত করছে শসা পরিবারের বেশ কটি ফসলে। শসা পরিবারের ফসলের যৌন বহুরূপতার জেনেটিক গঠন ইতোমধ্যে জানা হয়ে গেছে। জাপানের একটি শসা জাত 'Shogoin' জাতে প্রচুর সংখ্যক স্ত্রী ফুল তৈরি করার ক্ষমতা রয়েছে। বিজ্ঞানীরা জাতটি থেকে স্ত্রী ফুল তৈরির জিনকে স্থানান্তর করে নিয়েছে তাদের শসার জাতে। এভাবে তাদের শসার জাতটি হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ স্ত্রী ফুল উৎপাদনকারী জাত। যে গাছ সম্পূর্ণ স্ত্রী তার বংশরক্ষা করা একা একা সেই গাছের পক্ষে অসম্ভব। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে লক্ষ্য করেছেন যে, সম্পূর্ণ স্ত্রী গাছে যদি একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় জিবেরেলিক এসিড, সিলভার নাইট্রেট বা সিলভার থায়োসালফেট স্প্রে করা হয়, তবে স্ত্রী গাছের কোনো কোনো পর্ব থেকে পুরুষ ফুল বেরিয়ে আসে। পুরুষ ফুল আর স্ত্রী ফুলের মধ্যে পরাগায়ন সম্পন্ন করে স্ত্রী গাছের বংশ রক্ষা করা যায়। বংশ রক্ষার বিষয়টি যখন নিশ্চিত করা গেল তখন এলো হাইব্রিড বীজ উৎপাদন করার বিষয়টি। কেবল স্ত্রী ফুল তৈরি করে এমন গাছের সঙ্গে একান্তরভাবে উপযোগী পুরুষ গাছ জন্মালে অনিবার্যভাবেই সম্পন্ন হবে পরপরাগায়ন-তা থেকে F_1 বীজ। হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে এছাড়াও আরও বেশ কিছু কায়দা কানুন রপ্ত করে নিয়েছে বিজ্ঞানীরা।

ভক্ষণের জন্য বীজহীন ফল ভীষণ আরাম দায়ক। বীজহীন তরমুজের চাহিদাই অন্যরকম। স্বাদও অধিক দামও অধিক। ডিপ্লয়েড তরমুজের সঙ্গে টেট্রাপ্লয়েড তরমুজের ক্রস করে তবে পাওয়া যায় ট্রিপয়েড F_1 তরমুজ। ট্রিপ্লয়েড বলে এদের জনন কোষে অস্বাভাবিক রকমের মিয়োসিস হয়। ফলে এগুলো তৈরি করে বন্ধ্যা গ্যামেট এবং অবশ্যই বীজহীন ফল। স্কোয়াশের ক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে গাছকে পুংহীন করা হয়। 'ইথেফোন' নামক রাসায়নিক দ্রব্য নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করে গাছটিকে স্ত্রী ফুল উৎপাদনের জন্য প্রভাবিত করা হয়। ইথেফোন ৬০০ পি পি এম মাত্রায় গাছের ২ ও ৪ পাতা পর্যায়ে প্রয়োগ করলে ফল ধারণ পর্যায়ে গাছে পুরুষ ফুল উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে– এতে গাছটি হয়ে পড়ে স্ত্রী। পাশে বুনে দেয়া অন্য একটি কাঙ্ক্ষিত জাতের পুংরেণু দিয়ে প্রাকৃতিক পরাগায়ন বা হস্ত পরাগায়ন সম্পন্ন করা গেলে হাইব্রিড জাতের স্কোয়াশ পাওয়া সম্ভব হয়।

বিজ্ঞানীরা বাঁধাকপি গোত্রের কোনো কোনো ফসলে অন্য আরেক রকমের কৌশল ব্যবহার করেছেন। আসলে কৌশলটি আপনা আপনি গাছেই বিদ্যমান। মানুষ একে সুকৌশলে হাইব্রিড তৈরির কাজে লাগিয়েছে মাত্র। এই গোত্রের গাছে পুংলিঙ্গিক এবং স্ত্রীলিঙ্গিক দু'রকমের ফুলই ফোটে। এদের এ দুটি লিঙ্গই কার্যক্ষম। একই গাছের পুরুষ লিঙ্গের পরাগরেণু সেই গাছের কোনো ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হলে তা পরাগায়ন বা নিষেক ঘটাতে ব্যর্থ হয়, অথচ অন্য জাতের পুরুষ অঙ্গের পরাগরেণু উড়ে এসে গর্ভমুণ্ডে সংযুক্ত হলে এগুলো বীজ তৈরি করে। এই ঘটনাটিকে কাজে লাগিয়ে হাইব্রিড বীজ তৈরির উপায় বের করা হয়েছে যথারীতি। এক্ষেত্রে সমস্যা একটি। আর তা হলো নিজের ফুলের পরাগ দিয়ে স্বাভাবিকভাবে বংশরক্ষা করতে না পারা। এদের ফুল যখন কুঁড়ি (bud) অবস্থায় থাকে তখন পুংকেশর থেকে পুংরেণু নিয়ে স্ত্রী কেশরের গর্ভমুণ্ডে ঘষে দিলে আর নিষেকের সমস্যা থাকে না। তখন এসব গাছ নিজে নিজেই বীজ তৈরি করে। এ বীজ দিয়ে এদের বংশরক্ষা করা হয়।

হাইব্রিড বীজ তৈরির জন্য প্রয়োজন হয় এ রকমেরই অন্য একটি জাত। এই জাতটিতেও নিজের পরাগরেণু দিয়ে ডিম্বাণু (egg cell) নিষিক্ত হয় না। ফলে গাছটি থাকে অফলন্ত এবং অবশ্যই অবীজীয়। এ অবস্থাটিকে বলা হয় স্ব-অসঙ্গতি (self-incompatibility)। দুটি স্ব-অসঙ্গতিসম্পন্ন এ জাতীয় লাইনকে পাশাপাশি বীজ উৎপাদন মাঠে বুনে দিয়ে পাওয়া সম্ভব হাইব্রিড বীজ। এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম এই যে, হাইব্রিড বীজ সংগ্রহ করা যায় দুটি লাইন থেকেই। একটির পরাগ বীজ তৈরি করে অন্য জাতে আর অন্যটির পরাগ বীজ তৈরি করে প্রথমটিতে। এভাবে হাইব্রিড জাত তৈরি করা হয়েছে বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রাসেলস্ স্প্রাউট আর ব্রোকোলিতে।

৩. স্ব-পরাগী ফসলে হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন

পরপরাগী ফসলে হাইব্রিড জাতের সাফল্য স্ব-পরাগী ফসল উন্নয়নে কাজে লাগানোর বিষয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করেন। দুটি জাতের মধ্যে ক্রস করা হলে প্রথম বংশধরের উদ্ভিদ অধিক তেজসম্পন্ন হয়– এই বিষয়টি স্ব-পরাগী ফসলের জন্যও সত্য। বহু স্ব-পরাগী ফসলে সঙ্কর উদ্ভিদকে পিতা-মাতা অপেক্ষা সবল ও সতেজ বলে

পাওয়া গেছে। পিতা-মাতার সঙ্গে সঙ্কর উদ্ভিদের ফলনশীলতার দিক থেকে পার্থক্য বেশ তাৎপর্যময়। কোনো কোনো ফসলের ক্ষেত্রে ফলন এতটাই অধিক যে, হাইব্রিড বীজ তৈরি করার কৌশল বের করে নিতে পারলে তা হবে অত্যন্ত লাভজনক।

স্ব-পরাগী ফসলে হাইব্রিড জাত তৈরির বড় বাঁধা হলো এদের স্ব-পরাগী স্বভাব। এদের ফুলের গঠন এমন যে অনেক ফসলে কোনো পরপরাগায়ন ঘটার সুযোগই থাকে না। এরা কেবল উভলিঙ্গিক নয় বরং এদের পুরুষ ও স্ত্রী-জননাঙ্গ পরিপক্ব হয় একই সময়ে এবং পরাগায়ন সম্পন্ন হবার পূর্বে এদের ফুল থাকে অপ্রস্ফুটিত। এরকম কঠিন স্ব-পরাগায়ন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হাইব্রিড জাতের বীজ উৎপাদন করা হয়েছে টমেটো, বেগুন ইত্যাদি ফসলে। ফুল এদের অপ্রস্ফুটিত স্বভাবের বলে কৃত্রিম উপায়ে ফুলের ভেতর থেকে উপড়ে নেয়া হয় আলতোভাবে পরাগধানীগুলোকে। সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় যেন কোনো পরাগধানী বা তার অংশ বিশেষ ফুলে থেকে না যায়। খেয়াল রাখতে হয় যেন স্ত্রীকেশরটিও অক্ষত থাকে। অতঃপর অন্য উপযোগী জাতের ফুল থেকে পরাগধানী নিয়ে এসে ছুঁয়ে দিতে হয় স্ত্রীকেশরের গর্ভমুণ্ডে। আমাদের অলক্ষ্যে পরাগরেণু অতঃপর অঙ্কুরিত হয়ে তৈরি করে পরাগনল, পৌঁছে যায় ডিম্বকে, তৈরি হয় এক একটি হাইব্রিড বীজ। যেহেতু প্রতিটি টমেটো এবং বেগুনে থাকে অনেক অনেক বীজ ফলে এরকম পুংহীনকরণ (emasculation) এবং হস্ত-পরাগায়ন বেশ লাভজনক কারণ এগুলোর চাহিদা এবং বাজারদর অধিক।

স্ব-পরাগী ফসলের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের প্রধান ফসল হলো ধান। পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি মানুষের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভাত। ধানের আধুনিক বিশুদ্ধ লাইন জাতসমূহের আবাদ ফসলের ফলন বৃদ্ধি করেছে উল্লেখযোগ্য রকমভাবে। তবু মানুষ বাড়ছে, বাড়ছে খাদ্য শস্যের চাহিদা। তাছাড়া যে গতিতে মানুষ বাড়ছে, বর্তমানে ব্যবহৃত প্রযুক্তি দিয়ে সে গতিতে খাদ্য উৎপাদন বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে । তাই ধানের ক্ষেত্রে হাইব্রিড প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ফলন বৃদ্ধির বিষয়টিকে বেশ প্রাধান্য দিয়েছে চীন দেশের বিজ্ঞানীরা। চীনা বিজ্ঞানীরা হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদনে সাফল্য লাভ করে । এ সাফল্য সাড়া জাগায় চীনের বাইরে। এজন্যই ধানে হাইব্রিড জাত তৈরির লক্ষ্যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয় ভারত, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যান্ডে।

ধানে হাইব্রিড জাত তৈরির প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো এর একটি ফুলে পরাগায়ন সম্পন্ন হলে পাওয়া যায় একটি ফল আর একটি বীজ। ফলে হস্ত-পরাগায়ন করে একটি বীজ তৈরি করে হাইব্রিড জাতের বীজ সৃষ্টি অলাভজনক এবং অসম্ভব। ধানের আর একটি সমস্যা হলো স্ব-পরাগী স্বভাব। অতএব, ধানের পুংবন্ধ্যাবিশিষ্ট লাইন সৃষ্টি করতে হবে। বিজ্ঞানীরা খুঁজতে খুঁজতে পুংবন্ধ্যা বৈশিষ্ট্যের ধানের সন্ধান লাভ করে। চীনের বিজ্ঞানীরা একটি বুনো প্রজাতির ধানে WA (Wild Abortive) পুংবন্ধ্যা উৎসটির সন্ধান লাভ করে। এর পরে পুংবন্ধ্যা স্বভাবের আরো কিছু উৎস খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এদের স্থায়িত্ব কম বলে মূলত WA উৎসটি ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। চীনের শতকরা ৯০ ভাগ হাইব্রিড ধান এলাকার স্ত্রী-অর্থাৎ 'A' লাইনের পুংবন্ধ্যা উৎস হলো এটি। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে এবং ভারতের হাইব্রিড ধানের 'A' লাইনের পুংবন্ধ্যা উৎসও এটিই।

বলাবাহুল্য 'WA' উৎস থেকে ব্যাকক্রসিং করে পুংবন্ধ্যা স্বভাবটি ধানের কাঙ্ক্ষিত আবাদি জাতে স্থানান্তর করা হয়েছে। তাতে ধানের একাধিক লাইন পুংবন্ধ্যা বা 'A' লাইনে পরিণত হয়েছে। এবার শুরু হলো পুংবন্ধ্যা লাইনটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য 'B' লাইনের সন্ধান করা। 'WA' উৎসের পুংবন্ধ্যা লাইনের সংরক্ষক (maintainer) লাইন পাওয়া গেল বেশ কতগুলো। এসব সংরক্ষক লাইনকে অতঃপর রূপান্তর করা হলো পুংবন্ধ্যা লাইনে। এভাবে পুংবন্ধ্যা লাইন রক্ষা করার ঝামেলা দূর করা হলো। এরপর কাঙ্ক্ষিত পরাগ প্রদানকারী লাইন অর্থাৎ 'R' লাইনকে 'A' লাইন অর্থাৎ স্ত্রী লাইনের সঙ্গে একান্তরভাবে বিভিন্ন অনুপাতে মাঠে রোপন করে তৈরি করা হয় হাইব্রিড বীজ। আর ঐ বীজ মাঠে ব্যবহার করে ফলানো হয় অধিক ফসল। তিন রকমের লাইন ব্যবহার করে এসব হাইব্রিড তৈরি করা হয় বলে একে 'তিন লাইন হাইব্রিড' (three lines hybrid) বলা হয়।

মাঠ পর্যায়ে হাইব্রিড বীজ উৎপাদন করা ভুট্টার তুলনায় অনেক কষ্টকর ধানে। দুটি কারণেই এ অসুবিধা সৃষ্টি হয়ে থাকে। একটি হলো, একই সময়ে স্ত্রী লাইন আর পুরুষ লাইনের পরিপক্বতা নিয়ে আসা। কয়েক দিনের ব্যবধানই মারাত্মক প্রভাব ফেলে বীজের পরিমাণের উপর। ফলে এক সঙ্গে পরাগ গ্রহণক্ষম এবং পরাগ নির্গমনক্ষম হতে হবে এদের। যদি আপনা থেকে তা না হয়, তবে এরজন্যও বিজ্ঞানীরা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। স্ত্রী লাইন এবং পুরুষ লাইন একটু আগে পিছে করে মাঠে রোপন করে দিয়ে এক সঙ্গে পাওয়া সম্ভব পরিপক্ব পরাগরেণু এবং পরাগরেণু গ্রহণক্ষম গর্ভমুণ্ড। প্রয়োজনের নিরিখে নানারকম সার প্রয়োগ করে ও সময়েও কিছুটা তারতম্য করে নেয়া যায় পরিপক্ক হওয়ার কালটিকে। শীষ বেরুবার ৩০ দিন আগে থেকেই ৩ দিন পর পর উভয় পেরেন্টের প্রধান কাণ্ডটি তুলনা করা শুরু হয়। যে পেরেন্টে আগাম বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় তাতে দ্রুত অবমুক্তক্ষম নাইট্রোজেন সার দিয়ে দিলে এর পুষ্পায়ন ক'দিন পিছিয়ে যায়। অন্যদিকে যে পেরেন্টকে দেখে বোঝা যায় বিলম্বিত হবে এর পুষ্পায়ন তার মধ্যে পটাসিয়াম ডাই-হাইড্রোজেন ফসফেট প্রয়োগ করলে পুষ্পায়ন ক'দিন এগিয়ে আসে। এভাবে পুরুষ এবং স্ত্রী লাইনের মধ্যকার পুষ্পায়নের পার্থক্য ৪-৫ দিন কমিয়ে আনা সম্ভব। পানি সরবরাহ করে বা প্রয়োজনে পানি সরিয়ে নিয়েও ধানের শীষ বের হওয়ার পার্থক্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। মাঠ থেকে পানি সরিয়ে নিলে ক' দিন বিলম্বিত হয় পুরুষ পেরেন্টের শীষ বর্ধন আর অধিক পানি ধরে রাখলে তা শীষ বর্ধনকে ত্বরান্বিত করে।

দু'রকমের পেরেন্টের মধ্যে এভাবে পুষ্পায়নকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি পরাগায়নকে নিশ্চিত করা গেলেই কেবল পাওয়া সম্ভব কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ হাইব্রিড বীজ। স্ব-পরাগী স্বভাব বলেই ধানে আপনা থেকে সহজেই পরাগরেণু উড়ে যাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। আর কীটপতঙ্গ এর পরাগরেণু বয়ে নিয়ে যাবে সেরকম আকর্ষণ করবার ক্ষমতাও নেই ধানের। এ জন্যই পরাগায়নের সময় এলে পরাগায়নকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাড়তি কিছু ব্যবস্থা নিতে হয়। পরাগরেণু প্রদানকারী পুরুষ লাইনের উপর দিয়ে আলতো করে লম্বা একটি নাইলন রশি দু'পাশ থেকে দু'জন টেনে নিলে পরাগরেণু উড়ে

গিয়ে পড়ে স্ত্রী গাছের গর্ভমুণ্ডে। ভালোভাবে যেন তা শীষটিকে স্পর্শ করে সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখা বেশ জরুরি। অসমান স্থানে অবশ্য বাঁশ দণ্ড দিয়ে নাড়িয়ে দিয়ে পরাগায়ন নিশ্চিত করা চলে। শীষের চেয়ে লম্বা যেসব পাতা এগুলোই পরপরাগায়নের মূল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কুঁশি বেরুবার গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১-২ দিন পূর্বে পাতা কর্তন করে দিলে পরাগায়নের সম্ভাবনা এবং পরপরাগায়ন মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। পতাকা পাতার উপর থেকে অর্ধেক বা তিন ভাগের এক ভাগ কেটে দিলেই চলে। হাইব্রিড বীজের পরিমাণ বাড়াবার আর একটি উত্তম কৌশল হলো নির্দিষ্ট মাত্রায় জিবেরেলিক এসিড (GA_3) ছিটিয়ে দেয়া। দু'বার GA_3 প্রয়োগ করতে হয়। প্রথমবার প্রয়োগ করতে হয় যখন শতকরা ১৫-২০ ভাগ গাছে শীষ বের হয়, আর তার ঠিক দুদিন পর স্প্রে করতে হয় দ্বিতীয় বার। এ রকম GA_3 প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হলো যেন শীষটি পাতার ভেতর থেকে ভাল ভাবে বাইরে বেড়িয়ে আসে তা নিশ্চিত করা।

চীনা বিজ্ঞানীরা ধানে পরিবেশ সংবেদী কৌলি পুংবন্ধ্যাত্ব আবিষ্কার করেছে। এর প্রয়োগ নিশ্চিত করে তিন লাইনের পরিবর্তে দুই লাইন (two line) হাইব্রিড সিস্টেম চালু করেছে তারা। পরিবেশ সংবেদী কৌলি পুংবন্ধ্যাত্ব দু'রকম। এর একটি হলো দিবস-দৈর্ঘ্য বা আলোক-সংবেদী কৌলিক পুংবন্ধ্যাত্ব (Photoperiod or photosensitive genic male sterility) যাকে সংক্ষেপে PGMS বলা হয়, আর অন্যটি হলো তাপমাত্রা সংবেদী কৌলিক পুংবন্ধ্যাত্ব (Thermosensitive genic male sterlity) যাকে সংক্ষেপে বলা হয় TGMS। কোনো ধান গাছে আবাদি পর্যায়ে যখন পুষ্পায়ন ঘটে তখন দিবস-দৈর্ঘ্য যদি পৌনে চৌদ্দ ঘন্টার বেশি হয়, তাহলে এটি পুংবন্ধ্যা হবে আর দিবস দৈর্ঘ্য যদি এর চেয়ে কম হয় তবে তা পুংউর্বর হবে– এটিই হলো PGMS এর মূল বিষয়। অন্যদিকে তাপমাত্রা-সংবেদী পুংবন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রে একটি লাইন পুংবন্ধ্যা অবস্থায় থাকবে যদি কেবল তাপমাত্রা ৩০$^{\circ}$C এর উপরে অবস্থান করে আর এ তাপমাত্রার নিচে আংশিক পুংউর্বরতা চলে আসে। এ দুটি কৌশল অবলম্বন করে চীনে হাইব্রিড ধান তৈরি করা হচ্ছে। ফলে অনুমান করা যায়, হাইব্রিড ধানের ফলন বৃদ্ধির কারণেই বিজ্ঞানীরা এত বিকল্প উদ্ভাবন করে চলেছে।

স্ব-পরাগী ফসলের ক্ষেত্রে হাইব্রিড জাত তৈরি করা হচ্ছে টমেটোর ক্ষেত্রেও। হাত দিয়ে ফুলের পরাগধানী অপসারণ করে হাত দিয়ে কাঙ্ক্ষিত পুরুষ গাছের পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে প্রতিস্থাপন করে তৈরি করা হয় এসব হাইব্রিড বীজ। এ ফসলটিতে একটি ফলে অনেক বীজ হয় বলেই হস্ত-পরাগায়নও লাভজনক হয়।

বাংলাদেশে ফসলের হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন

হাইব্রিড জাত উৎপাদনে বাংলাদেশ যে অন্যান্য অনেক দেশ থেকে পিছিয়ে রয়েছে তা বলাইবাহুল্য। হাইব্রিডপ্রযুক্তি একটি চমৎকার জেনেটিক কৌশল। উদ্ভিদের পুষ্প বিন্যাসকে এবং লিঙ্গ বহিঃপ্রকাশ ব্যবস্থাকে দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে ফসল উন্নয়ন করার কৌশল। আমাদের দেশে পাবলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে হাইব্রিড জাত সৃষ্টির কর্মকাণ্ড অতি শ্লথ বলে বিভিন্ন এনজিও, প্রাইভেট কোম্পানি বা বীজ ব্যবসায়ীরা বিদেশ

থেকে প্রতি বছর আমদানি করছে প্রচুর পরিমাণ হাইব্রিড বীজ। বিশেষ করে ১৯৯৮ সালের সংশোধিত বীজবিধি প্রাইভেট কোম্পানি এবং বীজ ব্যবসায়ীদের নানা রকমের ফসলের বীজ আমদানি করার সুযোগ সৃষ্টি করায় হাইব্রিড বীজ এখন আমাদের বাজারে ঢুকে পড়েছে। ধান, ভুট্টা এ দুটি দানাদার খাদ্য শস্যের পাশাপাশি প্রায় সকল প্রকার সবজি, কিছু কিছু ফল এবং ফুলের হাইব্রিড বীজও আমাদের বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

সারণি ৬.১ : বাংলাদেশে প্রবর্তিত কয়েকটি হাইব্রিড ধানের জাত

হাইব্রিড জাত	আমদানিকারক কোম্পানি
হাইব্রিড ধান 'হীরা'	সুপ্রীম সীড কোম্পানি লিঃ
হাইব্রিড ধান 'সোনার বাংলা'	এ আর মালিক এন্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ
হাইব্রিড ধান 'জাগরণ' হাইব্রিড ধান 'আলোড়ন'	ব্র্যাক সীড এন্টারপ্রাইজ
হাইব্রিড ধান 'এসিআই-১' হাইব্রিড ধান 'এসিআই-২' হাইব্রিড ধান '৯৩০২৪'	এসিআই এগ্রি বিজনেস

ধান নিয়ে বাংলাদেশে গবেষণারত প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)। গত প্রায় তিন যুগ সময় ধরে এদেশের কৃষকদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ধানের নতুন নতুন জাত সৃষ্টি করে এ প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা এ দেশের কৃষি তথা অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে এসেছে। কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতার কারণে হাইব্রিড জাত সৃষ্টিতে এ প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা বেশি দূর এগুতে পারেনি। গত শতাব্দির নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝিতে এসে বাংলাদেশে ধানের হাইব্রিড নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। ১৯৯২-৯৩ সালে যদিও ব্রি এবং ইরি-এর মধ্যে একটি অনানুষ্ঠানিক সহযোগিতার মাধ্যমে কিছু A লাইন, কিছু R লাইন এবং কিছু হাইব্রিড জাত এনে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় প্রথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয় কিন্তু তা থেকে বাংলাদেশে বিদ্যমান ইনব্রেড বা বিশুদ্ধ লাইন জাতসমূহের তুলনায় সম্ভাবনাময় হাইব্রিড জাত আলাদা করা সম্ভব হয়নি। গত ১৯৯৬ সালে এসে একটি হাইব্রিড গবেষণা কমিটি গঠন করা হয় এবং নিম্নলিখিত ত্রিমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় :

ক) পেরেন্টাল লাইন তৈরি করা

খ) ইরি এবং চীন থেকে প্রাপ্ত পেরেন্টাল লাইন এবং হাইব্রিডের মূল্যায়ন এবং

গ) বীজ উৎপাদন।

বাংলাদেশে হাইব্রিড ধান গবেষণা যতটা গুরুত্ব পাওয়া দরকার ততটা গুরুত্ব কখনও পায়নি। ন্যূনতম সংখ্যক বিজ্ঞানীর সংশ্লিষ্টতা এবং অর্থায়নের অভাব এ ক্ষেত্রে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধীরগতিতে এদেশের হাইব্রিড ধান গবেষণা চলছে। কিছু ক্রস, টেস্ট ক্রস, ব্যাকক্রসের মাধ্যমে হাইব্রিড জাত তৈরির প্রধান কাঁচা মাল A লাইন

এবং B লাইন তৈরির কাজ চলছে। পাশাপাশি সংগৃহীত বিভিন্ন A লাইন এবং R লাইনের ভবিষ্যৎ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এগুলোর বীজও বর্ধন করা হচ্ছে। মূলত দুটি উৎস থেকে প্রাপ্ত পেরেন্টাল লাইন এবং হাইব্রিডসমূহের মূল্যায়নও ইতোমধ্যে করা হয়েছে। হাইব্রিড জাতসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ের ফলন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হবার পরে লক্ষ্য করা গেছে যে, একটি হাইব্রিড জাত অধিক ফলন দিচ্ছে। অতঃপর সেই হাইব্রিড জাতটি বাংলাদেশে আবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের মাধ্যমে অবমুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের নতুন বীজ নীতির সুবাদে এ দেশীয় কিছু প্রাইভেট বীজ কোম্পানি চীনা এবং ভারতীয় হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানির সঙ্গে যৌথ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে বেশ কিছু হাইব্রিড ধানের জাত প্রবর্তন করে। সম্প্রসারণ বিভাগের সহযোগিতায় এসব হাইব্রিড জাতের মূল্যায়ন করা হয় এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য চারটি হাইব্রিড ধানের জাত অবমুক্ত করা হয়। তখন অবশ্য একটি শর্ত এর সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয় যে, তিন বছর পর তারা নিজেরা এদেশে হাইব্রিড বীজ তৈরি করবে। ইতোমধ্যে বহুসংখ্যক হাইব্রিড ধানের জাত প্রবর্তন করে বাজারজাত করা হচ্ছে এদেশে।

সারণি ৬.২ : বাংলাদেশে প্রবর্তিত কয়েকটি হাইব্রিড ভুট্টার জাত

হাইব্রিড জাত	আমদানিকারক কোম্পানি
হাইব্রিড ভুট্টা 'উত্তরণ ১' হাইব্রিড ভুট্টা 'প্যাসিফিক'	ব্র্যাক সীড এন্টারপ্রাইজ
হাইব্রিড ভুট্টা 'হীরা ৪০৫' হাইব্রিড ভুট্টা 'বাদশা ১'	সুপ্রীম সীড কোম্পানি লিঃ
হাইব্রিড ভুট্টা 'এনকে ৪৬'	সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেড
হাইব্রিড ভুট্টা 'সম্রাট' হাইব্রিড ভুট্টা 'কিং ৯৯৯'	আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিঃ
হাইব্রিড ভুট্টা 'গোল্ডা'	এসিআই এগ্রি বিজনেস

বাংলাদেশে ভুট্টার হাইব্রিড গবেষণা শুরু হয় ১৯৯৩ সালে। সে বছর বিদেশ থেকে প্রবর্তিত কিছু ভুট্টার হাইব্রিড বাংলাদেশের পরিবেশে মূল্যায়নের জন্য জন্মানো হয়। এদের মধ্যে বেশ কটি তুলনামূলকভাবে বেশ ভাল ফলন দেয়। পরবর্তীকালে থাইল্যান্ডের কিছু ইনব্রেড লাইন এনে আমাদের দেশে Suwan ৩৭০১ এবং Suwan ৩৭০২ নামক দুটি হাইব্রিড BARI --এর বিজ্ঞানীরা তৈরি করেন। এ দুটি হাইব্রিডের সঙ্গে আর ক'টি হাইব্রিড পাশাপাশি মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে জন্মানো হয়। এর সঙ্গে অবশ্য অস্ট্রেলিয়া থেকে বীজ ব্যবসায়ীদের আমদানিকৃত প্যাসিফিক ১১ জাতটিও জন্মানো হয় তুলনা করার লক্ষ্যে। মূল্যায়ন শেষে অতঃপর "বারি হাইব্রিড ভুট্টা -১" নামে ভুট্টার একটি হাইব্রিড জাত এদেশে অবমুক্ত করা হয়।

সারণি ৬.৩ ঃ বিভিন্ন বীজ কোম্পানি কর্তৃক প্রবর্তিত কয়েকটি সবজির হাইব্রিড জাত

হাইব্রিড জাত	আমদানিকারক কোম্পানি
মরিচ হাইব্রিড 'তিস্তা' হাইব্রিড লাউ 'গ্রিন সুপার' হাইব্রিড করলা 'গৌরব'	ইস্পাহানি সিডস
হাইব্রিড করলা 'প্রাইড' হাইব্রিড বেগুন 'কাজল' হাইব্রিড লাউ 'মহিমা'	এনার্জি প্যাক এগ্রো লিঃ
হাইব্রিড টমেটো 'সবল'	সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেড
বারমাসী হাইব্রিড শসা 'হিমেল' বারমাসী হাইব্রিড ঝিঙ্গা 'শিতল' হাইব্রিড টমেটো 'ম্যারাডোনা' 'টিপুসুলতান'	মল্লিকা সীড কোম্পানি
হাইব্রিড টমেটো 'জিটি ১০০'	এগ্রো জি সীড
হাইব্রিড মূলা 'হুয়াইট প্রিন্স' হাইব্রিড বাঁধাকপি 'কে -কে ক্রস' হাইব্রিড তরমুজ 'গ্লোরি'	সুপ্রীম সীড কোম্পানি লিঃ
হাইব্রিড করলা 'প্রাইম' 'টাইড' 'ইউনিক' হাইব্রিড ঝিংগা 'শুইজিন' হাইব্রিড ঢেঁড়স 'ফিংগার ৪৫'	মেটাল এগ্রো লিমিটেড
হাইব্রিড করলা 'রাজা' হাইব্রিড গাজর 'স্বরেণু কিং' হাইব্রিড বেগুন 'মোহিনী'	ইউনাইটেড সীড ষ্টোর
হাইব্রিড তরমুজ 'সুগার এমপেরর'	এসিআই এগ্রিবিজনেস

সবজিতে হাইব্রিড জাত তৈরি বেশ সহজতর এবং লাভ জনক। এ কারণে সবজিতে হাইব্রিড বীজ উৎপাদন খুব জনপ্রিয় একটি উদ্ভিদ উন্নয়ন পদ্ধতি। কিন্তু আমাদের দেশের পাবলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এটি খুব একটা সাড়া জাগাতে পারেনি। এর প্রধানতম কারণ এদেশের পাবলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রজননবিদদের সবজি ফসল নিয়ে গবেষণা করতে না দেবার মতো আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড। এদেশে সবজির একটি উল্লেখযোগ্য হাইব্রিড হলো মুলার হাইব্রিড জাত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ জাতটি উদ্ভাবিত হয়েছে। সবজি গবেষণায় জড়িত পাবলিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা দুটি হাইব্রিড বেগুন জাত 'তানপুরি' এবং 'শুকতারা' এবং একটি গ্রীষ্মকালীন টমেটো হাইব্রিড জাত 'অনুপমা' অবমুক্ত করেছে। হাইব্রিড সবজি গবেষণায় এদেশে বেশ এগিয়ে এসেছে লাল তীর বীজ লিমিটেড নামক একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান। সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে হাইব্রিড প্রজনন কর্মকাণ্ডের অনুপস্থিতি তাদের জন্য একটি অবারিত দুয়ার খোলে দিয়েছে; যে সবজির তারা হাইব্রিড তৈরি করতে চাচ্ছে সে দিকেই তারা সফল হচ্ছে। বেশ ক'টি সবজির হাইব্রিড তারা ইতোমধ্যে বাজারে নিয়েও এসেছে।

সপ্তম অধ্যায়

কোষকলা আবাদের মাধ্যমে ফসলের উন্নয়ন

উদ্ভিদের অযৌন প্রজননের বিষয়টি আমাদের সবার জানা। উদ্ভিদের নানা রকম অঙ্গ ব্যবহার করা হয় এ কাজে। রূপান্তরিত কাণ্ড, মূল, কুঁড়ি, গাছের পাতা, কন্দ, রাইজোম, বুলবিল এবং কর্তিত কাণ্ড এমনি কত রকম অঙ্গের মাধ্যমে অযৌন প্রজনন সংগঠিত হয়ে থাকে। ফসলের অযৌন প্রজননের বিষয়টিকে কৃষকগণ এবং প্রজননবিদেরা নানাভাবে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজে লাগিয়েছেন। গোলআলু, আপেল, স্ট্রবেরি আর নানা রকম অলংকারিক উদ্ভিদে এ ধরনের প্রজনন যেন আশির্বাদস্বরূপ। ফসলের জাতের গুণাগুণ হুবহু রক্ষা করা যায় বছরের পর বছর। এসব অঙ্গ ছাড়াও গাছপালার অঙ্গচ্ছেদন করে কখনও কাণ্ড বা পাতার অংশ কিংবা মূল দিয়ে বংশবিস্তার ঘটানো হচ্ছে।

BANGLADESH Library
Accession No. 15257

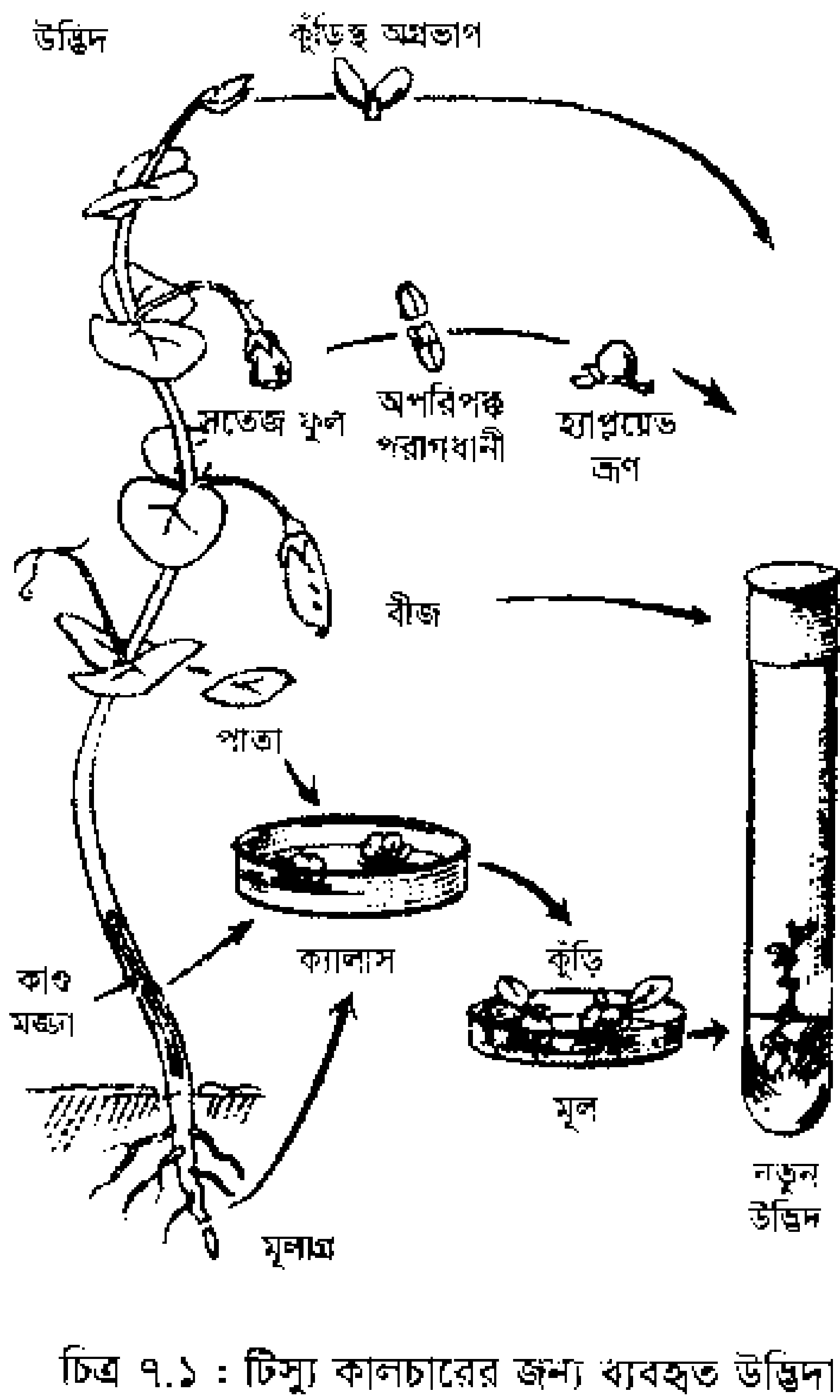

চিত্র ৭.১ : টিস্যু কালচারের জন্য ব্যবহৃত উদ্ভিদাংশ

ফসলের নানা রকম অঙ্গ আর উদ্ভিদাংশ দিয়ে ফসল উৎপাদন করার চিরায়ত কৌশল থেকেই বিজ্ঞানীদের মনে কৃত্রিম পুষ্টিসমৃদ্ধ মাধ্যমে (nutrient medium) উদ্ভিদ সৃষ্টির ধারণাটি এসে থাকতে পারে। ১৮৬০ সালে জার্মান উদ্ভিদতত্ত্ববিদ Julius Von Sachs মাটি ছাড়া কেবল পানির উপর গাছ জন্মানো যায় কিনা এ নিয়ে এক চমৎকার পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। পানির উপরে ভাসমান ছিদ্রযুক্ত কর্কের উপর তিনি শিম, ভুট্টা এবং এক ধরনের গম জন্মাতে সক্ষম হন। কর্কের ছিদ্রপথ দিয়ে অঙ্কুরিত চারার মূলগুলো পৌঁছে যায় পানিতে। পানিতে তিনি নাইট্রোজেন, লোহা, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস আর গন্ধক মিশিয়ে দেন। এই প্রথম মাটি ছাড়া কৃত্রিম খাদ্য উপাদানের উপর নির্ভর করে উৎপন্ন করা সম্ভব হলো উদ্ভিদ। কৃত্রিম খাদ্য উপাদান নির্ভর মাধ্যমে যে উদ্ভিদ জন্মানো সম্ভব এ ধারণাটি এতে প্রমাণিত হলো। তবে কোষকলা আবাদ শুরু করার জন্য মানুষকে এগুতে হলো আরও অনেক দূর। তাকে এজন্য অনেক সত্য আর অনেক কৌশল আবিষ্কার করতে হয়েছে।

১. কোষ কলা আবাদের ইতিহাস

জার্মান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী Gottlieb Haberlandt ১৯০২ সালে উদ্ভিদ কোষ সম্পর্কে একটি চমৎকার তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। উদ্ভিদের প্রতিটি কোষের মধ্যে যে ফুলে ফলে শোভিত একটি সম্পূর্ণ উদ্ভিদে পরিণত হবার প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও নির্দেশনা রয়েছে এটিই হলো সে তত্ত্ব। তাঁর তত্ত্ব মতে কেবল ফসলের বীজ থেকে নয় বরং পাতার একটি ক্ষুদ্রাংশ বা শীর্ষ কুঁড়ি বা মূলাগ্র থেকেও কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে এক একটি পরিণত গাছ পাওয়া সম্ভব। তিনি গ্লুকোজ, পেপটোন এবং নপের (Knop) দ্রবণ দ্বারা পুষ্টি মাধ্যম তৈরি করে তাতে পৃথককৃত কোষকলা আবাদ করে গাছ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। আবাদ মাধ্যম আবাদের পূর্বে উদ্ভিদাংশ যে নিবীর্জকরণ করে নেয়া উচিত তাও তিনি উপলব্ধি করেন। তবে তিনি নিজে এ কাজে সফলতা লাভ করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনিই প্রথম কোষের একটি পরিপূর্ণ উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার ক্ষমতার আভাষ দেন। একটি বৈজ্ঞানিক সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। পুরুষ এবং স্ত্রী ফুলের জনন কোষ একত্রে মিলিত হয়ে যে কোষ সৃষ্টি করে তা থেকেই শুরু হয় কোষ বিভাজনের মাধ্যমে আরও বহু কোষ সৃষ্টির কর্মকাণ্ড। প্রতিটি কোষই মূলত সেই একটি কোষেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। সেই একটি কোষের তথ্যই সঞ্চারিত হয়েছে আর সকল কোষে। উদ্ভিদের একটি কোষ আবাদ করে পরিপূর্ণ একটি উদ্ভিদ সৃষ্টির ক্ষমতাকে টটিপটেন্সি (totipotency) বলা হয়। এ সত্যটির উপরই ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে কোষকলা আবাদ কৌশল।

কোষকলা আবাদের জন্য সঠিক মাত্রায় হরমোন প্রয়োগ একান্ত জরুরি। ১৯৩৪ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী Roger Gautheret অক্সিন আবিষ্কার করেন। তিনি গাজরের কর্তিত অংশ নিয়ে চিনি, খনিজ দ্রব্য আর ভিটামিন সমৃদ্ধ মাধ্যমে আবাদ করেন। তিনি যখন তাতে অক্সিন যুক্ত করলেন তখন লক্ষ্য করলেন যে, গাজরের কর্তিত অংশ থেকে অসংগঠিত এক দল কোষ জন্ম নিয়েছে। একে তিনি 'ক্যালাস' (callus) নাম দিলেন। ত্রিশের দশকের শেষের দিকে অন্যান্য হরমোনগুলো আবিষ্কৃত হলো।

কোষকলা আবাদের প্রথম সাফল্য এলো ১৯৩৯ সালে যখন তামাকের এবং গাজরের অসংগঠিত ক্যালাস কোষ অন্তত কিছু সময়ের জন্য বেঁচে থাকতে এবং কোষ বিভাজন করতে সক্ষম হয়। কোষকলা আবাদের আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে কিন্তু মধ্য পঞ্চাশের দশক থেকে মধ্য ষাটের দশকের মধ্যে।

এ সত্যটি ১৯৫৭ সালে আবিষ্কৃত হয় যে, কেবল হরমোন নয় বরং এদের অনুপাত কোষকলা আবাদে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিজ্ঞানী Skoog এবং Miller এ তথ্য প্রকাশ করলেন যে, অক্সিন এবং সাইটোকাইনিনের অনুপাত তামাকের অঙ্গ উৎপাদনের সহায়ক। ১৯৫৮ সালে এসে একগুচ্ছ আবাদি কোষ থেকে প্রথম বারের মতো সম্পূর্ণ গাছ পেতে সক্ষম হন বিজ্ঞানী F.C. Steward। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে এসে ফরাসী বিজ্ঞানী Georges Morel গোলআলুর ভাইরাস রোগ থেকে গোলআলুকে রক্ষার জন্য টিস্যু আবাদের কথা চিন্তা করলেন। তিনি ভাইরাস আক্রান্ত গোলআলু গাছ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে লক্ষ্য করলেন যে বর্ধনশীল অঞ্চলের শীর্ষস্থ অঞ্চল যাকে 'মেরিস্টেম' (meristem) বলা হয় তা একেবারে রোগমুক্ত। বিজ্ঞানী Morel বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের ক্ষুদ্রাকার একটি অংশ নিয়ে কৃত্রিম মাধ্যমে আবাদ করেন। আবাদ মাধ্যমে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যখন ক্ষুদে ক্ষুদে চারা গাছ কঠিন মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয় তখন হাজার হাজার কৌলিতাত্ত্বিকভাবে একইরকম গাছ সৃষ্টি হয়। মাধ্যমে সুষম মাত্রায় হরমোন ব্যবহার করায় মূল গোলআলু গাছের অনেকগুলো ক্লোন তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল যা ছিল সম্পূর্ণ ভাইরাস মুক্ত। এ থেকে শুরু হয় টিস্যু কালচার ক্লোনিং।

১৯৬০ সালে এসে টিস্যু কালচারের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়। ইংরেজ বিজ্ঞানী E.C. Cocking ব্যাকটেরিয়া আর ছত্রাক থেকে নানা রকম এনজাইম সংগ্রহ করে নেন এবং এসব এনজাইম প্রয়োগ করে টমেটো কোষের শক্ত কোষ প্রাচীরটিকে আলাদা করে ফেলার চেষ্টা করেন। তিনি উদ্ভিদের কোষ কলা থেকে কোষ প্রাচীর বিহীন 'প্রোটোপ্লাস্ট' বের করার কৌশল আবিষ্কার করেন। সন্দেহ নেই এটি একাট যুগান্তকারী আবিষ্কার। কেবল এ জন্য নয় যে, এরফলে কোষ কলা আবাদের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। বরং এ কারণে আরও অধিক যে, 'প্রোটোপ্লাস্ট' আলাদা করে নেবার ফলে জিনপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হলো। ফসলের দূর সম্পর্কিত আত্মীয় বা অনাত্মীয় প্রজাতি, গণ বা যে কোনো ধরনের জীবের জিন আলাদা করে নিয়ে সরাসরি প্রোটোপ্লাস্টে অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব হলো। এ কৌশলটি এখন জিন প্রকৌশল প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্ব ধাপ।

১৯৬২ সালে বিজ্ঞানী T. Murashige এবং F. Skoog তামাক আবাদের জন্য একটি আবাদ মাধ্যমের ফর্মুলা দেন। এটি যে চিরায়ত কোনো ফর্মুলা তা নয় কিন্তু এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফর্মুলা। বিজ্ঞানীরা নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী এ ফর্মুলার নানা রকম রূপান্তর করে নিয়ে গবেষণার কাজ চালাতে পারেন। তাঁদের ফর্মুলা বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের কোষকলা আবাদে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অবশ্য বিজ্ঞানী Skoog এবং Miller ইতোপূর্বে চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন কিভাবে দু'টি উদ্ভিদ

হরমোন- অক্সিন এবং সাইটোকাইনিন ক্যালাসের রূপান্তরণ ঘটিয়ে একটি উদ্ভিদে পরিণত করে। এ দুটি হরমোন যখন সুষম অবস্থায় থাকে, তখন কোষ পিণ্ডগুলো ক্যালাস অবস্থাতেই রয়ে যায়। মাধ্যমে সাইটোকাইনিনের পরিমাণ কমিয়ে আনলে মূল গজাতে শুরু করে এবং অন্যদিকে সাইটোকাইনিনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে কুঁড়ি এবং বিটপ তৈরি হয়।

বিজ্ঞানী V. Vasil এবং A.G. Hildebrandt ১৯৬৫ সালে ঘোষণা করেন যে, তাঁরা একক কোষ থেকে তামাক গাছের সম্পূর্ণ একটি উদ্ভিদ পুনরুৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। এর ঠিক এক বছর পর বিজ্ঞানী Stewart এবং তাঁর সহযোগীরা গাজরের পৃথককৃত কোষ তরল মাধ্যমে আবাদ করে প্রথম দৈহিক বা অঙ্গজ ভ্রূণ (somatic embryo) তৈরি করতে সক্ষম হন। অবশ্য একই সময়ে তাঁরা অন্য একটি উদ্ভিদের পাতা থেকে মেসোফিল কোষ আবাদ করেও অঙ্গজ ভ্রূণ উদ্ভাবন করতে সমর্থ হন।

বিজ্ঞানী Maheswari and Guha ১৯৬৫ সালে ধুতুরার পরাগধানী আবাদ করে পরাগরেণু থেকে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ প্রথম উদ্ভাবন করতে সমর্থ হন। পরাগধানী বা পরাগরেণু থেকে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ তৈরির কৌশলটি বিজ্ঞানীদের নিকট বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানী Nitch এবং তাঁর সহযোগীরা এ কৌশলটিকে পরবর্তীতে আরও উন্নত করে তোলেন।

বিজ্ঞানী Carlson এবং তাঁর সহযোগীরা ১৯৭২ সালে তামাকের দুটি প্রজাতির প্রোটোপ্লাস্ট আলাদা করে নিয়ে কৃত্রিমভাবে সংযোগ ঘটিয়ে প্রথম অঙ্গজ হাইব্রিড (somatic hybrid) তৈরি করেন। তার ছয় বছর পর জার্মানির বিজ্ঞানী Melchers একেবারে ভিন্ন দুটি গণের প্রোটোপ্লাস্ট ব্যবহার করে অঙ্গজ বা দৈহিক হাইব্রিড তৈরি করেন। তিনি টমেটো এবং গোলআলুর প্রোটোপ্লাস্টের মিলন ঘটিয়ে পমেটো (pomato) নামক একটি হাইব্রিড উদ্ভিদ উদ্ভাবন করেন। এ উদ্ভিদটি পরিণত বয়সে ফুল তৈরি করলেও কোনো বীজ তৈরি করতে পারেনি।

উদ্ভিদের অঙ্গজ অংশ কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে আবাদ করে তা থেকে প্রাপ্ত উদ্ভিদের বিভিন্নতাকে কাজে লাগিয়ে ফসল উন্নয়ন সাধনের কাজও ইতোমধ্যে শুরু হয়ে যায়। আশির দশকের একেবারে গোড়াতে এসে এভাবে উদ্ভিদে সৃষ্ট বিভিন্নতাকে বিজ্ঞানী Larkin এবং Scowcroft সোমাক্লোনাল প্রকরণ বা অঙ্গজ বিভিন্নতা (somaclonal variation) নামকরণ করেন। সত্তর দশকের শেষের দিক থেকে উদ্ভিদের কোষকলা আবাদ কৌশল কৃষি এবং শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে তাৎপর্যময় অবদান রাখতে শুরু করে। ফসল উন্নয়নের প্রচলিত কৌশলসমূহের সঙ্গে সম্পূরক এবং কখনও কখনও পরিপূরক হিসেবে কোষকলা আবাদ কৌশল ফসল উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২. ভ্রূণ আবাদ

ভ্রূণ আবাদ হলো একটি বহুল ব্যবহৃত তুলনামূলকভাবে সহজ কোষকলা আবাদ কৌশল। দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সঙ্করায়ন করা হলে প্রায়শ দেখা যায় যে, ভ্রূণ তৈরি হলেও ভ্রূণের খাদ্যের জন্য বীজে প্রয়োজনীয় সস্য (endosperm) তৈরি হয় না। এসব

হাইব্রিডে বীজে সস্যের অনুপস্থিতির কারণে খাদ্যের অভাবে ভ্রূণ ঝরে যায় বা ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যায়। এ ধরনের হাইব্রিডের বীজ থেকে ভ্রূণটি আলাদা করে নিয়ে ভ্রূণ আবাদ করলে তা থেকে স্বাভাবিক প্রকৃতির হাইব্রিড উদ্ভিদ পাওয়া সম্ভব হয়। টিস্যু কালচারের এ কৌশলটির আবিষ্কার বহু আন্তঃপ্রজাতি সঙ্করায়ন থেকে হাইব্রিড উদ্ভিদ পাওয়া সম্ভবপর করে তুলেছে। ফলে কেবল একই প্রজাতির এক জাত থেকে অন্য জাতে নয় বরং দুটি ভিন্ন প্রজাতির জাতসমূহের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আদান প্রদান করা সম্ভবপর হয়েছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনকি এক গণের সঙ্গে অন্য গণের উদ্ভিদের হাইব্রিড উৎপাদন করাও সম্ভবপর হয়েছে। ভ্রূণ আবাদ কৌশলের সহায়তায় হাইব্রিড তৈরি করা সম্ভব হয়েছে *Triticum* এবং *Agelops*, *Triticum* এবং *Secale* সহ আরও বহু গণের মধ্যে। ফলে দূর সম্পর্কিত প্রজাতি বা গণের কোনো উদ্ভিদ থেকে একটি বা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন আমাদের আবাদি জাতে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে, ত্বরান্বিত হয়েছে ফসলের উন্নয়ন। অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে জিন ব্যাংকে জমা করে রাখা ফসলের নানা স্তরের আত্মীয়-স্বজনের জিন সম্ভার। অবশ্য এ কথাও এখানে উল্লেখ করা একান্ত দরকার যে, যেসব প্রজাতি বা গণের সঙ্গে আমাদের ফসল প্রজাতির সঙ্করায়ন ব্যর্থ হয় সেখানে ভ্রূণ আবাদ কৌশল কোনো কাজে আসে না।

অনেক সময় ফসলের সুপ্তাবস্থা এড়াতে ভ্রূণ আবাদ কৌশল ব্যবহার করা যায়। বার্লিতে একগ্রস্থি বা মনোপ্লয়েড (monoploid) উদ্ভিদ উৎপাদনেও এটি খুব কার্যকর কৌশল। কনিফার আর ঘাসজাতীয় উদ্ভিদে অঙ্গজ মাইক্রোপ্রোপাগেশনের কাজেও এর ব্যবহার হচ্ছে। অর্কিডের বীজের একটি বড় সমস্যা হলো এর বীজে কোনো সস্য সৃষ্টি হয় না। ফলে বীজ থেকে স্বাভাবিক উপায়ে কোনো অর্কিড গাছ পাওয়া যায় না। তবে অর্কিড বীজের ভ্রূণটি সরিয়ে নিয়ে কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে ভ্রূণটি আবাদ করলে সহজেই সতেজ স্বাভাবিক উদ্ভিদ পাওয়া সম্ভব হয়।

৩. পরাগধানী বা পরাগরেণু আবাদ

উভলিঙ্গী ফুলের পুং-কেশরের মাথায় থাকে থলের মতো একটি পরাগধানী। পরাগধানীর ভেতর মিয়োসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজন ঘটে এবং এর ফলে হ্যাপ্লয়েড পরাগরেণু তৈরি হয়। এসব পরাগরেণু বাতাস, কীটপতঙ্গ বা অন্য কোনো বাহকের উপর ভর করে চলে যায় ফুলের স্ত্রীকেশরের গর্ভমুণ্ডে। এভাবে সংঘটিত হয় পরাগায়ন, পরাগায়নের মাধ্যমে হয় নিষেক। পরিণামে সৃষ্টি হয় এক একটি বীজ। স্ব-পরাগী ফসলে অবশ্য একই ফুলের মধ্যে আবদ্ধ পরাগরেণু ঝড়ে পড়ে সেই ফুলেরই গর্ভমুণ্ডে। এভাবে নিষ্পন্ন হয় স্ব-পরাগায়ন আর নিষেক। পুংকেশরের পরাগধানীর ভেতরে জমা হয়ে থাকা পরাগরেণুর এটিই হলো স্বাভাবিক প্রয়োগ। কিন্তু এখন এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে অন্য কারণেও। কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে এখন পরাগধানী বা পৃথক করা পরাগরেণু আবাদ করে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে উদ্ভিদ। এসব উদ্ভিদ হ্যাপ্লয়েড প্রকৃতির হওয়ায় কলচিসিন নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবণ ব্যবহার করে পাওয়া

যাচ্ছে দ্বিগুণিত হ্যাপ্লয়েড বা ডাবল্ড হ্যাপ্লয়েড (doubled haploid)। এরকম দ্বিগুণিত হ্যাপ্লয়েড প্রাপ্তির বেশ ক'টি সুবিধে রয়েছে। একটি মাত্র বংশধরে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে সম্পূর্ণ হোমোজাইগাস উদ্ভিদ। এতে প্রচলিত পদ্ধতি অপেক্ষা সময় লাগছে অনেক কম। দ্বিতীয় সুবিধাটি হলো এই যে, এগুলো শতকরা ১০০ ভাগ হোমোজাইগাস যা প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রায় অসম্ভব।

ফসল উন্নয়নে এর সুবিধেটি হলো দুটি কারণে। একটি হচ্ছে, কোনো দুটি জাতের মধ্যে সঙ্করায়ন করার পর সরাসরি হাইব্রিড উদ্ভিদের পরাগরেণু আবাদ করে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে দ্বিগুণীত হ্যাপ্লয়েড বা ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ। ফলে হাইব্রিড উদ্ভিদের সন্তান-সন্ততি থেকে সরাসরি হোমোজাইগাস কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদটি নির্বাচন করা সম্ভব হচ্ছে। নির্বাচিত উদ্ভিদটির সন্তান-সন্ততি পরবর্তীতে একইরূপ সন্তান-সন্ততি তৈরি করতে পারছে। এভাবে নির্বাচন সঠিক এবং অধিকতর কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে। সুবিধের আর একটি কারণ হলো, এর জন্য প্রয়োজন হয় অল্প সময়। তুলনামূলকভাবে দু'চার বছর পূর্বে একটি ফসলের জাত বাজারে অবমুক্ত করা যায়।

চীনে পরাগধানী বা পরাগরেণু আবাদ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ধান, গম এবং তামাক ফসল উন্নয়নে এ পদ্ধতি এখন ওখানে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ কৌশল প্রয়োগ করে এ তিনটি ফসলে উদ্ভাবিত জাতের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। এক হিসেবে Hu লক্ষ্য করেছেন যে, নব্বই দশকের শুরুতেই চীনে ধানের ৫০ টি জাত ও গমে ২০ টি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে পরাগধানী আবাদ থেকে প্রাপ্ত গাছের মধ্যে নির্বাচন পরিচালনা করে। Tanyu No,1, Huayu1, Xin Xion, Hua Han Zhong Zao 8, 9, 10, Chao Hua Ai, Hua 03 ইত্যাদি কিছু ধানের জাতের উদাহরণ, যা সৃষ্টি হয়েছে পরাগধানী বা পরাগরেণু আবাদ করে এবং ক্রোমোজম সংখ্যা কৃত্রিমভাবে দ্বিগুণিত করে। ইদানিং কালে পৃথিবীর নানা দেশে অন্যান্য ফসল উন্নয়নে এ কৌশলটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

৪. ভাইরাস রোগমুক্ত ফসল

ফসলের প্রধান তিনটি শত্রু হলো আগাছা, কীটপতঙ্গ ও রোগবালাই। এর কোনোটিকেই উপেক্ষা করার কোনো উপায় নেই। এর যে কোনো একটির সংখ্যাধিক্য ফসলের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে। ফসলের রোগবালাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর এবং অপ্রতিরোধ্য হলো- 'ভাইরাস'। ফসলে একবার ভাইরাস সংক্রমণ ঘটে গেলে তা থেকে আক্রান্ত ফসলকে রক্ষা করার আর কোনো উপায় থাকে না। আজকাল টিস্যু কালচার করে ভাইরাস প্রতিরোধী না হলেও ভাইরাস রোগমুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে। গোলআলু এবং অন্য আরও কিছু ফসলে ভাইরাসমুক্ত ক্লোন বা বংশবিস্তারক্ষম একক সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে। কখনও শুধু উদ্ভিদের মেরিস্টেম আলাদা করে নিয়ে আবাদ করে আবার কখনও তাপ প্রয়োগ করে বা তাপমাত্রা অনেক কমিয়ে দিয়ে বা কখনও আবার রাসায়নিক পদার্থ সহযোগে বিভিন্ন ফসলে ভাইরাস রোগমুক্ত উদ্ভিদের বংশবিস্তার একক সৃষ্টি করা যাচ্ছে। সরাসরি এটি অবশ্য কোনো উদ্ভিদ উন্নয়ন পদ্ধতি নয় বটে, তবে টিস্যু আবাদ করে এ পদ্ধতিতে ফসলের জাতের গুণাগুণ রক্ষা করে অধিক ফসল নিশ্চিত করার এটি একটি উপায়।

৫. পীড়ন প্রতিরোধী জাত সৃষ্টি

ফসলের উন্নয়নের একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হলো ফসলের বিভিন্নতা সৃষ্টি করা। মিউটেশন, সঙ্করায়ন, বহুপ্রস্থিকরণের (polyploidization) মতো টিস্যু আবাদও ফসলে বিভিন্নতা সৃষ্টির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে অবদান রাখতে শুরু করেছে। উদ্ভিদের কোষ কলা আবাদ করার ফলে সৃষ্ট গাছপালা মাঠ পর্যায়ে যে বিভিন্নতা প্রদর্শন করে তা থেকে কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ বাছাই করে নিয়ে নতুন নতুন জাত সৃষ্টি করা আজ আর কোনো কল্পনা নয়। কখনও কখনও আবার এসব কোষ কলা আবাদের সময় কোনো একটি নির্দিষ্ট রোগ প্রতিরোধী জাত সৃষ্টি করতে হলে আবাদ মাধ্যমে সেই রোগজীবাণুর বিষাক্ত দ্রব্য মিশিয়ে দিয়ে বাছাই করা সম্ভব হয় ঐ রোগ প্রতিরোধী জাত।

তামাকের *Pseudomonas tabaci* নামক অণুজীবের আক্রমণে সৃষ্টি হয় 'ওয়াইল্ড ফায়ার' রোগ। তামাকের কোষের আবাদে এ অণুজীবের সমতুল্য বিষাক্ত পদার্থ মেথিওনিন সালফোক্সিমিন যুক্ত করে দিয়ে এ রোগের প্রতিরোধী গাছ বাছাই করা সম্ভব হয়েছে। একইভাবে ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট (wilt) প্রতিরোধী টমেটো লাইন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এমনকি আখেও ফিজি (Fiji) রোগ প্রতিরোধী জাত তৈরি করা সম্ভব হয়েছে যা 'Oho' জাত নামে বাজারজাতও করা হয়েছে। হাওয়াইতে ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে টিস্যু আবাদকে সমন্বয় করার ফলে 'ডাউনি মিলডিও' ভাইরাস এবং 'আই স্পট' রোগ প্রতিরোধী আখ জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। এসব ক্লোনে চিনির পরিমাণ যেমন বেশি তেমনি পেরেন্টাল উদ্ভিদ অপেক্ষা ফলনশীলতাও অধিক।

ভারতের কোইম্বিটরের আখ প্রজনন ইনস্টিটিউটে এভাবে সৃষ্ট জাত অবমুক্ত করে যাচ্ছে এক দশক ধরে। মিষ্টি আলুতে 'Scarlet' নামক একটি জাত নির্বাচন করা হয়েছিল শীর্ষ বিটপ আবাদ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্নতা সম্পন্ন গাছ থেকে। নির্বাচিত সোমাক্লোনের পলিক্রস থেকে পাওয়া গেছে আলফা আলফা জাত 'Sigma'। রাই সরিষাতে 'Pusa Jai Kisan' জাতটি বাছাই করা হয়েছে 'Varuna' নামক জাতের অঙ্গজ কোষ আবাদ থেকে প্রাপ্ত গাছ থেকে। 'Bio-13' নামক একটি ওষুধি গাছের জাত তৈরি করা হয়েছে অঙ্গজ কোষের আবাদ থেকে প্রাপ্ত গাছ হতে কাঙ্ক্ষিত গাছ বাছাই করে।

খেসারিতে 'রতন' নামক একটি জাত বাছাই করেছে নতুন দিল্লীতে ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা। এ জাতটির নিউরোটক্সিন মাত্রা অত্যন্ত কম। 'Mc Gregor' নামক তিসি জাতটি থেকে নির্বাচন করা সম্ভব হয়েছে লবণাক্ততা সহিষ্ণু 'Andro' তিসির একটি জাত। রাশিয়াতে Bioryza নামক ধানের জাত সৃষ্টি করা হয়েছে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে সৃষ্ট বিভিন্নতা থেকে। এর দানাগুলো ছিল বড় এবং এর স্থিতিকাল যথেষ্ট কমে এসেছিল। গাজরে Vegisnax নামক একটি জাতও সৃষ্টি করা নয় টিস্যু কালচার থেকে সৃষ্ট বিভিন্নতা হতে। গত শতাব্দির শেষে এসে এক ডজনেরও অধিক ফসলের জাত সৃষ্টি করা হয়েছে এ পদ্ধতি অবলম্বন করে।

৬. প্রোটোপ্লাস্ট আবাদ ও অঙ্গজ সঙ্করায়ন

প্রোটোপ্লাস্ট আবাদ কৌশল এবং ফসলের অঙ্গজ সঙ্করায়ন কৌশল ফসল উন্নয়নে কেবল যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তাই নয় বরং প্রোটোপ্লাস্ট এখন জিন স্থানান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ একক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরাসরি নানা কৌশল অবলম্বন করে যে কোনো জীব থেকে কাঙ্ক্ষিত জিন আলাদা করে নিয়ে এখন প্রবিষ্ট করে দেয়া সম্ভব হচ্ছে প্রোটোপ্লাস্টে। জিন বন্দুক ব্যবহার করে সরাসরি প্রোটোপ্লাস্টে ঢুকিয়ে দিয়ে ফসলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন এখন জীনপ্রযুক্তির অনিবার্য কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড বাহকে কাঙ্ক্ষিত জিন ঢুকিয়ে দিয়ে প্রোটোপ্লাস্টের সঙ্গে এক সঙ্গে আবাদ করেও কাঙ্ক্ষিত জিন ফসলের প্রোটোপ্লাস্টে ঢুকিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে এবং ট্রান্সজেনিক ফসল সৃষ্টি করা হয়েছে।

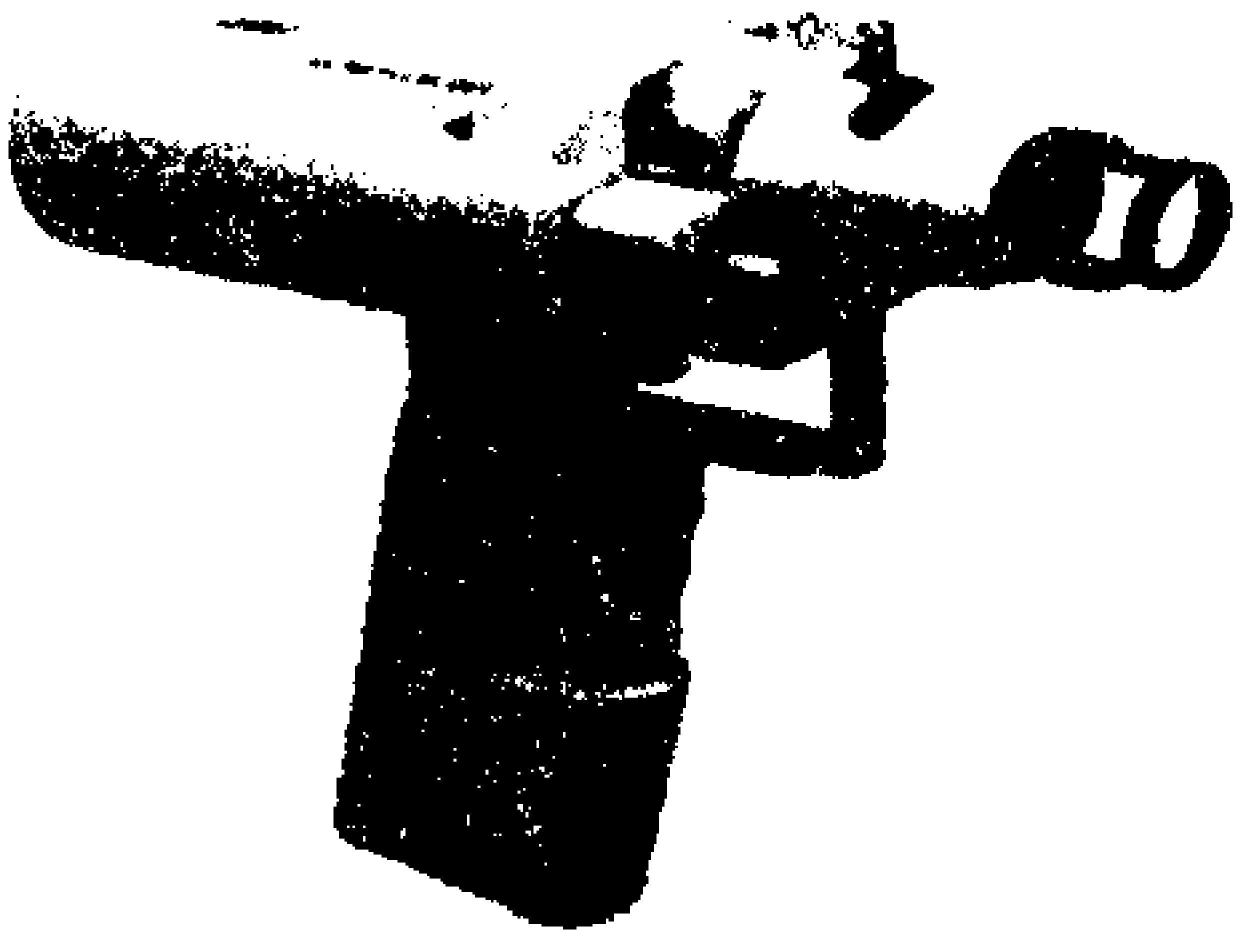

চিত্র ৫.২ : উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাস্টে জিন অনুপ্রবিষ্ট করার কাজে ব্যবহৃত জিন বন্দুক

শুধু প্রোটোপ্লাস্ট আবাদ করেও সৃষ্টি করা হয়েছে অল্প ক'টি ফসলের জাত। ধানের Koshinikavi জাতের প্রোটোপ্লাস্ট পর পর কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে জন্মিয়ে পাওয়া গেছে নতুন জাত Hasuyume। নতুন জাত এর প্রজনক অপেক্ষা শতকরা ১০ ভাগ অধিক ফলন দেয় এবং এর নেতিয়ে না পড়ার স্বভাব প্রাপ্ত হয়।

কোনো একটি প্রজাতির দুটি জাতের মধ্যে জিন বিনিময় বেশ সহজ এবং এটি অহরহ ব্যবহার করা হচ্ছে ফসলের জাত সৃষ্টির কাজে। দুটি ভিন্ন প্রজাতি অথবা দুটি ভিন্ন গণের বৈশিষ্ট্য কোনো ফসলে স্থানান্তর করা সনাতন পদ্ধতিতে অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। এর মূল কারণ হচ্ছে এই যে, প্রায়শই দুটি ভিন্ন প্রজাতি বা দুটি ভিন্ন গণের মধ্যে সঙ্করায়ন সফল হয় না। দুটি প্রজাতি বা গণের মধ্যে অসংগতি থাকায় অনেক

Nicotiana tabacum থেকে *N. rustica* তে একটি রোগ-প্রতিরোধী জিন স্থানান্তরের লক্ষ্যে এদের প্রোটোপ্লাস্টের মিলন ঘটানো হয় এবং সেখানে 'Delgold' ও 'Dr. Chang' নামক দুটি তামাকের জাত অবমুক্ত করা হয়। জাপানে অঙ্গজ মিলন ঘটিয়ে Senposai নামে এক ধরনের নতুন সবজি তৈরি করা হয়। সাধারণ বাঁধাকপির কোষের সঙ্গে এক ধরনের চাইনিজ বাঁধাকপির কোষের মিলন ঘটিয়ে এ সবজিটি পাওয়া যায়। নতুন সবজিটিতে বাঁধাকপির উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল বৈশিষ্ট্যটি সংযুক্ত হয়েছে অন্যান্য গুণাগুণের পাশাপাশি।

ইদানিংকালে অঙ্গজ সঙ্করায়নের মাধ্যমে 'সাইব্রিড' তৈরি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ সঙ্করায়ন কর্মসূচিতে হাইব্রিডে দুটি প্রজনকের নিউক্লিয়ার জীনের সমাহার ঘটলেও হাইব্রিডটি সাইটোপ্লাজম পায় কেবল মা উদ্ভিদ থেকে। দুটি প্রজনকের সাইটোপ্লাজম তথা সাইটোপ্লাজমের জিন হাইব্রিডে পাবার সুযোগ নেই প্রচলিত পদ্ধতিতে। প্রোটোপ্লাস্ট মিলনের মাধ্যমে সৃষ্ট হাইব্রিডে কিন্তু দুটি প্রজাতির সাইটোপ্লাজম একত্রে পাবার সুযোগ ঘটে এবং সাইটোপ্লাজমে বাহিত জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য হাইব্রিডে পাবার সুযোগ ঘটে। দুটি প্রজাতির সাইটোপ্লাজম যে হাইব্রিডে একত্রিত হয় তাকে 'সাইব্রিড' বলা হয়।

সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া আর ক্লোরোপ্লাস্টে DNA রয়েছে বিধায় প্রজননবিদগণ কোনো সাইব্রিডে পেতে চান একটি মাইটোকন্ড্রিয়া এবং অন্যটির ক্লোরোপ্লাস্ট। কখনও কাম্য হতে পারে দুটির ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে DNA নেয়া দেয়ার মাধ্যমে পুনঃসংযুক্ত DNA আবার যে কোনো এক প্রজনকের পরিপূর্ণ মাইটোকন্ড্রিয়াটাই। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত হতে পারে পুনঃসংযুক্ত মাইটোকন্ড্রিয়া আর গোটা ক্লোরোপ্লাস্ট কোনো একটি প্রজনক থেকে।

ফসলের পুংবন্ধ্যা বৈশিষ্ট্যটি অনেক ক্ষেত্রেই নিউক্লিয়াসের জিন আর সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত জিনের আন্তঃক্রিয়ার ফসল। ফলে কাঙ্ক্ষিত নিউক্লিয়াসের জিনের সঙ্গে সাইব্রিড তৈরির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সাইটোপ্লাজমের জিন পেয়ে গেলে অনেক ফসলে পুংবন্ধ্যা স্বভাবটি পাওয়া সম্ভব। হাইব্রিড বীজ তৈরির জন্য খুবই জরুরি এ স্বভাবটি পাওয়া। রেপ বীজ (*B. napus*) ফসলে মুলার মাইটোকন্ড্রিয়া আর *B. napus* এর সাইটোপ্লাজমের সংযোজন ঘটিয়ে তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল পুংবন্ধ্যাত্ব। সাইব্রিড সৃষ্টির মাধ্যমে এ স্বভাবটি আমাদের নিত্য ব্যবহার্য তামাক থেকে স্থানান্তর করা হয়েছিল *N. sylvestris* প্রজাতিতে। ব্রাসিকা প্রজাতিতে আগাছানাশক অ্যাট্রাজিন (Atrazine) প্রতিরোধিতা স্থানান্তর করা হয়েছে *B. campestris* থেকে *B. napus* এ।

৭. বাংলাদেশে টিস্যু কালচার

বাংলাদেশে টিস্যু কালচার ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ইতোমধ্যে কৃষি গবেষণার সঙ্গে জড়িত সব প্রতিষ্ঠানেই টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে BARI, BRRI, BJRI, BINA, BSRI। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ আর দু'চারটি বিশ্ববিদ্যায়েও টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোনো কোনো NGO

যেমন- BRAC, GKF, প্রশিকাসহ আরও কোনো কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও টিস্যু কালচার করার মতো ল্যাবরেটরি সুবিধা সৃষ্টি করে ফেলেছে। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনেও এই সুযোগ রয়েছে। ছোট ছোট প্রাইভেট ফুল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানেও এই সুবিধা এখন আর দুর্লভ নয়।

আমাদের দেশে কোষকলা আবাদের কাজটি শুরু হয়েছে বেশ আগে থেকেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ এতে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। যদিও বাণিজ্যিক ভাবে কোষকলা আবাদের কাজটি শুরু হয় বছর দশক ধরে পাবলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং দু'চারটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। এ দেশে সবজি ফসলের মধ্যে গোলআলুর মাইক্রোপ্রোপাগেশন বাণিজ্যিক ভাবে শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রে তৈরি হচ্ছে মাইক্রোটিউবার এবং মাইক্রোপ্রোপাগেশনের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হচ্ছে ক্ষুদে আলু উদ্ভিদ। এসব মাইক্রোটিউবার আর মাইক্রো উদ্ভিদ সরবরাহ করা হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থাকে (BADC) টিউবার বীজ এবং গোলআলুর প্রকৃত বীজ তৈরির উদ্দেশ্য। এ দেশে দু'তিনটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে আলু কন্দ নিয়ে এসে আলু গজানোর পর এর এক একটি কুঁড়ি কেটে বসিয়ে দেয় কোষকলা আবাদ মাধ্যমে। এক সময় তা থেকে জন্ম নেয় ক্ষুদে গাছ। মাঠে এ গাছ বড় হলে তৈরি করে ক্ষুদে সব কন্দ। এসব ক্ষুদে কন্দ এর পর মাঠে লাগালে পাওয়া যায় রোগমুক্ত স্বাভাবিক আলু। এসব আলু এক দু'বছর জন্মানো হয় বীজ আলুর পরিমাণ বৃদ্ধিও জন্য। এসব গোলআলু অত:পর পৌঁছে যায় কৃষকের হাতে।

উদ্যানতাত্ত্বিক প্রজাতির মধ্যে কলার শীর্ষস্থ কুঁড়ি আবাদ করে একই রকম গুণগত মানসম্পন্ন কলা চারা তৈরি করছে জি কে এফ, ব্র্যাক, প্রশিকা এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। রংপুর, নরসিংদী এবং মুন্সিগঞ্জের কলা চাষীরা অল্প আকারে এসব কলা চারা আবাদ শুরু করেছে। এসব কলা গাছে রোগবালাই এবং কীটপতঙ্গের আক্রমণ হচ্ছে কম।

ভ্রূণ আবাদ করে আন্তঃপ্রজাতি 'হাইব্রিড' পাওয়ায় চেষ্টা এদেশে শুরু হয়েছে গত দশকেই। এতে সাফল্যও এসেছে। কোনো কোনো ফুলের ক্ষেত্রেও শুরু হয়েছে কোষ কলা আবাদের গবেষণা। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ফুল তৈরি এখন আর কষ্টকর নয়। টিস্যু কালচারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয় ফুলের গাছে তা থেকে সহজেই পাওয়া সম্ভব নানা বর্ণের ফুলের গাছ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঁধাকপি এবং চায়না বাঁধাকপির মধ্যে আন্তঃপ্রজাতি অঙ্গজ সঙ্করায়ন ঘটিয়ে তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে 'ইপসা বাঁধাকপি-১'। তাছাড়া একই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগে দুই প্রজাতির পাতাকপির মধ্যে সঙ্করায়ন ও ভ্রূণ আবাদ করে তৈরি করা হয়েছে 'ইপসা পাতাকপি-১' জাতটি। কোষকলা আবাদের গবেষণার জন্য প্রয়োজন সঠিক দিক নির্দেশনা আর বিভিন্ন কোষকলা আবাদ কৌশলগুলোর সফল প্রয়োগ। তাহলেই এর বহুমাত্রিক প্রয়োগ নিশ্চিত করে তৈরি করা যাবে নানারকম ফসলের জাত।

অষ্টম অধ্যায়

জিনপ্রযুক্তির মাধ্যমে ফসলের উন্নয়ন

বিজ্ঞানী Watson ও Crick ১৯৫৩ সালে DNA অণুর দ্বি-হ্যালিক্যাল বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আণবিক জীববিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়। এই দুই বিজ্ঞানীর DNA অণুর গঠন আবিষ্কার অনেক অজানা সত্যকে সামনে নিয়ে এসেছে বটে কিন্তু নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে অনেক প্রশ্নেরও। একই দশকের শেষের দিকে এসে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানী Crick একটি চমৎকার তত্ত্ব উপহার দিলেন। তার উপস্থাপিত তত্ত্বটির নাম সেন্ট্রাল ডগমা (Central dogma) নামে পরিচিত। কিভাবে DNA থেকে তথ্যাবলি RNA তে অনুলিপিত হয় এবং তা আবার অর্থকরণের মাধ্যমে প্রোটিনে রূপান্তরিত হয় এবং প্রোটিন অতঃপর এনজাইমরূপে নানা ক্রিয়া বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে জীবের নানা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে এ তত্ত্ব সে ব্যাখ্যাই আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে।

সত্তর দশকের শুরুতেই দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার জিনপ্রযুক্তির প্রায়োগিক দিকটিকে উন্মোচিত করে। বিজ্ঞানী Temin ও Baltimore রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস (reverse transcriptase) নামক এক প্রকার এনজাইম আবিষ্কার করেন। অন্যদিকে বিজ্ঞানী Aber ও Smith ব্যাকটেরিয়া থেকে আবিষ্কার করেন রেসট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ (restriction endonuclease) নামক এক প্রকার এনজাইম– যা DNA কে সুনির্দিষ্ট স্থানে সহজেই কেটে দিতে পারে। আর কর্তিত জিনকে জোড়া লাগাবার জন্য আবিষ্কার করেন লাইগেজ (ligase) নামক এক প্রকার এনজাইম। এ তিনটি এনজাইমকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানী Berg অতঃপর উদ্ভাবন করেন জিনপ্রযুক্তি। কোনো একটি জীবের একটি জিন শনাক্ত করে তা এনজাইমের সাহায্যে কর্তন করে নিয়ে অন্য আর একটি জীবের DNA অণুতে জিনটি সংযোজন করে দিয়ে বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটানোই হলো জিনপ্রযুক্তির কাজ। এই পদ্ধতিকেই বলা হয় রিকম্বিনেন্ট ডি এন এ প্রযুক্তি (recombinant DNA technology)– যা আধুনিক জীবপ্রযুক্তির মূল ভিত্তি।

প্রচলিত ফসল উন্নয়ন পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করে গত পাঁচ ছয় দশকে বিজ্ঞানীরা প্রভূত সাফল্য লাভ করেছে। প্রায় সব ফসলেই ফলন বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। বিশেষ করে ধান, গম ও ভুট্টা এ তিনটি দানাদার খাদ্যশস্যের ফলন বেড়েছে অকল্পনীয় হারে। বিজ্ঞানীরা জিনপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ নিয়েছে।

১. জিনপ্রযুক্তি প্রয়োগের কারণ

উদ্ভিদ প্রজননবিদদের একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো কোনো একটি উত্তম অভিযোজনক্ষম উচ্চ ফলনশীল জাতের একটি ত্রুটি বা দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য অন্য একটি জাত

থেকে একটি ক্রটিমুক্ত বা সবল জিন এতে সন্নিবেশন করা। এক্ষেত্রে কিছুতেই যেন উন্নত জাতটির অন্যান্য উত্তম গুণাবলি বিনষ্ট না হয় এবং কেবল অন্য জাত থেকে একটি উত্তম বৈশিষ্ট্যের জিন সংযোজিত হয় প্রথম জাতটিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি এরকম দুটি জাতের মধ্যে পরাগায়নের মাধ্যমে জিন স্থানান্তর করা সম্ভব হয়, তাহলে উদ্ভিদ প্রজননবিদগণ ক্রসিং এবং ব্যাকক্রসিং পদ্ধতি প্রয়োগ করে এ লক্ষ্য অর্জন করার চেষ্টা করেন। এর ফলে যে সাফল্য আসেনি বা আসছে না তা নয়। কিন্তু দুটি কারণে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করা কষ্টসাধ্য হয়। প্রথমটি হলো ব্যাকক্রসিংয়ের জন্য অনেক সময় এবং অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত জিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে থাকা অনাকাঙ্ক্ষিত জিনও ফসলটিতে থেকে যায়। ফলে ফসলের ফলনশীলতা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা থাকে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২০ বংশধর পর্যন্ত ব্যাকক্রসিং করা হলেও সংযোজিত জিনসমূহের একটি বড় অংশ উন্নত জাতটিতে থেকে যায়। আর দ্বিতীয় কারণটি হলো সুনির্দিষ্টভাবে একটি জিন সংযোজন করতে না পারা। ব্যাকক্রসিং পদ্ধতির আর একটি বড় সমস্যা হলো এটি কেবল তখনই প্রয়োগ করা যায় যখন দুটি জাতের মধ্যে ক্রসিং করা সম্ভব হয়। অনেক সময় দুটি ভিন্ন প্রজাতির জাতসমূহের মধ্যে ক্রসিং করা সম্ভব হয় না বলে জিন স্থানান্তরও সম্ভব হয় না। আর যেসব জিন ভিন্ন গণ, ভিন্ন গোত্র, ভিন্ন বর্গ বা শ্রেণী বা অন্য কোনো জীব বা অণুজীবে পাওয়া যায় তা প্রচলিত পদ্ধতিতে ফসলে সংযোজন করার কোনো সুযোগই থাকে না। ফলে বিপুল জিন সম্ভারকে মানুষের উপকারে কাজে লাগানোর কোনো উপায়ই খোলা ছিল না এতদিন। অথচ একটি কাঙ্ক্ষিত নির্দিষ্ট জিন একটি ফসলে সুনিপুণভাবে সন্নিবেশিত করে দিতে পারলে তা আমাদের পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু হয়ে উঠতে পারে।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেবার জন্য শুরু হলো দুটি উদ্ভিদের দৈহিক কোষের মিলন ঘটাবার চিন্তা-ভাবনা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা সফলতা নিয়ে আসলেও অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ে এসেছে ব্যর্থতা। দুটি ফসলের অঙ্গজ কোষ নিয়ে এসে মিলন ঘটালে সরাসরি এ থেকে সাফল্য খুব কমই এসেছে। তাছাড়া সুনির্দিষ্ট করে একটি দুটি জিন সংযোজনের সুযোগ এখানে নেই। ফলে একটি কার্যকর বিকল্প সন্ধান ছাড়া বিজ্ঞানীদের আর কোনো গত্যন্তর ছিল না।

গত তিন দশক ধরে আণবিক বংশগতিবিদ্যা ও আণবিক জীববিদ্যার অসামান্য অগ্রগতি এবং বিভিন্ন কৌশলের আবিষ্কার নির্দিষ্ট জিন বিভিন্ন ফসলে সংযোজন করে ফসলের রূপান্তরণ ঘটানো সম্ভব হয়েছে। কেবল ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৩ এই দশ বছর সময়কালে ৪৬ টি ফসলে উদ্ভিদ রূপান্তরণ ঘটানো সম্ভব হয়। এর পরবর্তী দশকে এ সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে (সারণি ৮.১)।

সারণি ৮.১ উদ্ভিদ রূপান্তরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সন	যেসব ফসলে রূপান্তরণ ঘটেছে
১৯৮৩	তামাক।
১৯৮৪	গাজর, *Lotus.*

সন	যেসব ফসলে রূপান্তরণ ঘটেছে
১৯৮৫	তেলবীজ রেপ, পিটুনিয়া।
১৯৮৬	আলফা-আলফা, *Arabidopsis*, শসা, টমেটো।
১৯৮৭	অ্যাসপ্যারাগাস, তুলা, তিষি, ঘোড়ামুলা, লেটুস, পপলার, গোলআলু, রাই, সূর্যমুখি।
১৯৮৮	ফুলকপি, বেগুন, ভুট্টা, অর্চার্ড ঘাস, সয়াবিন, ওয়ালনাট।
১৯৮৯	আপেল।
১৯৯০	বাকহুইট, বার্চ, চন্দ্রমল্লিকা, সাইট্রাস, ক্লভার, আঙুর, সরিষা, পেপে, স্ট্রবেরি।
১৯৯১	কার্নেশন, কাউপি, কিউই, বাঙ্গি।
১৯৯২	সুগারবিট, গম।
১৯৯৩	মটর, বার্লি।

২. জিনপ্রযুক্তির ধাপ

জিনপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে কেবল যে উদ্ভিদ রূপান্তরণ ঘটিয়েই বিজ্ঞানীরা থেমে থেকেছেন তা কিন্তু নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত জিন কাঙ্ক্ষিত ফসলের জাতে সংযোজন করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করাও সম্ভব হয়েছে। ফসলের ক্ষেত্রে তৈরি করা হয়েছে জি.এম. ফসল বা ট্রান্সজেনিক ফসল। জিনপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে ট্রান্সজেনিক ফসল সৃষ্টি করা একটি বহু ধাপবিশিষ্ট কার্যক্রম। এর প্রথম ধাপটি হলো কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী কাঙ্ক্ষিত জিনটিকে শনাক্ত করা। আজকাল অবশ্য জিনটিকে শনাক্ত করার জন্য অনেকগুলো পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। কোনো জিনের প্রোডাক্ট প্রোটিন থেকে পাওয়া সম্ভব এর মধ্যে বিদ্যমান অ্যামিনো এসিডের তথ্য এবং অবশ্যই এদের বিন্যাসটিও। আর এ বিন্যাস থেকে জানা যায়, এদের তথ্য বহনকারী বার্তাবাহক আর এন এ-এর গঠন কি রকম সেটি। আর তা থেকে জানা সম্ভব জিনের গঠন এবং একে শনাক্ত করাও সম্ভব। ক্রোমোজোম ভ্রমণ (chromosome walking) পদ্ধতি বা উদ্ভিদে বিদ্যমান সঞ্চারণশীল বস্তুকে (mobile element) কাজে লাগিয়েও নির্দিষ্ট জিনটিকে শনাক্ত করা সম্ভব। নির্দিষ্ট জিন শনাক্ত হয়ে গেলে এর পরের কাজ হলো একে কর্তন করা। জিনকে কর্তন করে নেবার কাঁচি হলো ব্যাকটেরিয়া থেকে পাওয়া প্রাপ্ত নানা প্রকার এনজাইম। এসব এক একটি এনজাইম DNA- এর এক একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে চমৎকারভাবে কর্তন করে দিতে পারে বলে এদের বলা হয় রেসট্রিকশন এনজাইম।

যে কোনো জিন আলাদাকরণ পদ্ধতির প্রথম কাজটি হলো কাঙ্ক্ষিত জীবের অথবা এর অংশ বিশেষকে ভেঙে ফেলা। ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে জীবটিকেই এবং উন্নত জীবের ক্ষেত্রে এদের থেকে সংগৃহীত কলাকে ভেঙে নিউক্লিক এসিড অর্থাৎ DNA বা আর এন এ কে পেতে হয়। অনেকগুলো রাসায়নিক এবং প্রাণরাসায়নিক ধাপ পেড়িয়ে তবে পাওয়া যায় কাঙ্ক্ষিত নিউক্লিক এসিড বা এর অংশটিকে।

এনজাইম কর্তৃক কর্তিত একটি দুটি জিন বা DNA অংশ নিয়ে তা কোনো গাছের কোষে ঢুকিয়ে দিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সেজন্যই কাঙ্ক্ষিত জিন বা DNA অংশটির বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা একটি জরুরি ও আবশ্যিক ধাপ।

এর জন্য জিনটিকে কোনো একটি বাহকে প্রবিষ্ট করে দিতে হয় প্রথম। এরকম একটি চমৎকার বাহক বা ভেক্টর হলো ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে বিদ্যমান প্লাজমিড। প্লাজমিড বৃত্তাকার একটি DNA অণু। এর কতগুলো চমৎকার বৈশিষ্ট্যের জন্য এটি একটি উত্তম বাহক। এটি নিজে নিজে এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। অতএব এর মধ্যে বিদ্যমান থাকা কোনো জিন বা DNA - এর অংশটিও সংখ্যায় বাড়ে। এরকম একটি প্লাজমিডে কাঙ্ক্ষিত জিন ঢুকিয়ে দিয়ে তা কোনো উপযুক্ত পোষক যেমন - ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে প্লাজমিড তথা জিনটির সংখ্যা বাড়িয়ে নেয়া যায় সহজেই। অতঃপর জিনগুলোকে বাছাই করে নিয়ে যাওয়া যায় পরবর্তী ধাপে। আজকাল অবশ্য সহজেই এরকম জিন ক্লোনিংয়ের কাজটি সেরে নেয়া যায় একটি পিসিআর মেশিন আর কিছু এনজাইম ব্যবহার করে। পিসিআর মেশিনে অতি অল্প সময়ে জিনের সংখ্যা বহু গুণে বৃদ্ধি করা যায়।

জিন শনাক্ত করে, পৃথক করে ও কর্তন করার পর সংখ্যা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছার পর জিনটি যেন যথাযথ কাজ করতে পারে সেজন্য জিনের একটি নকশা এবং এর যথাযথ প্যাকেজিং করার প্রয়োজন হয়। জিনটিকে একটি নির্দিষ্ট ডি এন এ খণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে হয় যা জিনটিকে পোষকের জেনোমের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যাবার পর কিভাবে কাজ করবে তা নিয়ন্ত্রণ করবে। এরকম নিয়ন্ত্রণকারি DNA খণ্ডটিকে বলা হয় প্রোমোটার (promoter)। জিন নকশা করা এবং প্যাকেজিং করার অর্থই হলো জিনের বিদ্যমান প্রোমোটারকে একটি নির্দিষ্ট প্রোমোটার দিয়ে প্রতিস্থাপন করা এবং জিনটি সঠিক স্থানে পৌঁছাল কিনা তা জানবার জন্য এর সঙ্গে একটি নির্বাচনযোগ্য চিহ্নিতকরণ জিন (selectable marker gene) সংযোজন করে দেয়া। প্রোমোটার জিনের প্রকাশ এরকম ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে এর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সে জিনের ভিন্নতর প্রকাশ ঘটাতে পারে। কোনো প্রোমোটার সারা সময়ই সংযোজিত জিনটির প্রকাশ ঘটায়। কোনো কোনো প্রোমোটার আবার উদ্ভিদের বৃদ্ধির কোনো কোনো পর্যায়ে জিনটির প্রকাশ ঘটায়। কোনো কোনোটি আবার কেবল নির্দিষ্ট কোষ বা কলায় জিনটির প্রকাশ ঘটায়। কোনো কোনোটি বহিঃস্থ কোনো পরিবেশিক সংকেত দিলে তবেই তা কাজ করে। একটি জিন থেকে কত পরিমাণ উৎপাদ বা প্রোডাক্ট তৈরি হবে তাও নিয়ন্ত্রণ কিন্তু করছে প্রোমোটারই। এদের কোনোটি জিনের বাহিঃপ্রকাশ ঘটাতে দুর্বল আবার কোনো কোনোটি বেশ সবল।

নির্বাচনযোগ্য চিহ্নিতকরণ জিন বা জিনসমূহ কাঙ্ক্ষিত জিনের সঙ্গে জুড়ে দেবারও অনেকগুলো কারণ রয়েছে। উদ্ভিদের কোষের সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত জিনটি অম্বিষ্ট হয়ে গেল কি-না তা জানবার জন্য এর উপস্থিতি বেশ জরুরি। আজকাল সাধারণত এ কাজে এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী চিহ্নিতকরণ জিন ব্যবহার করা হয়। আবাদ মাধ্যমে এরকম এন্টিবায়োটিক সংযোজন করার পর যেসব কোষ বেঁচে যায় এদের মধ্যেই কাঙ্ক্ষিত জিনটি আছে বলে জানা যায়। ইদানিংকালে চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয় না– এরকম এন্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী জিন ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। প্রমোটার এবং এন্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী জিন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে প্রবিষ্ট করে দিয়ে এর সংখ্যা বৃদ্ধি করে নেয়া হয়।

জিন প্যাকেজিং শেষ হলে এটিকে পৌঁছে দেয়া হয় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অর্থাৎ তা পৌঁছে দেয়া হয় উদ্ভিদের কোষে। এর জন্য দুটি পথ রয়েছে। একটি হলো *Agrobacterium* নামক ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড বাহকে জিনটিকে প্রবিষ্ট করে দিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দেয়া। প্লাজমিডের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এটি উদ্ভিদের কোষের মধ্যে ঢুকে গেলে এর একটি DNA অংশ সহজেই সে বিনিময় করতে পারে কোষস্থ DNA- এর সঙ্গে। প্লাজমিডের একটি নির্দিষ্ট DNA অংশ বিনিময় করার এ কৌশলটি বিজ্ঞানীরা ঠিকই লক্ষ্য করেছেন এবং ঐ নির্দিষ্ট অংশটি কর্তন করে সেস্থলে কাঙ্ক্ষিত জিনটি প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়। অতঃপর কাঙ্ক্ষিত জিনসমৃদ্ধ প্লাজমিড ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে প্রবিষ্ট করে দিয়ে নির্দিষ্ট ফসলের প্রোটোপ্লাস্টের সঙ্গে সহ-আবাদ করলে একসময় প্লাজমিডটি জিনটিকে নিয়ে ঢুকে পড়ে প্রোটোপ্লাস্টের ভেতর। অতঃপর DNA অংশ বিনিময়ের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত জিনটি সংযুক্ত হয়ে যায় উদ্ভিদের DNA তে। আজকাল অবশ্য জিন বন্দুক ব্যবহার করে আরও সহজে কাঙ্ক্ষিত জিন পৌঁছে দেয়া যায় প্রোটোপ্লাস্টের DNA তে।

এভাবে উদ্ভিদের DNA- এর সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত জিনটি যদি সঠিক স্থানে সংযোজিত হয়ে যায় এবং যদি জিন প্রোডাক্ট সংশ্লেষণ হয়, তাহলে বলতে হবে যে উদ্ভিদটি রূপান্তরিত হয়েছে। সংযুক্ত জিনটি যদি স্থায়ী হয়, যদি তা বংশধরে সঞ্চারিত হতে পারে এবং তা যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়, তাহলে উদ্ভিদটিকে ট্রান্সজেনিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

শেষ ধাপে এসে ট্রান্সজেনিক ফসল তৈরির জন্য অতঃপর ব্যাকক্রস প্রজনন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদটিকে কোনো একটি উন্নত জাতের সঙ্গে প্রচলিত উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতিতে ক্রসিং সম্পন্ন করা হয়। এর ফলে উন্নত জাতের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য এবং ট্রান্সজেনিক জাতের বৈশিষ্ট্যগুলো একত্রে সন্নিবেশিত হয়। অতঃপর একটি উচ্চ ফলনশীল ট্রান্সজেনিক ফসল সৃষ্টির জন্য এদের সন্তানদেরকে বারবার উন্নত জাতটির সঙ্গে ব্যাকক্রস করানো হয়। ছয় থেকে পনের বছরের মধ্যে এভাবে সৃষ্ট ট্রান্সজেনিক ফসল বাণিজ্যিকভাবে অবমুক্ত করা যায়।

জিন প্রকৌশল পদ্ধতিতে বিজ্ঞানীরা নানা রকম বৈশিষ্ট্য সংযোজন করতে চায় ফসলে। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক বা এক জোড়া জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর তুলনামূলকভাবে সহজ। ফসলের আগাছানাশক প্রতিরোধী জাত সৃষ্টি, কীটপতঙ্গ প্রতিরোধিতা, রোগ প্রতিরোধিতা, পীড়ন-সহিষ্ণুতাসম্পন্ন ট্রান্সজেনিক ফসল সৃষ্টির পাশাপাশি ফসল কর্তন পরবর্তী মানউন্নয়ন, হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে পুংবন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি, ফসলের পুষ্টিমান বৃদ্ধি, ওষুধ শিল্পে এবং কলকারখানার প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপকরণ সৃষ্টির জন্য ফসল সৃষ্টি এ ধরনের অনেক লক্ষ্যই রয়েছে বিজ্ঞানীদের মাথায় (সারণি ৮.২)।

৩. আগাছানাশক প্রতিরোধী জিএম ফসল

আগাছা ফসলের একটি প্রধান শত্রু। ফসলের মাঠে আগাছা দমনের জন্য আগাছানাশক ব্যবহার করা হচ্ছে পৃথিবীর বহু দেশে। উন্নত দেশগুলোতে ফসলের মাঠে

আগাছানাশকের বহুল ব্যবহার হচ্ছে। আগাছানাশক ব্যবহারের একটি বড় সমস্যা হলো, সেটি কেবল আগাছা নয় বরং ফসলকেও বিনাশ করে। ফলে ফসলের মাঠে আগাছানাশক ব্যবহার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আগাছানাশক প্রতিরোধী ট্রান্সজেনিক ফসল তৈরি করে বিজ্ঞানীরা। ফসল যদি আগাছানাশক প্রতিরোধী হয় তাহলে ফসলের মাঠে সুনির্দিষ্টভাবে আগাছানাশক প্রয়োগ করে কেবল আগাছাকে নির্মূল করা সম্ভব হবে। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা নানা উৎস থেকে ফসলে আগাছানাশক প্রতিরোধী জিন সংযোজন করেছে। ফসলে আগাছানাশক প্রতিরোধিতা সৃষ্টি হয় দু'ভাবে। উদ্ভিদের কোষস্থ নির্দিষ্ট উপাদানের সঙ্গে আগাছানাশকের বিষাক্ত উপাদান সংযোজিত হওয়ার কারণে প্রাণরাসায়নিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হওয়ায় উদ্ভিদ মারা যায়। আগাছানাশক সুনির্দিষ্টভাবে ফসলের কোষস্থ উপাদানটির সঙ্গেই কেবল সংযুক্ত হয়। ফসলে সংযোজিত আগাছানাশক প্রতিরোধী জিনটি ফসলের কোষস্থ উপাদানটির রূপ পাল্টে দেয় বিধায় আগাছানাশক আর ফসলের কোষে বাঁধা পড়তে পারে না যার ফলে ফসল সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় থেকে যায়। আগাছানাশক প্রতিরোধী জিন কোনো কোনো ট্রান্সজেনিক ফসলে আবার কাজ করে ভিন্নতরভাবে। আগাছানাশক ফসলে স্প্রে করার পরে যখন তা ফসলের কোষের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যায় তখনই ফসলে জিনপ্রযুক্তির মাধ্যমে সংযোজিত জিনটি থেকে সৃষ্ট এনজাইম আগাছানাশকটিকে ভেঙে দেয় এবং এর বিষক্রিয়া নষ্ট করে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রে সয়াবিন, ভুট্টা ও তুলাতে আগাছানাশক প্রতিরোধী জাত ইতোমধ্যে বাজারজাত করেছে।

সারণি : ৮.২ বিজ্ঞানীবৃন্দ জিন প্রকৌশল পদ্ধতিতে ফসলে যেসব বৈশিষ্ট্য সংযোজন করতে আগ্রহী

বালাই এবং আগাছা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন আগাছানাশক সহিষ্ণুতা ভাইরাস প্রতিরোধিতা কীটপতঙ্গ প্রতিরোধিতা ছত্রাক প্রতিরোধিতা	উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতির উন্নয়ন পুংবন্ধ্যাত্ব এবং হাইব্রিড বীজ উৎপাদন
কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন শৈত্য সংবেদনশীলতার পরিবর্তন পানি পীড়ন-সহিষ্ণুতার উন্নয়ন লবণ সহিষ্ণুতার উন্নয়ন	পুষ্টিমান উন্নয়ন উচ্চ মেথিওনিন এবং উচ্চ লাইসিনসমৃদ্ধ বীজ
ফসল কর্তন পরবর্তী মান উন্নয়ন ফলের পরিপক্বতা বিলম্বিতকরণ পুষ্প নষ্ট হওয়া বিলম্বিতকরণ উচ্চ শর্করাসমৃদ্ধ গোলআলু মিষ্টতাসম্পন্ন সবজি	আণবিক ফার্মিং তেল শর্করা প্লাস্টিক এনজাইম

ফসলের গুণমান বৃদ্ধি ফসল উন্নয়নের বরাবরই একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। ধানে ভিটামিন 'এ' উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি তেমনি একটি গুণগত মান বৃদ্ধির উদ্যোগ ছিল। ভিটামিন 'এ' মানুষের অন্ধত্ব নিবারণ করে। ধানে এমনিতে ভিটামিন 'এ' তৈরি হয় না। তবে ভিটামিন 'এ'-এর আঁধার β-কেরোটিন তৈরি করার তিনধাপ পূর্বের রাসায়নিক যৌগটি ঠিকই তৈরি হয় ধানের সস্যে (endosperm)। ডেফোডিল থেকে দুটি জিন আর ব্যাকটেরিয়া থেকে একটি জিন মোট তিনটি জিন সংযোজনের ফলে এখন ধানে তৈরি হচ্ছে β-কেরোটিন। কেরোটিনের প্রভাবে সস্যের বর্ণ পাল্টে হয়ে যাচ্ছে সোনালি। সেজন্যই এজাতীয় জিএম ধানের নাম হচ্ছে সোনালি ধান। অনুমান করা হয়, এ ধানের ভাত খেলে শিশুদের ভিটামিন 'এ'- এর চাহিদা দূর হবে এবং রাতকানা রোগের সম্ভাবনা দূর হয়ে যাবে।

৭. জিএম ফুল উৎপাদন

কেবল ফল নয়, ঝরে পড়া স্বভাব ঠেকিয়ে ফুলের জীবনকালও প্রলম্বিত করা হয়েছে জিনপ্রযুক্তি ব্যবহার করে। ফুলের বুড়িয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী কিন্তু ইথিলিনই। ACC অক্সিডেজ এনজাইমকে অবদমন করার জন্য ফুলের কোষে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে এমন একটি জিন যা এমন একটি RNA তৈরি করে যা কিনা ACC অক্সিডেজ তৈরি করার জন্য যে RNA তৈরি হয় তার ঠিক সম্পূরক বিধায় দুরকমের RNA মিলে বিক্রিয়াটিকে আর এগুতে দেয় না। ফলে ইথিলিন তৈরি হয় না বলে ফুল আরও কিছু বেশিদিন তাজা থাকে।

তিন ধরনের রঞ্জক পদার্থের কারণে ফুলের এত বাহারি বর্ণ। এ তিনটি রঞ্জক হলো ফ্লেভোনয়েড, কেরোটিনয়েড এবং বিটালেইন। এন্থোসায়েনিনের কারণে ফুলে সৃষ্টি হয় গোলাপি, লাল, বেগুনি, কমলা এবং নীল আর হলুদ হলো কেরোটিনয়েডের জন্য। এন্থোসায়েনিন সৃষ্টির গতিপথ আর বিক্রিয়াসমূহ আজ বিজ্ঞানীদের জানা। বিক্রিয়ার নানাস্থানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে পাওয়া সম্ভব নানা বর্ণের ফুল। এন্থোসায়েনিন উৎপাদন বন্ধ করা গেলে পাওয়া সম্ভব সম্পূর্ণ সাদা ফুল। এর জন্য প্রয়োজন এন্থোসায়েনিন উৎপাদনের যে কোনো একটি বিক্রিয়া বন্ধ করা। অর্থাৎ যে কোনো একটি এনজাইম তৈরি হতে না দেয়া।

ফুলের বর্ণের রহস্য উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল প্রয়োগের ফলে ফুলের বর্ণে যুগান্তকারী সব পরিবর্তন অত্যাসন্ন হয়ে পড়েছে। ফুলের বর্ণ গাঢ় বা হালকা করা, ভিন্ন রকম বর্ণের ফুল সৃষ্টি ইত্যাদি ফুল শিল্পে আগামী দশকে নতুন মাত্রা নিয়ে আসবে বলে মনে হয়। তাছাড়া কোনো কোনো ফুলের ক্ষেত্রে বিরল বর্ণ নিয়ে আসার সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়েছে। নীল রঙের গোলাপ অনেকেরই কাম্য। অধিকাংশ ফুলেই নীল বর্ণের উপস্থিতি কম। ফুলের গন্ধেও পরিবর্তন নিয়ে আসবার লক্ষ্যে কাজ চলছে। কাজ চলছে এমনকি ফুলের পাপড়ির দৈর্ঘ্য প্রস্থ হ্রাস বৃদ্ধি করে ফেলার কাজও।

৮. জিএম ফসলের বাণিজ্যিক আবাদ

গত শতাব্দির শেষের দিকে ফসলের মাঠে ঠাঁই করে নিতে শুরু করে জিএম ফসল। ১৯৯৯ সালে লক্ষ্য করা যায় যে পৃথিবীর বারোটি দেশে জিএম ফসলের আবাদ শুরু হয়। আবাদকৃত জমির পরিমাণ ৩৯.৯ মিলিয়ন হেক্টর। এ বারোটি দেশ হলো - যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, কানাডা, চীন, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো, স্পেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল, রুমানিয়া ও ইউক্রেন। এই দেশগুলোর মধ্যে কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই জিএম ফসলের আবাদ হয় সেসময় ২৮.৭২ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে অর্থাৎ মোট জিএম ফসল আবাদের শতকরা ৭২ ভাগই আবাদ হচ্ছিল যুক্তরাষ্ট্রে। আর শতকরা ১৭ ভাগ আর্জেন্টিনাতে ও ৪ ভাগ কানাডায়। অন্যান্য দেশে শতকরা ১ ভাগেরও কম জমিতে আবাদ হচ্ছিল জিএম ফসল।

গত শতাব্দির শেষের দিকে কোন কোন জিএম ফসলের মূলত আবাদ হচ্ছিল তার পরিসংখ্যান দেখলে মোট ৭টি ফসলের নাম পাওয়া যায়। সয়াবিন, ভুট্টা, তুলা, কেনোলা বা রেপ সিড, গোলআলু, স্কোয়াশ এবং পেঁপে। সয়াবিনের আবাদ হচ্ছিল ২১.৬ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে। ভুট্টা, তুলা এবং কেনোলার আবাদ হচ্ছিল যথাক্রমে ১১.১, ৩.৭ ও ৩.৪ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে। অন্য তিনটি ফসলের আবাদ হচ্ছিল ১ মিলিয়ন হেক্টরেরও কম জমিতে। এ পরিসংখ্যান বলে দেয় যে, সয়াবিনই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় জিএম ফসল। মোট জিএম আবাদি জমির শতকরা ৫৪ ভাগই দখল করে রেখেছিল জিএম সয়াবিন।

জিনপ্রযুক্তি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং একটি অতি উচ্চমানের আণবিক জীববিদ্যাভিত্তিক কৌশল। এর জন্য প্রয়োজন একটি আধুনিক ল্যাবরেটরি, বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকা দক্ষ জনশক্তি, সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থের যোগান এবং আবদ্ধ অবস্থায় এবং মাঠ পর্যায়ে নির্দিষ্ট স্থানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, ভৌত সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বায়োটেকনোলজি ল্যাবরেটরিতে ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজী ল্যাবরেটরিতে ফসল রূপান্তরণের গবেষণা চলছে বৈদিশিক অর্থানুকূল্যে পরিচালিত প্রকল্পের আওতায়। তবে এ যাবৎ বাংলাদেশের কোনো ল্যাবে কোনো ফসলের উদ্ভিদে রূপান্তরণ সম্ভব হয়েছে এবং তা মাঠ পর্যায়ে নেয়া গেছে এমন কোনো গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়নি।

কবে বিজ্ঞানীরা আমাদের দেশে জিএম ফসল বা ট্রান্সজেনিক ফসল তৈরি করতে পারবেন তা সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে ইতোমধ্যে যেসব জিএম ফসল তৈরি করা হয়েছে উন্নত বিশ্বে এই শতাব্দির প্রথম দশকেই এসব জিএম ফসল নিয়ে আমাদের দেশে যে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে তার লক্ষণ ইতোমধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জিনপ্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট জিএম ফসল যদি জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ বান্ধব হয়, তবে তা অবশ্যই আমাদের মাঠেও ফলবে এমনটি প্রত্যাশা করা যায়।

নবম অধ্যায়

ফসল উন্নয়ন ও মেধাস্বত্ত্ব

গত শতাব্দির পূর্বে ফসল উন্নয়নের উপযুক্ত জাত নির্ধারণের কাজটি মূলত কৃষকেরাই করেছেন। নিজেদের পছন্দ, প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী তারা নিজেরাই এক একটি ফসলের জাত বাছাই করে নিতেন। গত শতাব্দিতে বিজ্ঞানভিত্তিক ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হলে উন্নত জাত সহজলভ্য হওয়ায় জাত সৃষ্টির কর্মকাণ্ডে কৃষকের অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। মেন্ডেলের বংশগতির সূত্রদ্বয়ের পুনরাবিষ্কার ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নতুন মাত্রা যোগ করে। পৃথিবীর দেশে দেশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ফসলের জাত সৃষ্টিসহ নতুন নতুন ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কাজ শুরু হয়। কৃষকদের নতুন জাতের চাহিদা পূরণ তথা দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যটাই তখন ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোতে ব্যক্তি উদ্যোগে বিজ্ঞানভিত্তিক ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হয়। উচ্চ ফলনশীল বা উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন ফসলের জাতের ব্যাপক চাহিদার বিষয়টি বুঝতে পেরেই ব্যক্তি উদ্যোগে নতুন জাত সৃষ্টির কর্মকাণ্ড শুরু হয়। নতুন নতুন উন্নত জাত সৃষ্টি করে মুনাফা অর্জন অর্থাৎ লাভজনক ব্যবসা শুরু করা যায় মনে করেই উন্নত দেশগুলোতে প্রাইভেট সেক্টরে ফসল উন্নয়নের কাজ ব্যাপকভাবে শুরু হয়। এ কাজে তারা উচ্চ বেতনে নিয়োগ দেন অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের। ফলে উদ্ভাবন করা সম্ভব হয় কাঙ্ক্ষিত সব ফসলের জাত।

প্রাইভেট কোম্পানিগুলো দিনে দিনে ফসলের জাত সৃষ্টিতে বেশ এগিয়ে যায়। এমনকি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরাও পিছিয়ে পড়ে যায় প্রাইভেট কোম্পানির বিজ্ঞানীদের সাফল্যের কাছে। প্রাইভেট কোম্পানির এ খাতে অধিকতর বিনিয়োগ এবং এদের মেধা, মনন ও পরিশ্রমই এ সাফল্যের মূল কারণ। উন্নত বিশ্বের অনেক দেশের সরকার প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকে এ কাজে সহযোগিতা করতে শুরু করে। কারণ ততোদিনে এদের উদ্ভাবিত জাত দেশের উৎপাদনে সরাসরি ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে। ফলে সরকারও তাদের পৃষ্টপোষকতা করা যুক্তিযুক্ত মনে করে। ইতোমধ্যে ফসলের জাত সৃষ্টি এবং এর বাজারজাতকরণ একটি প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড হয়ে দাঁড়ায়।

এরকম একটি প্রেক্ষাপটে উন্নত বিশ্বের প্রাইভেট কোম্পানিগুলো ফসলের জাতের উপর তাদের মেধাসত্ত্ব দাবী করলো। অনেক শ্রম, অর্থ, মেধা ও মনন দিয়ে সৃষ্টি করা এক একটি জাত যেন একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে কেবল নির্দিষ্ট কোম্পানি বাজারজাত করে মুনাফা অর্জন করতে পারে সে কারণেই উঠে এলো এ দাবিটি। পশ্চিমা দেশগুলো ধীরে ধীরে এ দাবির যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে সক্ষম হলো। প্রাইভেট সেক্টরে ফসলের জাত সৃষ্টি এবং বীজ উৎপাদন ও বিপনণকে উৎসাহিত করার জন্য মেধাসত্ত্ব প্রদান করা জরুরি হয়ে পড়ল।

১. কৃষিতে মেধাস্বত্ব

বিংশ শতাব্দির প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যে কোনো কোনো দেশে উদ্ভিদ পেটেন্টিং কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। ১৯৩০ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্ল্যান্ট পেটেন্ট অ্যাক্ট (Plant Patent Act)-এর মাধ্যমে অঙ্গজ উপায়ে বংশবিস্তারক্ষম ফসলের জাত পেটেন্টিং করার কাজ শুরু করে। ১৯৩৮ সালে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর প্ল্যান্ট ভেরাইটি প্রটেকশন (ASSINEL) নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যার কাজ হলো বিভিন্ন দেশের সরকারগুলোকে ফসলের জাত রক্ষায় মেধাসত্ত্ব আইন প্রণয়নের জন্য উৎসাহিত করা। ইউরোপের অনেক দেশে এর ফলে নিজস্ব প্ল্যান্ট ব্রিডারস রাইটস (PBR) নামক আইন প্রণীত হয়।

কলকারখানায় উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের মেধাসত্ত্ব শুরু হয়েছে অনেক পূর্বে। এদের মেধাসত্ত্ব আইনও হয়েছে অনেক পূর্বেই। বিশ্বব্যাপী পেটেন্ট আইনের নানা বিষয়গুলো দেখাশুনা করবার একটি প্রতিষ্ঠান হলো ওর্য়াল্ড ইনট্যাল্যাকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন (WIPO)। এদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইউরোপের উদ্ভিদ প্রজননবিদ তথা প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে ফসলের জাতগুলোর মেধাসত্ত্ব রক্ষার উত্তম ও কার্যকর উপায় উদ্ভাবন করার জন্য একটি ইউনিয়ন গড়ে তুলে যাকে UPOV (Union Internationale Pour la Protection des Obstentions Vegetales, International Union for Protection of New Plant Varieties) নামে অভিহিত করা হয়।

প্যারিসে ১৯৬১ সালে সংগঠিত UPOV- এর কনভেনশন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে ফসলের জাতের উপর স্ব স্ব সদস্য রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ অধিকার পাবার সুযোগ এনে দেয়। ১৯৬১ সালের কনভেনশন ১৯৬৮ সালে কার্যকর হয়। বর্তমানে UPOV এর সদস্য ৩১ টি দেশ। আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, কলম্বিয়া, চেকপ্রজাতন্ত্র, চিলি, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, হাঙ্গেরি, আয়ারল্যান্ড, ইসরায়েল, ইটালি, জাপান, নেদারল্যান্ডস, নিউজিলেন্ড, নরওয়ে, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, স্লোভাকিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং উরুগুয়ে। দিন দিন অনেক দেশ এ ইউনিয়নে যোগ দিচ্ছে।

UPOV প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কাজ দুটি। একটি হলো– সদস্য দেশগুলোতে উদ্ভিদ প্রজননবিদদের অবশ্যই প্রদেয় ন্যূনতম অধিকার অর্জন করার আয়োজন করা এবং দ্বিতীয় হলো ফসলের উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাতের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে একটি প্রমিত মান নির্ধারণ করা। UPOV এর দেশগুলো সদস্য দেশের প্রজননবিদদের উদ্ভাবিত জাতগুলোর প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে নিজ দেশে উদ্ভাবিত জাতগুলোর একই রকম প্রতিরক্ষা প্রদান করে। যে কোনো দেশ নির্দিষ্ট মানসম্পন্ন উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন প্রনয়ণ করে থাকলে UPOV এর সদস্য হতে পারে এবং সদস্য দেশসমূহের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা থেকে সুফল পেতে পারে।

১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত UPOV কনভেনশনের উদ্দেশ্যসমূহ ১৯৭২, ১৯৭৮ এবং ১৯৯১ সালে নতুনভাবে পুনঃসংস্করণ করা হয়েছে। ১৯৭৮ সালের UPOV আইনে

কেবল জাতীয়ভাবে সংজ্ঞায়িত উদ্ভিদ প্রজাতির জাতসমূহের প্রতিরক্ষা প্রদান করা হতো। '৯১ সালের আইনে সকল উদ্ভিদ গণ ও প্রজাতির জাত এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। '৭৮ এর আইনে একটি জাত প্রতিরক্ষার পূর্ব শর্ত ছিল স্বাতন্ত্র্য (distinctness), সমরূপতা (uniformity) এবং স্থায়িত্ব (stability)। '৯১ সালে এসে তা দাঁড়িয়েছে নতুনত্ব (novelty), স্বাতন্ত্র্য, সমরূপতা এবং স্থায়িত্ব। জাতের প্রতিরক্ষা ছিল '৭৮ এ ন্যূনতম ১৫ বছর অথচ '৯১ তে তা হয় ন্যূনতম ২০ বছর। '৭৮ এর আইন অনুযায়ী প্রজননবিদরা অবাধে ব্যবহার করতে পারতো উদ্ভাবিত জাত কিন্তু '৯১ এর আইন অনুযায়ী প্রজননবিদ জাতটি তার প্রজনন কর্মসূচিতে ব্যবহার করতে পারলেও তা থেকে সৃষ্ট নতুন জাতটির মেধাসত্ব থেকে যাচ্ছে আগের প্রজননবিদেরই। '৭৮ এর আইন অনুসারে কৃষক এসব জাতের বীজ নিজে সংরক্ষণ করতে পারতো অবাধে। একানব্বইয়ের আইনে এটি ছেড়ে দেয়া হয়েছে জাতীয় আইনের উপর।

২. ট্রিপস চুক্তি

ধনী দেশগুলোর সহায়তায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা মেধাসত্বের বিষয়ে বিশ্বের অধিকাংশ দেশকে অন্তর্ভুক্ত করার আয়োজনটি সম্পন্ন করে । বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসেবে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ট্রিপস (TRIPS) চুক্তি স্বাক্ষরের পর মেধাসত্বে আইন প্রণয়নের বিষয়ে একমত হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য সকল দেশ চুক্তির স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসেবে এখন মেধাসত্ব সর্ম্পকে আইন করতে বাধ্য। বাংলাদেশও স্বাক্ষরদাতা দেশের একটি। অতএব বাংলাদেশের জন্য নিজস্ব একটি মেধাসত্ব আইন তৈরি করা একান্ত আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ট্রিপস চুক্তি একটি বহুপাক্ষিক মেধাসত্ব সম্পর্কিত চুক্তি। এ চুক্তির কার্যকারিতা শুরু হয় ১৯৯৫ সালের ১লা জানুয়ারিতে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে মেধাসত্ব আইন প্রণয়নের শেষ সময় সীমা প্রদান করা হয়েছে ২০০৬ এর ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত। অন্তবর্তীকালীন সময় হিসেবে প্রদান করা হয়েছে এই এগার বছর। উদ্ভিদ জাত রক্ষা আইন প্রণয়ন না করে কোনো উপায় নেই আমাদের। এ লক্ষ্যে কিছু অগ্রগতিও হয়েছে। 'উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন' নামে একটি খসড়া আইন তৈরি করা হয়েছে। এ খসড়াটি মূলত দাঁড় করানো হয়েছে UPOV ১৯৯১ এর আলোকে। অনেকে মনে করেন UPOV এর সদস্য হবার লক্ষ্যে '৯১ এর আইন অনুসরণ করা হয়েছে নয় তো কোনো দ্বিপাক্ষিক চাপের কারণে এটি করা হয়েছে। কারণ যা-ই হোক না কেন এজাতীয় আইন প্রণয়নের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন দেশপোযোগী হয়। দেশে বিদ্যমান বীজ ব্যবস্থাপনা তথা কৃষি উৎপাদনে এ আইন যেন বিরূপ প্রভাব না ফেলতে পারে। ট্রিপস চুক্তি অনুযায়ী ন্যূনতম ব্যবস্থা সম্বলিত একটি মেধাসত্ব আইন আমাদের জন্য অধিক ফলপ্রসূ হবে। দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন চুক্তির নামে ন্যূনতম ব্যবস্থার পরিবর্তে উচ্চ মানসম্পন্ন কোনো আইন প্রণয়ণ আমাদের জন্য বুমেরাং হবে বলে অনুমান করা চলে। এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে গেলে যেসব বিষয়গুলো মনে রাখা একান্ত আবশ্যক হবে সেগুলো আমাদের অবশ্যই চিহ্নিত করে নিতে হবে।

ফসলের জাতের জন্য মেধা সম্পদ সত্ত্ব আইন প্রণয়নের সময় প্রজননবিদ ও কৃষকের জন্য কিছু বিশেষ অধিকার সংরক্ষণ করা আবশ্যক হবে। আইন কর্তৃক রক্ষিত জাতটির সত্ত্ব যেন একটি ন্যূনতম সময়ের জন্য বলবৎ থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রজননবিদকে রক্ষিত জাতটি ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অবাধে ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করতে হবে এবং নতুন সৃষ্ট জাতটির সত্ত্ব যেন প্রজনবিদ বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পায় সে বিধান তো থাকবেই। লক্ষ্য রাখতে হবে কৃষক তার পরবর্তী ফসল ফলানোর জন্য যে কোনো পরিমাণ বীজ সংরক্ষণ নিজে করার অধিকার যেন পায়। এ বিষয়গুলো বিজ্ঞানীরা মাথায় না নিলে তা আমাদের ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করবে এবং কৃষকের চিরায়ত বীজ সংরক্ষণ অধিকার ক্ষুণ্ন হলে ফসলের উৎপাদনে এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

৩. জিনপ্রযুক্তি ও মেধাসত্ত্ব

গত কয়েক দশকে জীবপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। ফসল বা পশু উন্নয়নের জন্য এখন জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। যে কোনো জীব উৎস থেকে কাঙ্ক্ষিত জিন শনাক্ত করে তা নির্দিষ্ট এনজাইম দিয়ে কর্তন করে নেয়া, এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তা সরাসরি তা কোনো বাহকের মাধমে ফসলে সংযোজন করে দিয়ে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাত তৈরি করা এখন আর কোনো কল্পনা নয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে সৃষ্ট এসব জিএম ফসল বা ট্রান্সজেনিক ফসল এখন বাণিজ্যিকভাবে আবাদ করা হচ্ছে বেশ কিছু উন্নত দেশে। দিনে দিনে এসব ফসল আরও অনেক দেশে আবাদ করা হবে। কোনো কোনো ট্রান্সজেনিক ফসলের সাফল্য এসব ফসলের প্রতি কৃষকের আগ্রহ ক্রমশ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

জিএম বা ট্রান্সজেনিক ফসল তৈরি করাবার জন্য প্রচুর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে উন্নত দেশের প্রাইভেট বীজ কোম্পানিগুলো। প্রচুর সময়, মেধা আর অর্থ ব্যয় করছে এসব কোম্পানি মূলত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। ফসল বা মাছ বা পশু হোক, সব ক্ষেত্রেই এখন ব্যবহৃত হচ্ছে জিনপ্রযুক্তি। নতুন নতুন জিন সংশ্লেষণ করা হচ্ছে। উদ্ভিদ জগতের ভেতর থেকেতো বটেই, এর বাইরের বিশাল জীবজগতের যে কোনো জীব থেকে কাঙ্ক্ষিত জিন খুঁজে বের করে নেবার কাজও চালিয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞানীরা। এসব কষ্টলব্ধ আবিষ্কারের সুফল যেন উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠান বা উদ্ভাবক বিজ্ঞানী ভোগ করতে পারে সেজন্যই তাদের উদ্ভাবন রক্ষার জন্য রয়েছে মেধাসত্ত্ব অধিকার। জীবপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এধরনের অধিকার রক্ষার জন্য রয়েছে পেটেন্ট আইন। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিল্প বাণিজ্যে পেটেন্ট অতি সুপরিচিত মেধাসত্ত্ব সংরক্ষণ ব্যবস্থা। কৃষির ক্ষেত্রে এ আইনটির প্রয়োগ শুরু হয়েছে ১৯৮০ সাল থেকে।

কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত জিন এখন প্রায় সকল উন্নত দেশগুলোতে পেটেন্ট করা হচ্ছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত জিনও এখন পেটেন্ট করা হচ্ছে। ফলে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বিজ্ঞানী এসব জিন ব্যবহার করতে হলে পেটেন্টধারী ব্যক্তি বা বিজ্ঞানীকে রয়ালটি দিতে হবে। কৃষিতে বিশেষ করে ফসলের ক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে নানারকম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ফসল তৈরি করা হয়েছে।

এসব ট্রান্সজেনিক ফসলের মধ্যে রয়েছে কীটপতঙ্গ-প্রতিরোধী ফসল, ভাইরাস প্রতিরোধী ফসল, ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক-প্রতিরোধী ফসল, আগাছানাশক-প্রতিরোধী ফসল ইত্যাদি। ইতোমধ্যে বেশ কিছু ফসলের গুণগতমানও উন্নত করা সম্ভব হয়েছে। টমেটোর বিলম্বিত পরিপক্বতা স্বভাব, দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ ক্ষমতা, ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ধান ইত্যাদি এখন বাণিজ্যিকভাবে আবাদ করার চিন্তা করা হচ্ছে। ট্রান্সজেনিক ফসল উৎপাদনকারী প্রাইভেট কোম্পানিগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এসব ফসল নিয়ে ব্যবসা করতে আগ্রহী। কিন্তু সকল দেশে এখনও পেটেন্ট আইন প্রণীত না হওয়ায় কোম্পানিগুলো তাদের উৎপাদিত ফসল নিয়ে অনেক দেশেই বাণিজ্যে লিপ্ত হতে পারছে না। অন্যদিকে পেটেন্ট আইনের অভাবে এসব ফসলের সুবিধাও ভোগ করতে পারছে না অনেক দেশ।

৪. বাংলাদেশের কৃষিতে মেধাসত্ত্ব

আমাদের দেশেও বর্তমানে জীবপ্রযুক্তিগত গবেষণা শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ফসল, মাছ আর পশু উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এসব গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। এসব গবেষণার স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কাঙ্ক্ষিত জিন আমাদের ফসলে সংযোজন করার জন্য পেটেন্ট করা জিন বাইরে থেকে নিয়ে আসা আবশ্যক হয়ে পড়ছে। গবেষণার স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠান এসব জিন নিয়ে গবেষণা করার অনুমতি দিচ্ছে বটে। তবে এসব জিন সংযোজন করে কোনো ট্রান্সজেনিক ফসল তৈরি করতে সক্ষম হলে তার মালিকানাটা থাকবে জিন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের। কৃষির ক্ষেত্রে আমাদের পেটেন্ট আইন না থাকায় অনেক উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠানের পেটেন্ট করা জিন পাওয়াও আমাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ছে। জিন পাবার ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু সম্পূর্ণতই পরনির্ভরশীল সেহেতু এক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে যেতে হলে আমাদেরও পেটেন্ট আইন প্রণয়ন করা জরুরি।

বাংলাদেশেও একটি পেটেন্ট আইন রয়েছে। তবে কৃষির ক্ষেত্রে কিভাবে এর প্রয়োগ করা যায় সেরকম কোনো ধারা এতে নেই। তাছাড়া এতদিন এর খুব একটা প্রয়োজনও পড়েনি। আমাদের দেশে বিদ্যমান পেটেন্ট আইনটির ছোটখাটো সংশোধন করে নিলে আমাদের পক্ষে কাজ চালিয়ে নেয়া সম্ভবপর হবে। অবশ্য TRIPS চুক্তির স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসেবে পেটেন্ট আইনকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর নেই।

উদ্ভিদ জাত রক্ষা আইন এবং পেটেন্ট আইন ছাড়াও কৃষির ক্ষেত্রে বিভিন্ন আবিষ্কার থেকে মুনাফা পাবার লক্ষ্যে আরও কিছু মেধাসত্ত্ব আইন এখন প্রণীত হচ্ছে পৃথিবীর নানা দেশে। তার একটি হলো ট্রেড সিক্রেট (trade secret)। কৃষির অনেক উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ রয়েছে। জীবপ্রযুক্তি নির্ভর পণ্য বা উৎপাদ (product) তৈরির জন্য যেসব জীবজ পদ্ধতি জড়িত সেসব গোপন রাখার মাধ্যমে বাণিজ্যিক সুবিধা পাওয়া এর উদ্দেশ্য। কৃষির ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফসলের হাইব্রিড জাত সৃষ্টির গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মেধাসত্ত্ব অধিকার। ফসলে হাইব্রিড জাত এখন পৃথিবী জুড়েই খুব জনপ্রিয়। সবজি এবং ফল ছাড়াও দানা শস্যের ক্ষেত্রে

হাইব্রিড জাত অত্যন্ত সফল। পৃথিবীর বহু দেশে ভুট্টার হাইব্রিড জাত এখন ভুট্টা চাষের সিংহভাগ জমি দখল করে ফেলেছে। ধানের হাইব্রিড জাতের আবাদও দিন দিন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে বিভিন্ন দেশে। সরগাম ও বাজরা ফসলেও হাইব্রিড জাত আবাদ করা হচ্ছে। প্রতি বছর হাইব্রিড জাতের বীজ সৃষ্টি করার জন্য যেসব পেরেন্টাল লাইন ব্যবহার করতে হয় এদের গোপনীয়তা রক্ষা করে চলেছে উদ্ভাবক কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান ট্রেড সিক্রেটের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে।

আজকাল অনেক প্রজননবিদ হাইব্রিড বীজকে স্ব-পরাগায়ন করে হাইব্রিড বীজ উৎপাদনে যেসব প্রজনক (parent) ব্যবহার করা হয় তাদের খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রেই এদের প্রজনকের গোপনীয়তা এর মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়। এটি বন্ধ করবার জন্যই বিজ্ঞানীরা 'আত্মঘাতী জিন' হাইব্রিড জাতে সংযোজন করে দিতে চেয়েছিল। একে টারমিনেটর (terminator) প্রযুক্তি বলে অভিহিত করা হয়। বিশ্বব্যাপী এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠায় এদিকে আর এগুতে পারেনি বিজ্ঞানীরা। সেজন্য তারা দাবি তুলেছে তাদের হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত প্রজনকের সত্ত্ব রক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন প্রনয়ণের। পেরেন্ট লাইনের পেটেন্ট করে তারা এখন এর সত্ত্ব রক্ষা করছে। অন্যদিকে কোনো কোনো দেশে পেরেন্ট লাইনের গোপনীয়তা রক্ষা করেও ব্যবসার গোপনীয়তা (trade secrecy) রক্ষা করতে পারছে।

আমাদের দেশে কৃষির ক্ষেত্রে মেধাসত্ত্বের বিষয়টি এখনও শুরুই হয়নি। সেদিক থেকে আমাদের সনাতন কৃষি ব্যবস্থাপনায় এসব বিভিন্ন প্রকার মেধাসত্ত্ব আইন কি রকম প্রভাব ফেলবে তা এ মুহূর্তে নিশ্চিত করে কিছু বলা বেশ মুশকিল। যত ধীরেই হোক না কেন সামনের দিনগুলোতে এদেশে ট্রান্সজেনিক ফসলের আবাদও শুরু হয়ে যাবে। আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশ হিসেবে এদেশে মেধাসত্ত্ব আইন প্রণয়ন এবং এসব আইনের প্রয়োগ যথাযথভাবে হোক তাও এ সংস্থাটি চাইবে। ফলে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এসব অধিকার রক্ষা করার জন্য আমাদের আইন প্রনয়ণ করতেই হবে। বাংলাদেশও এর কোনো কোনো আইন বিশেষ করে উদ্ভিদ জাত রক্ষা আইন প্রণয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কৃষি ও কৃষক এ দুটি বিষয়কে প্রধান্য দিয়ে কৃষির ক্ষেত্রে মেধাসত্ত্ব আইন প্রণীত হওয়া অবশ্য কাম্য। কোনো আরোপিত শর্তে নয় বরং নিজস্ব দেশ ও জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে এবং কৃষির উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আরও বেগবান হবে এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আইনগুলো প্রণয়ন করতে হবে।

দশম অধ্যায়

ফসল উন্নয়নের ক্ষতিকর প্রভাব

ফসল চাষাবাদের শুরু থেকেই মানুষের খাদ্যসমূহের উৎসের বৈচিত্র্য হ্রাস পেতে শুরু করে। বিভিন্ন উৎস থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে অভ্যস্ত মানুষ ধীরে ধীরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তার অল্প ক'টি আবাদি ফসলের উপর। মানুষের প্রথম দিককার ফসলের সংখ্যা অনেক হলেও প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় গাছগাছালি থেকে সংগ্রহ করা খাদ্যের বৈচিত্র্যের তুলনায় তা ছিল তাৎপর্যপূর্ণভাবেই অনেক কম। সুতরাং বৈচিত্র্য হ্রাসের শুরুটি কিন্তু কৃষির শুরু থেকেই আমাদের সঙ্গে অবিষ্ট হয়ে আছে। হাজারো প্রজাতির গাছপালা যেখানে মানুষের খাদ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতো সেখানে ধীরে ধীরে মানুষ অল্প কিছু সংখ্যক প্রজাতির উপর খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল হয়ে পড়লো।

১. উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা হ্রাস

উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাওয়ায় মানুষ অল্প সংখ্যক ফসল প্রজাতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। গত শতাব্দিতে এসে এটি সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা ধারণ করেছে। একটি ছোট্ট পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে পুষ্পক উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমী অব সাইন্সের হিসাব অনুযায়ী মানুষ এ পর্যন্ত নানা কাজে ব্যবহার করেছে প্রায় ৩০০০ উদ্ভিদ প্রজাতি। আর বাণিজ্যিকভাবে এর থেকে মানুষ এ যাবৎ আবাদ করেছে মাত্র প্রায় ১৫০ উদ্ভিদ প্রজাতি। আর হাল আমলে এসে সারা পৃথিবীর মানুষ তাদের সিংহভাগ খাদ্যের জন্য নির্ভর করছে মাত্র ২০টি ভিন্নরকম ফসল প্রজাতির উপর। মানুষের নির্ভরতার সে ফসলগুলো হলো-ধান,গম, ভুট্টা, গোলআলু, সরগাম,বার্লি, আখ, সুগারবিট, মিষ্টি আলু, কাসাবা, শিম, সয়াবিন, চীনা বাদাম, নারিকেল, কলা, যই, টমেটো, কাউন, রাই এবং শিম্বি ফসল।

যেসব ফসল প্রজাতির আবাদ অধিকতর সফল হয়েছে মানুষ সেগুলোর উপর অধিকতর গুরুত্ব ও মনোযোগ দিয়েছে। ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এদের নানা বৈশিষ্ট্যের রূপান্তর ঘটিয়েছে, কোনো কোনো ফসলকে অর্থনৈতিকভাবে অধিকতর লাভজনক করে তুলেছে। ফলে মানুষ তুলনামূলকভাবে অলাভজনক ফসলকে কম গুরুত্ব দিচ্ছে এবং এদের আবাদ উল্লেখযোগ্য রকমভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে আবাদি ফসলের প্রজাতিও হ্রাস পাচ্ছে। অল্প ক'টি প্রজাতির উপর বাড়ছে আমাদের নির্ভরতা।

গত একশত বছরে সারা পৃথিবী জুড়েই ফসল উন্নয়নের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ফসল উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত ছিল বলে গত একশর বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও মানুষ খাদ্যের অভাবে মারা যায়নি। বিশ্বের খাদ্যে চাহিদা পূরণে এ ধারাটি অব্যাহত না রাখার কোনো বিকল্প ছিল না। এমনকি আগামী দিনের

চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া ছাড়াও কোনো বিকল্প নেই। এ বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এটিও মানতে হবে যে, ফসল উন্নয়নের ফলে আবশ্যিকভাবে কিছু ক্ষতিও হয়েছে। বিশেষ করে যেসব দেশ ফসলের বৈচিত্র্যে এবং ফসলের জাতের সংখ্যার দিক থেকে খুব সমৃদ্ধ ছিল সেসব দেশের কৃষির একটি বড় ক্ষতিও সাধিত হয়েছে। বড় প্রাপ্তির আশায় কিছু ক্ষতিও মেনে নিতে হয়েছে। ফসলের বৈচিত্র্য বিনাশের এ দিকটি হলো ফসল উন্নয়নের আরেক দিক। একে ছোট করে দেখবার কোনো উপায় নেই। আবার অধিকতর বড় করে ফেলারও প্রয়োজন নেই।

পৃথিবীর যেসব দেশে যেসব ফসলের উৎপত্তি ঘটেছে সেসব দেশে সেই ফসলের ব্যাপক বৈচিত্র্য রয়েছে। অন্তত এতদিন তাই ছিল। আবার যেসব অঞ্চলে কোনো একটি ফসল অনেক দিন ধরে আবাদের আওতায় রয়েছে সেখানেও একটি ফসলের বিভিন্ন রকম জাত সৃষ্টি হয়েছে। মূলত কৃষকগণ তাদের দীর্ঘ ফসল আবাদিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ফসলের নানা জাত তার প্রয়োজনের নিরিখে বাছাই করে নিয়েছে। যেসব ফসলের জাত অধিক ফলন দিত কিংবা অধিক গুণগত মানসম্পন্ন ছিল এদের প্রতি কৃষকের একটি বিশেষ পক্ষপাত থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। সে কারণে প্রতিটি এলাকাতেই কোনো এক বা একাধিক জাত অন্যান্য জাত অপেক্ষা অধিক আবাদ করা হতো। গোড়ার দিকে জনসংখ্যার চাপ কম থাকায় কম উৎপাদনশীল হলেও বিশেষ বিশেষ গুণের কারণে কোনো ফসলের জাত বেছে নেবার সুফল ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদা বেড়েছে, বেড়েছে অধিক উৎপাদন করবার চাহিদাও। ফলে মানুষ দিন দিন অধিক ফলনশীল ফসলের জাতের উপর নির্ভরশীল হয়েছে।

কেবল যে অল্প ক'টি প্রজাতির উপর আমাদের নির্ভরশীলতা বেড়েছে ব্যাপারটি তা নয়, আমাদের নির্ভরশীলতা বেড়েছে প্রতিটি আবাদি প্রজাতির অল্প ক'টি জাতের উপর। প্রজাতি হ্রাসের চেয়ে আবাদি জাতের সংখ্যা হ্রাস একটি খুব উল্লেখযোগ্য বিষয়। নতুন নতুন ফসলের জাত উদ্ভাবন এবং এদের সাফল্য কৃষককে এসব জাতের আবাদে আগ্রহী করে তুলেছে বিধায় কৃষকের জাতগুলোর অধিকাংশই চলে গেছে আবাদের আওতার বাইরে। অনাবাদি থাকতে থাকতে এদের অনেকেই ফসলের মাঠ থেকে বিদায় নিয়েছে, আবার কোনো কোনোটি বিলুপ্ত হয়েছে। কোনো কোনোটি সংরক্ষিত হয়েছে জিন ব্যাংকে।

২. ফসল উন্নয়ন ও বৈচিত্র্য হ্রাস

কৃষকের জাতের মধ্যে নির্বাচন চালিয়ে উন্নতর জাত সৃষ্টির প্রয়াস ফসলের বৈচিত্র্য হ্রাসে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। কৃষকের জাত অপেক্ষা নির্বাচিত বিশুদ্ধ লাইনসমূহের ফলন অধিক হওয়ায় কৃষক অন্য অনেক জাত বাদ দিয়ে এগুলো আবাদ করতে শুরু করে। ফলে আরেক দফা হ্রাস পায় ফসলের জাতের বৈচিত্র্য। প্রথম দিকে ফসলের উফশী জাত এবং পরবর্তীকালে হাইব্রিড জাতের সাফল্য কোনো কোনো ফসলের জাতের বৈচিত্র্য একেবারেই সঙ্কুচিত করে ফেলেছে। অল্প ক'টি উফশী জাত বা হাইব্রিড জাত ফসলের মাঠ দখল করায় পূর্বের আবাদি জাতগুলো আবাদের আওতার বাইরে চলে গেছে। ভুট্টার ক্ষেত্রে হাইব্রিড জাতের ব্যপক সাফল্যের কারণে যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কিছু

দেশে একশত ভাগ ভুট্টা চাষ হাইব্রিড জাতের আবাদ নির্ভর হয়ে পড়েছে। ষাটের দশকে এসে ধানে ও গমের যে খর্বাকৃতির বা আধা খর্বাকৃতির আধুনিক জাতের সৃষ্টি করা হলো এদের আবাদ ফসলের মাঠের বৈচিত্র্য হ্রাস করেছে সর্বাধিক। এদের ফলনশীলতা সহজেই কৃষকের মনযোগ আর্কষণ করেছে।

ষাটের দশকে ধান ও গমের উচ্চ ফলনশীল তথা উফশী জাতের উদ্ভাবন এবং সত্তরের দশকে এসে এদের ব্যাপক চাষাবাদ কৃষকের জাতের বিলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করেছে অনেক দেশে। বিলুপ্তি ত্বরান্বিত করেছে এমনকি কৃষকের জাত থেকে নির্বাচন করে প্রজননবিদদের উদ্ভাবিত বিশুদ্ধ লাইন জাতগুলোর আবাদও। উফশী জাতের সাফল্য, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের ব্যাপক প্রচার প্রচারণা, বিভিন্ন কৃষি উপকরণ যথা-সার,বীজ,কীটনাশক, বালাইনাশক ও সেচের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি নানামুখি কৃষি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে কৃষক নতুন নতুন জাতগুলোকে গ্রহণ করেছে, বর্জন করেছে পূর্বের জাতগুলোকে।

সত্তরের দশকের পূর্বেও আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি ফসলেই অনেক বেশি সংখ্যক ফসলের জাতের আবাদ হতো। মাঠগুলো ছিল অনেক বেশি কৌলি বৈচিত্র্যপূর্ণ। আধুনিক ধান, গম আর ভুট্টার হাইব্রিডের উচ্চ ফলনশীলতার জন্য কৃষক এখন ফসলের অল্প ক'টি জাতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এ বৈচিত্র্য হ্রাস যে কখনও কখনও মহাবিপদ ঢেকে আনতে পারে তার প্রমাণও আমাদের কাছে অনুপস্থিত নয়।

কৃষকের জাতগুলো আধুনিক জাত দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ায় যে ফসলের মাঠে জাতের বৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু হিসাবটি এত সরল নয়। একদিকে,অনেক জাতের আবাদের বদলে আবাদ হচ্ছে অল্প ক'টি জাত। অন্যদিকে, কৃষকের মিশ্রিত জাতের বদলে আবাদ হচ্ছে বিশুদ্ধ একই জেনোটাইপ সম্পন্ন সমরূপ জাত। বৈচিত্র্যের বিনাশ ঘটেছে তাই দুদিক থেকে। অনুমান করি ধানের হাইব্রিড জাত, সুপার ধানের জাত আর সুপার হাইব্রিড ধানের জাতের আবাদ ধানের জাতের বৈচিত্র্যের মাত্রাটাকে আরও সঙ্কীর্ণ করে তুলবে। আর জিএম ফসলের আগমন এতে আর এক কাঠি যোগ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আধুনিক ফসল উন্নয়ন একদিকে যেমন কৌলি ক্ষয়কে (genetic erosion) ত্বরান্বিত করেছে অন্যদিকে সঙ্কীর্ণ করে তুলেছে ফসলের কৌলি ভিত্তিটাকেও। বিষয়টি একটুখানি ব্যাখ্যা করা দরকার। আমাদের কোনো কোনো ফসলের অধিকাংশ আধুনিক জাতের মধ্যে জিনগত বেশ মিল ঘটে গেছে। এসব জাত সৃষ্টিতে একই প্রজনক বার বার ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এ জিনগত সাদৃশ্যতা এসেছে। আধাখর্বাকৃতির ধানের কথাই ধরি। অধিকাংশ উফশী আধা-খর্বাকৃতির ধানে একটি প্রজনক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে হয় IR 8 নয় তো TN1। এ দুটি জাত- IR 8 এবং TN1 কিন্তু পরস্পর সম্পর্কিত এ কারণে যে এদের একটি সাধারণ প্রজনক ছিল Dee-geo-woo-gen জাতটি। শেষোক্ত জাতটি থেকে এরা পেয়েছে আধা খর্বাকৃতির জিনটি। আপাতদৃষ্টিতে কোনো উফশী জাতের প্রজনকের অবস্থা দেখে চটজলদি বিষয়টা বোঝা খুব সহজ নয়।

তবে কোনো জাতের প্রজনকের প্রজনক কে ছিল এভাবে পেছনের দিকে খুঁজতে শুরু করলে এক সময় সন্ধান মিলে যাবে সম্পর্কের।

শুধু ধানে নয়, গমের জাতগুলোর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। গমের আধুনিক আধা খর্বাকৃতির উফশী জাতগুলোও পরস্পর জিনগত দিক থেকে ঘনিষ্ট সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে। এদের খর্বাকৃতি স্বভাবের জন্য দায়ী Rht1 এবং Rht2 জিন দুটি এসেছে একই উৎস Norin 10 জাত থেকে। বিভিন্ন জাত হয়ে এ জাতটির জিন চলে গেছে অন্যান্য জাতেও। এভাবে অন্যান্য অনেক ফসলেই সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে কৌলিক ভিত্তিটি। একটি বা দুটি প্রজনক অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট জিনের উৎস হওয়ায় এদেরকে বার বার প্রজনক হিসেবে ব্যবহার করার কারণে ঘটছে এ বিষয়টি। এরকম সঙ্কীর্ণ ভিত্তি যে বিপত্তি ঘটাতে পারে তার দু'একটি নমুনা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা দেশে অল্প ক'টি জাতের আবাদ মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। এ বিপদের মাত্রাটা বেড়ে যায় যদি আবাদি জাতগুলোর সব ক'টিতে কোনো এক বা একাধিক জিন বিদ্যমান থাকে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় ১৯১৭ সালে গমের কাণ্ড মরিচা (stem rust) রোগের ব্যাপক বিস্তৃতি গম ফসলের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটায়। অবিভক্ত বাংলায় ১৯৪৩ সালে যে মন্বন্তর দেখা দেয় তার কিন্তু মূল কারণ ছিল ধানের বাদামি দাগ (brown sport) রোগের আক্রমণ। সম্পূর্ণ ধান ফসলই মার খেয়ে যায় সে বছর সেই রোগে। এর তিন বছর পূর্বে অবশ্য আমেরিকার যই (oat) ফসল সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় ভিক্টোরিয়া ধ্বসা রোগে।

যুক্তরাষ্ট্রে সত্তরের দশকে একটি রোগ জীবাণু ভুট্টা ফসলের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। ভুট্টা ফসলের পাতা ঝলসানো (leaf blight) রোগের জন্য দায়ী রোগজীবাণুটি হলো *Helminthosporium* যার বর্তমান নাম *Cochlibolus*। এ রোগটির আক্রমণে যুক্তরাষ্টের অধিকাংশ ভুট্টার হাইব্রিড বিনষ্ট হওয়ার কারণ হলো এসব হাইব্রিডে বিদ্ধমান টেক্সাস পুংবন্ধ্যা সাইটোপ্লাজমের উপস্থিতি। এ সাইটোপ্লাজমটি বর্ণিত রোগজীবাণু কর্তৃক সংবেদনশীল হওয়ায় বিপত্তিটি ঘটে। ভারতে স্বল্পমেয়াদি বাজরা হাইব্রিডে দেখা দেয় ডউনি মিল্ডিউ (downey mildew) এবং আরগট (ergot) রোগ। এক্ষেত্রে পুং বন্ধ্যা লাইন থেকে হাইব্রিডে বাহিত হওয়া নিউক্লিয়ার জিনের কারণে বিপত্তি ঘটে। ১৯৭৪, ১৯৭৫ ও ১৯৭৬ এ তিনবছরে ইন্দোনেশিয়া আর ফিলিপাইনে অল্প ক'টি আধাখর্বাকৃতির ধানের জাত আবাদ হওয়ায় গাছ ফড়িং আগ্রাসী রূপ নিয়ে ধ্বংস করেছে ধানের ফসল। জাতগুলো পরস্পর সম্পর্কিত হওয়ায় বিপদ ঘটেছে অধিক।

গত শতাব্দিতে এসে ফসলের রোগবালাই এবং কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী জাত সৃষ্টির কর্মকাণ্ডও বেগবান করা হয় অনেক দেশে। এতদিন ফসলের মিশ্রিত জাতগুলোর কোনো কোনো লাইন রোগ বা কীটপতঙ্গ সংবেদী হলেও কোনো কোনো লাইন ছিল প্রতিরোধী। ফলে ফলন কিছুটা হ্রাস পেলেও একেবারে নষ্ট হয়ে যেতো না আমাদের ফসল। প্রকৃতিতে রোগজীবাণু বা কীটপতঙ্গ এতটা নির্বাচন চাপের মুখে ছিল না পূর্বে। ফসলের সঙ্গে একত্রে মাঠে টিকে থাকার অথচ যথাসম্ভব কম ক্ষতি সাধন করার মতো একটি সাম্যাবস্থা বজায় ছিল। মুখ্য রোগবালাই আর কীটপতঙ্গের বিপক্ষে নির্বাচন

পরিচালনা করায় এদের কোনো কোনোটির আক্রমণ কমেছে বটে তবে দেখা দিয়েছে নতুন আর এক সমস্যা। মুখ্য রোগবালাই আর কীটপতঙ্গের অনুপস্থিতি গৌণ রোগবালাইকে সুযোগ করে দিয়েছে অধিক আগ্রাসী হওয়ার। অনেক ফসলের গৌণ রোগবালাই বা কীটপতঙ্গ ধীরে ধীরে মুখ্যাবস্থায় চলে এসেছে। সুতরাং গৌণ রোগবালাইয়ের আক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে পৃথিবীর নানা দেশেই।

বিজ্ঞানীরা যে এসব বিষয়ে অবগত নয় তা কিন্তু নয়। এসব ঘটনা তাদের চিন্তাকেও নাড়িয়ে দিয়েছে। সেজন্য ফসল উন্নয়নে বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎস থেকে জিন নিয়ে আসার বিষয়কে তারা যথেষ্ঠ গুরুত্ব দিচ্ছেন। ধানে ও গমে আধা খর্বাকৃতি জিনটি পরবর্তীকালে নেওয়া হয়েছে নানা উৎস থেকে। মাঠে কৌলি-বৈচিত্র্য রক্ষা করার নানা রকম কৌশলও বেড়িয়েছে। কৃষকের জাতের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ জিনের উৎসগুলোকে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নানা উৎস থেকে জিন নিয়ে ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার কর্মকাণ্ড এগিয়েছে। রোগ ও কীট-প্রতিরোধী জাত সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে কোনো উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কিছু না কিছু নেতিবাচক দিক থাকেই। পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য আর জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপখাইয়ে নিয়ে ফসলের চাহিদা মোতাবেক ফলন বৃদ্ধি সম্ভব নয় কখনো। মানুষের খাদ্যের মতো মৌলিক চাহিদা মেটানোর দাবিকে অগ্রাহ্য করার উপায় নেই বলে কিছু কিছু ক্ষতি যে আমরা মেনে নিচ্ছি না বা নিতে হচ্ছে না তা কিন্তু নয়। তবে উন্নয়নের পাশাপাশি উন্নয়ন কৌশল যত সুনিপুণভাবে ব্যবহার করা যাবে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠে বৈচিত্র্য রক্ষার যত উপায় বের করা যাবে ক্ষতির মাত্রাটা ততো কমে আসবে।

৩. জিএম ফসল ও বৈচিত্র্য হ্রাস

অনেকের ধারণা জিএম ফসলের আবাদ শুরু করলে ফসলের বৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে। ১৯৮৬ সালে প্রথম যখন জিএম টমেটো 'ফ্লেভার সেভার' বাজারজাত করা হয়, তখন জিএম ফসল নিয়ে জন স্বাস্থ্যের প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয়। এর মূল কারণ ছিল টমেটোতে 'বিলম্বিত পরিপক্বতা' জিনের সঙ্গে সংযোজিত এন্টিবায়োটিক জিন। 'বিলম্বিত পরিপক্বতা' জিনটি কোষে সংযোজিত হয়েছে কি-না এবং গাছে তা অন্তর্ভুক্ত রইলো কি-না তা পরীক্ষা করে বুঝবার জন্য এন্টিবায়োটিক জিনটিকে কাজে লাগানো হয়। এখন কিন্তু বিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট জিনকে শনাক্ত করার জন্য এমন সব জিনের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে যা এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী নয়। তাছাড়া কাঙ্ক্ষিত জিনের সঙ্গে জুড়ে দেয়া জিনটি যেন কয়েক বংশধর নির্বাচন করার পর আর উদ্ভিদে বিদ্যমান না থাকে সে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় জেনারেশনের জিএম এখন আগের তুলনায় অধিকতর নিরাপদ বলে দাবী করছেন বিজ্ঞানীরা।

ফসলের কীটপতঙ্গ ফসলের সবসময়ই একটি বড় শত্রু। দীর্ঘ সময় ধরে ফসল আর কীটপতঙ্গের মধ্যে যে মিথস্ক্রিয়া, আজ তা মেনে নিতে বাধ্য নই। আমরা চাই কীটপতঙ্গ ধ্বংস হয়ে যাবে, কেবল মাঠে দাঁড়িয়ে থাকবে সতেজ সবল ফসলের গাছগুলো। সেজন্যে ব্যাকটেরিয়া থেকে জিন এনে গাছে সংযোজন করা হয়েছে। পোকা সেই সব গাছে আক্রমণ করলে সেই জিন থেকে তৈরি বিষাক্ত প্রোটিন গাছের রসের

সঙ্গে পোকার মুখে চলে যায়। তা খেয়ে মারা যায় অনেক রকমের কীটপতঙ্গ। ক্ষতিকর ও উপকারী দু'রকমের কীটপতঙ্গই মারা যায়। উপকারী কীটপতঙ্গ বিনাশ যেমন পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ, তেমনি সেই বিষাক্ত প্রোটিন খেয়ে মানুষের অবস্থা কি হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন বিষাক্ত প্রোটিনটি ভাঙলে তবে বিষাক্ত হয়ে উঠে। মানুষের দেহে এ প্রোটিনটি ভাঙার কোনো উপায় নেই বলে তা বেরিয়ে যায় অক্ষত অবস্থায় মলের সঙ্গে।

পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য আগাছা দমন একটি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বিষয়। মাঠে আগাছা দমনের জন্য তারা আগাছানাশক ব্যবহার করে। আগাছানাশক কেবল আগাছার বিনাশ ঘটায় তা নয়, এরা ফসলেরও বিনাশ সাধন করতে সক্ষম। সেজন্য ফসলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে এমন জিন যা আগাছাকে হয় নষ্ট করে দেয়, নয়তো আগাছা এর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। এতে সুবিধা হলো এই যে, মাঠে অনায়াসে আগাছানাশক প্রয়োগ করে আগাছা দমন করা যাবে কিন্তু অক্ষত থাকবে ফসল। এই যে সুবিধা পাওয়া গেল তাও প্রশ্নাতীত নয়। প্রশ্ন উঠেছে প্রধানত দুটি– (১) এতে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় পরিবেশ বিষাক্ত হবে ; (২) এসব জিনের উপস্থিতি জন স্বাস্থ্যের জন্য কতটা নিরাপদ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এতে ভয়ের কারণ নেই। কেননা এরকম ফসল থেকে উৎপাদিত সয়াবিন তেল খাওয়া হয়ে থাকে।

কেবল ফসল উন্নয়নই বড় কথা তা নয়। আমাদের পরিবেশকে যা বিষিয়ে তুলবে, আমাদের জনজীবনকে যা বিপর্যস্ত করবে, আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য যা হুমকি সৃষ্টি করবে এবং আমাদের জীববৈচিত্র্যের যা বিনাশ ঘটাবে সেরকম কর্মকাণ্ড কত কম করা যাবে তা আমাদের ভাবতে হবে। টেকসই পরিবেশ-বান্ধব ও জৈব কৃষি আমাদের খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে তা করতে পারবে এমনটি মনে হয় না। তবে পৃথিবীতে জীব ও জড় পরিবেশ মিলে যে চমৎকার একটি সুষমতা বিরাজ করছে তাকে কত কম ক্ষতি সাধন করে সে বিষয়টি আমাদের আগামী প্রজন্মের স্বার্থেই আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে।

একাদশ অধ্যায়
আগামী দিনের ফসল

গত শতকে বিভিন্ন ফসলের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেছে বিজ্ঞানীরা। গত পঁয়ত্রিশ বছরে দানাশস্যের উৎপাদন বেড়েছে দ্বিগুণেরও অধিক যা ছাড়িয়ে গেছে বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও। গত চল্লিশ বছরের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করলে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ফসলের ফলন বৃদ্ধির মূল কারণ হলো হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধি। এ সময়ের মধ্যে কিছু বাড়তি জমি আবাদের অওতায় এলেও ফলন বৃদ্ধিতে এর অবদান ততটা তাৎপর্যপূর্ণ নয়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর ২০০৩ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী গত চল্লিশ দশকে অর্থাৎ ১৯৬০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়কালে গমের ফলন বেড়েছে শতকরা ২০৮ ভাগ। ধানের ক্ষেত্রে তা ১০৯ ভাগ, ভুট্টা, গোলআলু আর কাসাবার ক্ষেত্রে তা যথাক্রমে শতকরা ১৫৭, ৭৮ ও ৩৬ ভাগ। এ পরিসংখ্যান নিঃসন্দেহে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। তবে আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীর জনসংখ্যা এখনও বাড়ছে। বাড়ছে নানারকম খাদ্যের চাহিদা। নতুন শতাব্দির মাঝামাঝিতে এসে পৃথিবীর জনসংখ্যা যে বেড়ে ১০ বিলিয়নে দাঁড়াতে পারে সেটিও আমাদের মনে রাখতে হবে। কেবল আগামী দু'দশকে বিশ্বব্যাপী দানাশস্যের চাহিদাই বেড়ে যাবে শতকরা আরও ৫ ভাগ। ডাল , তেল, ফলমূল আর সবজির চাহিদাও যে এর সঙ্গে বেড়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে নতুন নতুন জাত সৃষ্টি করা ছাড়া আমাদের যে আর কোনো বিকল্প থাকবে না তা সহজেই অনুমান করা চলে।

ফসল উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক কর্মকাণ্ড। একটি ফসলের একটি বা একাধিক জাত সৃষ্টি করেই সন্তুষ্ট থাকার কোনো উপায় নেই। কোনো একটি জাত যেমন কৃষকের সকল চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়, অন্যদিকে তেমনি কোনো জাতই দীর্ঘ সময় ধরে এর ফলনশীলতা এবং গুণগতমান ধরে রাখতে সক্ষম হবার কথা নয়। পরপরাগী ফসলের মুক্তপরাগী জাতগুলোর বৈশিষ্ট্য খুব অল্প দিনেই নষ্ট হয়ে যায়। সময় বেশি লাগলেও স্ব-পরাগী ফসলেও নানা করণেই একটি জাতের বৈশিষ্ট্যাবলি দিনে দিনে নষ্ট হয়ে যায়। কেবল যে প্রাকৃতিক মিউটেশন ঘটে তা-ই নয়, আকস্মিকভাবে অন্য জাতের বীজের সঙ্গে মিশে যাবার পাশাপাশি নানারকম রোগবালাইও এর বিনাশ সাধন করতে পারে। তাই আগামী দিনে নতুন জাত সৃষ্টির পাশাপাশি বর্তমানে বিদ্যমান জাতগুলোর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য ফসল উন্নয়ন তথা উদ্ভিদ প্রজনন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

১. সুপার ধান

গত শতাব্দিতে আধা-খর্বাকৃতির ধানের জাত সৃষ্টি ধানের ফলন বাড়িয়েছে তাৎপর্যপূর্ণভাবে। শতাব্দির শেষের দিকে ধানের ফলন বৃদ্ধির বিষয়টি অনেকটা থেমে

গিয়েছিলো। ধানের ফলনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা নতুন ইডিওটাইপ অর্থাৎ সুপার ধান (Super rice) মডেল তৈরি করে। ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে কাঙ্ক্ষিত জিনের সমাহার ঘটিয়ে তৈরি করা হলো সুপার ধান। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা কৃষকের মাঠে যাবে তেমনটি আশা করা যায়। পাশাপাশি বর্তমান সময়ে সুপার ধানে বিদ্যমান ত্রুটিগুলো সরিয়ে নিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাবার চেষ্টা যে আগামীতে চলবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

২. ফসলের হাইব্রিড জাত

ধান উৎপাদনশীল দেশগুলোর মধ্যে হাইব্রিড ধানের প্রচলন রয়েছে বিশ্বের অল্প ক'টি দেশে মাত্র। এসব দেশগুলো হলো চীন, ভারত, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, মায়ানমার ও বাংলাদেশ। বর্তমানে বিশ্বে ১৪৭ মিলিয়ন হেক্টরের অধিক জমিতে ধানের আবাদ হচ্ছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯০ সালে বিশ্বের ধানী আবাদি জমির ১০% এ হাইব্রিড ধানের চাষ হয়, যা থেকে বিশ্বের মোট ধান উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ ধান উৎপাদিত হয়। অর্থাৎ পৃথিবীর একটি বিরাট ধানের আবাদি এলাকা রয়ে গেছে হাইব্রিড ধানের আওতার বাইরে। ফলে অনুমান করা যায় হাইব্রিড ধানের আবাদ বৃদ্ধি পাবে নতুন শতাব্দিতে। আরও নতুন নতুন হাইব্রিড ধান তৈরি হবে। এ প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হবে আরও অধিক বিজ্ঞানী ও কৃষক। হাইব্রিড ধানের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে নিজ নিজ দেশোপযোগী হাইব্রিড ধান তৈরি করবে বিজ্ঞানীরা। আমাদের দেশেও বিদেশ থেকে আমদানি করা ধানের হাইব্রিডের উপর নির্ভর করে হাইব্রিড ধানের জাত আবাদ শুরু হয়েছে। হাইব্রিড ধানের উন্নত জাত উদ্ভাবনের জন্য আমাদের দেশে আরও নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। দেশজ পরিবেশে দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানে উদ্ভাবিত হাইব্রিড ধানের আবাদ নিশ্চিত করা গেলে আগামী দিনগুলোতে হাইব্রিড ধানের আবাদ আমাদের খাদ্য শস্যের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

হাইব্রিড ধানের ক্ষেত্রে এ শতাব্দিতে আর একটি নতুন মাত্রা যোগ হবে *indica-japonica* শ্রেণীর ধানের সঙ্করায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রাপ্ত প্রাগ্রসর বংশধরদের (advanced generations) হাইব্রিড ধানের জাত সৃষ্টিতে ব্যবহার করে। ভিন্ন ইকোটাইপ বিধায় এদের সঙ্করায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রথম বংশধরে বন্ধ্যাত্ব দেখা দিবে সন্দেহ নেই। তবে কয়েক বংশধর ধরে এসব উদ্ভিদ জন্মাতে থাকলে উর্বরতার মাত্রা যেমন বৃদ্ধি পায়, লাইনগুলোও তেমনি স্থিতাবস্থায় চলে আসে। এসব লাইন হাইব্রিড ধান উৎপাদনে ব্যবহার করলে কৌলিক দূরত্বের কারণে ফলন যে বেড়ে যায় তা আজ প্রমাণিত হয়েছে বিভিন্ন গবেষণা থেকে। নতুন শতাব্দিতে এসে এদের ব্যবহার নিশ্চিত করা কিভাবে অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধান সৃষ্টি করা যায় সে কাজও বহুদূর এগিয়েছে। বর্তমান শতাব্দির দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে এ রকম হাইব্রিড ধান মাঠে প্রত্যক্ষ করা যাবে আশা করা যায়। ধানের বুনো আত্মীয়দের মাঝে নিষেকবিহীন বীজ উৎপাদনের জিনের সন্ধান পেয়েছে বিজ্ঞানীরা। দিনে দিনে এদের বংশানুসরণের নিয়ম-কানুনও জানা সম্ভব হচ্ছে। ধানের হাইব্রিডের ক্ষেত্রে প্রতিবছর বীজ তৈরির যে ঝামেলা

তা দূর করার জন্য নিষেকবিহীন বা অযৌন বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়া (apomixis) একটি চমৎকার বিকল্প হতে পারে। এ প্রযুক্তির প্রয়োগ করা গেলে হাইব্রিড ধান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তা একটি নতুন বিপ্লব হবে।

তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে হাইব্রিড সবজি বেশ জনপ্রিয় হলেও নিজ নিজ দেশে হাইব্রিড সবজির বীজ উৎপাদন বা হাইব্রিড জাত উৎপাদনের কাজ অনেক দেশেই বেশিদূর এগোয়নি। নতুন শতাব্দিতে সে সব দেশে সবজিতে হাইব্রিড প্রযুক্তির প্রসার ঘটবে এমনটি অনুমান করা যায়। পাশাপাশি বীজহীন ফল উৎপাদন প্রযুক্তিরও প্রসার ঘটবে বলে মনে হয়।

ট্রিপ্লয়েড হাইব্রিড তরমুজ পৃথিবীর নানা দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এখন অবশ্য বীজহীন ফল উৎপাদনের জন্য ট্রিপ্লয়েড সস্য (endosperm) আবাদ করার উদ্যোগ নিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এটি বীজহীন ফল উৎপাদনের একটি চমৎকার বিকল্প হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সারা পৃথিবীর বহু দেশে জাতীয় জিন ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক জিন ব্যাংক তথা গবেষণা ইনস্টিটিউটগুলোতে ইতোমধ্যে ফসলের যে জিন সম্ভার জমা হয়েছে এদের বৈশিষ্ট্যায়ন ব্যাপকভাবে শুরু হবে এ নতুন শতাব্দিতে। এসব সংরক্ষিত জিন সম্পদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহের কথা এখনও মানুষের অজানাই রয়ে গেছে। জীবীয় ও অজীবীয় নানারকম পীড়ন সহনশীল ফসলের জাত সৃষ্টির জন্য এসব জীন সম্পদের ব্যাপকভাবে ব্যবহার হতে পারে নতুন এ শতাব্দিতে। সনাতনী কায়দা ছাড়াও কোষাকলা আবাদ কৌশল অবলম্বন করে আন্তঃপ্রজাতি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আন্তঃগণ সঙ্করায়নও সম্ভবপর হবে। তাছাড়া আণবিক মার্কারভিত্তিক নির্বাচন (Marker assisted selection) ফসলের কাঙ্ক্ষিত জাত সৃষ্টির পথকে সুগম করবে।

৩. কোষকলা আবাদ ও ফসলের জাত

কোষাকলা আবাদ কৌশলের ব্যবহার এতদিন খুব প্রসার লাভ করেনি। মাইক্রোপ্রোপ্রাগেশন ছাড়া অন্যান্য টিস্যু কালচার কৌশলগুলো অবহেলিত হয়ে রয়েছে পৃথিবীর বহু অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে। পরাগধানী বা পরাগরেণু আবাদ দিন দিন জনপ্রিয় একটি কোষকলা আবাদ কৌশল হয়ে উঠছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে স্ব-পরাগী ফসলে সঙ্করায়ন করার পর আট দশ বছর সময় লাগে নির্বাচিত লাইনটিকে হোমোজাইগাসে পরিণত করতে। কোনো কোনো ফসলে পরাগধানী বা পরাগরেণু আবাদ করে পাওয়া হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদে কলচিসিন প্রয়োগ করে ডিপ্লয়েড বা দ্বিগুণিতক হ্যাপ্লয়েড (doubled haploid) উদ্ভিদ সৃষ্টি করে সহজেই চার পাঁচ বছর সময় কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। সে কারণে নতুন শতাব্দিতে পরাগধানী বা পরাগরেণু আবাদ কৌশলের বিস্তার ঘটবে এবং অল্প সময়ে সমধর্মী ফসলের জাত সৃষ্টির কর্মকাণ্ড এগিয়ে চলবে। পরপরাগী ফসলের হাইব্রিড জাত সৃষ্টির জন্য ইনব্রেড লাইন তৈরি করার প্রয়োজন হয়। প্রচলিত অন্তঃপ্রজনন (inbreeding) পদ্ধতিতে ইনব্রেড লাইন তৈরি করতে সময় লাগে ১০ ১২ বছর। অন্যদিকে পরাগধানী বা পরাগরেণু আবাদ করে,

দ্বিগুণিতক হ্যাপ্লয়েড তৈরি করে শতকরা ১০০ ভাগ হোমোজাইগাস ইনব্রেড লাইন তৈরি করা সম্ভব ৪-৫ বছরের মধ্যেই। তাই অনুমান করা চলে হাইব্রিড জাতের জন্য ইনব্রেড লাইন উৎপাদনেও এ কৌশলটি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। অঙ্গজ উপায়ে ফসলে বিভিন্নতা সৃষ্টির বিষয়টি এখনও বহু দেশেই অব্যবহৃত রয়ে গেছে। এ প্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত করা গেলে ইক্ষু ও গোলআলুর মতো অঙ্গজ বংশবিস্তারক্ষম ফসলে বিভিন্নতা সৃষ্টি করা সহজতর হবে। কোনো কোনো দেশে বিশেষ করে ফিজি ও ভারতে এ প্রযুক্তি প্রয়োগের সাফল্যেও কারণে অন্য দেশগুলোতেও এ প্রযুক্তির ব্যবহার ত্বরান্বিত করবে। প্রচলিত সঙ্করায়ন কৌশল অবলম্বন করে এক প্রজাতির বিভিন্ন জাত বা কৌলিসম্পদের মধ্যে সঙ্করায়ন করা সম্ভব হয়। সঙ্করায়ন অসংগতির কারণে প্রায়শই আন্তঃপ্রজাতি বা আন্তঃগণ সঙ্করায়ন সম্ভব হয় না। এরকম ক্ষেত্রগুলোতে দুই প্রজাতি বা গণের অঙ্গজ কোষের প্রোট্রোপ্লাস্টের মিলন ঘটিয়ে হাইব্রিড কোষ পাওয়া সম্ভব। টিস্যু কালচার কৌশলগুলোর মধ্যে অঙ্গজ সঙ্করায়ন এ শতাব্দিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে হয়। যদিও সরাসরি অঙ্গজ হাইব্রিডকে ফসল হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ খুবই সীমিত তবু এদের প্রাগ্রসর বংশধরের স্থিতাবস্থায় আসা লাইনগুলোকে ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আন্তঃপ্রজাতি বা অন্তঃগণ জিন অনুপ্রবিষ্টকরণ ত্বরান্বিত করা হতে পারে। তাছাড়া হাইব্রিড প্রযুক্তিতে পুংবন্ধ্যা লাইন উৎপাদনে এ প্রযুক্তির মাধ্যমে সাইটোপ্লাজম স্থানান্তর করার একটি নতুন পথ সৃষ্টি করতে পারে।

৪. জিনপ্রযুক্তির প্রয়োগ

জিনপ্রযুক্তির প্রয়োগ ও প্রসার ভীষণ রকম পাল্টে দিতে পারে আমাদের ফসলকে। কেবল যে ফসলের আদল পাল্টে যেতে পারে তা-ই নয় বরং পাল্টে যেতে পারে ফসলের ব্যবহারও।

ইতোমধ্যে বিজ্ঞানীরা *Arabidopsis* এবং ধানের জেনোম সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্যই জেনে যেতে সক্ষম হয়েছে। একবীজপত্রী ফসলের প্রতিনিধিরূপে ধান আর দ্বিবীজপত্রী ফসলের প্রতিনিধিরূপে *Arabidopsis* প্রজাতির জেনোম সিকুয়েন্সিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এ দুটি ফসলের জিনের সংখ্যা জানা সম্ভব হয়েছে। এদের কোন জিনের কি কাজ দিনে দিনে তাও জানা সম্ভব হবে। এসব তথ্যাবলি কাজে লাগাতে পারলে আগামী দিনের গবেষণা এবং ফসল উন্নয়ন ধারা পাল্টে যাবে নিঃসন্দেহে। বিজ্ঞানীরা এখন জেনে গেছে ধানের কোনো ক্রোমোজোমে কতটি জিন রয়েছে এবং এসব জিনের গঠন রহস্য কি। এসব জিনের সঠিক অবস্থা জানতে পারায় এখন সুনির্দিষ্টভাবে এদের কর্তন করা এবং অন্য ফসলে এদের স্থানান্তর করা সহজতর হবে। ফসলের ভেতরে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া, কিভাবে গাছ পালার আকার, আকৃতি, গঠন নির্ধারিত হয় এবং বিভিন্ন অঙ্গ কাজ করে এসব আজ বেশি করে জানা হয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞানীদের। এর ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং এর কার্যকরণের কোথায় পরিবর্তনটি আনতে হবে তা আরও সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হবে। নির্দিষ্ট স্থানে পরিবর্তন সাধন করে ফসলে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভব হবে নিঃসন্দেহে।

জিনপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভিদে কাঙ্ক্ষিত জিন সংযোজনের কাজ শুরু হয়েছে দুই দশক পূর্বেই। জিনপ্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিত জিএম ফসলের আবাদ শুরু হয়েছে বাণিজ্যিকভাবে ১৯৯৬ সালে। অর্থাৎ জিএম ফসল আবাদের এক যুগ মাত্র পূর্তি হয়েছে। জিএম ফসল তৈরিতে জিনের উৎস যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে এর ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রও। ফসল উন্নয়নের ক্ষেত্রে জিনপ্রযুক্তির কত বহু মাত্রিক প্রয়োগ হতে পারে আজকের প্রেক্ষাপটে তা হয়তো অনুমান করাও শক্ত। পৃথিবীর এত বেশি গবেষণাগারে এখন জিনপ্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে যে আগামীদিনের জিএম ফসল যে অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে এটি অনুমান করা চলে।

দানাশস্য, সবজি, ফল, আঁশজাতীয় ফসলসহ নানারকম ফসল উন্নয়নে এখন জিনপ্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেক ফসলের জিএম উদ্ভিদ নিয়ে চলছে প্রাথমিক পর্যায়ের গবেষণা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চলছে মাধ্যমিক পর্যায়ের যাচাইবাছাই। অন্য কোনো কোনো ফসলের ক্ষেত্রে আবার চলছে বাণিজ্যিক আবাদের লক্ষ্যে ছাড়পত্র দেবার জন্য শেষ পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সুতরাং ফসল উন্নয়ন পাইপ লাইনে রয়েছে নানা ফসলের নানাস্তরের জিএম। আগামী দিনগুলোতে এদের কোনো কোনোটি চলে আসবে কৃষকের মাঠে। আমাদের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে কোনো কোনোটি আমাদের জ্ঞাতসারে, কোনো কোনোটি আবার আমাদের অজান্তে নানা খাদ্যের উপকরণ হিসেবে।

ইতোমধ্যে জিনপ্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে যে অল্প ক'টি ফসলের জিএম জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে এদের বাণিজ্যিক আবাদও শুরু হয়েছে কোনো কোনো দেশে। এসব জিএম ফসল মূলত আগাছানাশক, কীট ও ভাইরাস প্রতিরোধী ক্ষমতা অর্জন করেছে। এ তিনটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বহু সংখ্যক দানাশস্য, সবজি, ফল আর আঁশজাতীয় ফসল এখন সৃষ্টি করা হচ্ছে জিনপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে। পৃথিবীর নানা গবেষণাগারে আগামী দিনে নিঃসন্দেহে আরও অনেক দেশে এসব আগাছানাশক, কীট বা ভাইরাস প্রতিরোধী জিএম ফসলের আবাদ শুরু হবে। ইদানিংকালে নানারকম পীড়ন প্রতিরোধী জিন সংগ্রহ করা হচ্ছে নানা বৈচিত্র্যময় উৎস থেকে। ফলে আগামী দিনের জিএম ফসল কার্যকরভাবে জীবীয় ও অজীবীয় পীড়নের (biotic and abiotic stress) বিপক্ষে প্রতিরোধক্ষমতা প্রদর্শন করবে এমনটি আশা করা চলে।

ফসলের বহু রোগ আর কীট-পতঙ্গ এখনও মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়েছে। এদের নিয়ন্ত্রণের জন্য জিনপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের লক্ষ্যে নানামুখি গবেষণা চলছে। ফসলের প্রধান প্রধান রোগ আর কীটপতঙ্গের বিপক্ষে প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টির কাজ চলছে পৃথিবীর বহু গবেষণাগারে। ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী জিএম ফসল সৃষ্টির কর্মকাণ্ডও বহুদূর এগিয়েছে। ইদানিংকালে নতুন নতুন উৎস থেকে জিন এনে সংযোজন করা হচ্ছে ফসলে। এ যাবৎ ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া রোগ প্রতিরোধী কোনো জিএম ফসল বাণিজ্যিকভাবে আবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়নি। তবে এরকম জিএম ফসলের বেশ ক'টির পুরোগামী লাইন রয়েছে যাচাইবাছাইয়ের শেষ পর্যায়ে। আগামী দিনে এসব ফসলের কোনো কোনোটির জিএম জাতের আবাদ শুরু হবে বলাই বাহুল্য। জীবপ্রযুক্তিগত গবেষণা দিন দিন নানারকম ফসল উন্নয়ন

প্রযুক্তি নিয়ে হাজির হচ্ছে আমাদের সামনে। কত সহজে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের কত কম ক্ষতি করে নিরাপদভাবে রোগ ও কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী জিএম ফসল তৈরি করা যায় তা নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে পৃথিবীর নানা দেশে। ফসলের রোগ ও কীটপতঙ্গ প্রতিরোধক্ষমতার আণবিক ভিত্তি যত স্পষ্ট করে জানা যাবে ততো বেশি ফসলে চাহিদা মাফিক রূপান্তর করা সম্ভব হবে।

ফসলের জীবীয় প্রতিকূলতার পাশাপাশি রয়েছে নানারকম অজীবীয় প্রতিকূলতাও। দিন দিন বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বাড়ছে উষ্ণতা। ফলে ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে সমুদ্রের পানির উচ্চতা আর উপকূলীয় জমির লবণাক্ততা। বৃষ্টির পরিমাণ ও বৃষ্টিপাত ঘটার পরিমাত্রাও হ্রাস পাচ্ছে দিনে দিনে। ফসলের বৃদ্ধির নানা পর্যায়ে দেখা দিচ্ছে নানা মাত্রায় খরা। শীতপ্রধান দেশের জন্য অধিক শীত একটি বড় বাঁধা। কোনো কোনো ফসলের জমিতে বেড়ে যাচ্ছে ভারি ধাতুর উপস্থিতি। এসব সমস্যা মাথায় রেখে তৈরি করা হচ্ছে জীবীয় ও অজীবীয় পীড়ন প্রতিরোধী জিএম ফসল। ধানের খরা ও লবণাক্ত প্রতিরোধী জিএম নিয়ে কোনো কোনো দেশে চলছে মাঝারি পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কৃষির একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে লবণাক্ততা। বিশ্বব্যাপী লবণাক্ততা বেড়েই চলেছে। আমাদের দেশেও বহু জমি ফসল আবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। এসব জমিতে ফসলের আবাদ নিশ্চিত করতে হলে লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসল উদ্ভাবন করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এখনও লবণাক্ততার আণবিক জীববিদ্যা সম্পর্কে ততো ভাল করে জ্ঞাত নন বিজ্ঞানীরা। লবণাক্ততা সহিষ্ণুতার কৌশল এবং বংশগতি জানা হয়ে গেলে এক্ষেত্রে উন্নয়ন যে ত্বরান্বিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন অবশ্য লবণাক্ততা-সহিষ্ণু উদ্ভিদ থেকে জিন আলাদা করে নিয়ে ফসলে সংযোজন করে দিয়ে কি ঘটতে পারে বাস্তবে সেসব গবেষণা এগুচ্ছে। লবণাক্ততার সমস্যাটা এত প্রকট হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, এসব গবেষণা দু'তিন দশক খুব জোরেসোরে এগুবে এমনটি ধারণা করা যায়।

৪.১. পীড়ন-সহিষ্ণু ফসলের জাত

অজীবীয় পীড়ন অর্থাৎ খরা, লবণাক্ততা, শীত, বন্যা এবং নানারকম বিষাক্ত ধাতব পদার্থ আমাদের ফসল উৎপাদনকে নানাভাবে ব্যাহত করছে। এর কোনো কোনো সমস্যা আজ যেমন প্রকট আগামী দিনেও তা প্রকটতর হবে সন্দেহ নেই। ফলে এ বিষয়ে গবেষণার এক বিরাট দিগন্ত উন্মোচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এখন। বিশেষ করে জিনপ্রযুক্তির সাফল্য আমাদেরকে আশাবাদী করে তুলছে। ট্রান্সজেনিক ধানে পলি-অ্যামিন সংশ্লেষণের জন্য ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে দুটি মুখ্য জিন যা কোষ পর্দাকে শীত, খরা এবং লবণাক্ততায় দিয়েছে অধিকতর প্রতিরক্ষা। খরার বিপক্ষে প্রতিরোধিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্ভিদে একটি ট্রান্সজিন সংযোজন করে পাওয়া গেছে শক্ত ও পুরু কাণ্ড, বৃহদাকৃতির পাতা আর অধিক মূল। এর ফলে মূল বৃদ্ধি পেয়েছে, বেড়েছে খরা প্রতিরোধিতা। বরফগলা পানিতে বাস করে অভ্যস্ত তেমন মাছের কোষ থেকে গ্লিসারোল-৩-ফসফেট অ্যাসাইল ট্রান্সফারেজ জিন টমেটো আর তামাকে সংযোজন করে পাওয়া গেছে উচ্চমাত্রার শৈত্য সহনশীলতা। ব্যাকটেরিয়া থেকে ঠাণ্ডা নিয়ন্ত্রণকারী

জিন ধানের ক্রোমোজোমে প্রবিষ্ট করে দিয়ে পাওয়া গেছে ঠাণ্ডা প্রতিরোধক্ষম রূপান্তরিত ধান।

বন্য সইবার ক্ষমতা লক্ষ্য করা গেছে ধানে যখন পানিবদ্ধতার সঙ্গে সম্পৃক্ত জিন প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে রূপান্তরিত ধানে। লোহার অভাব সহ্য করবার ক্ষমতার জন্য দায়ী জিন ফেরিক ক্যালেট রিডাকটেজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে *Arabidopsis* প্রজাতির ফসলে। কোনো কোনো উদ্ভিদে পারদ, বোরন, এ্যালুমিনিয়াম, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি পদার্থের কারণে সৃষ্ট দূষণ-সহিষ্ণু জিন সংযোজন করা হয়েছে। এমনকি বাদ যায়নি ওজোনের বিপক্ষে প্রতিরোধিতা সৃষ্টিও। ওজনের উপস্থিতিতে যেন নিম্নমাত্রায় ক্ষতিসাধন ঘটে সেজন্য অধিক ফেরিটিন স্টোরেজ আমিষ উৎপাদনক্ষম ট্রান্সজেনিক ধান তৈরি করা হয়েছে।

বীজ ফসল মানুষ এবং পশু পুষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অল্প ক'টি দানাশস্য সারা বিশ্বের মোট খাদ্য ক্যালরির শতকরা ৫০ ভাগের অধিক সরবরাহ করে থাকে। একইভাবে সাতটি দানাদার শিমজাতীয় ফসল আমাদের ক্যালরি গ্রহণের একটি ভাল অংশের যোগানদাতা। দানাশস্যের আমিষ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশের আমিষের চাহিদা পূরণ করে। অথচ দানাশস্যের আমিষে একাধিক এমাইনো এসিডের ঘাটতি রয়েছে ; যেমন-লাইসিন এবং থ্রিওনিন স্বল্পতা। শিমজাতীয় ফসলের বীজেও ঘাটতি রয়েছে সালফার এমাইনো এসিডগুলোর। ধানে অবশ্য তুলনামূলকভাবে এমাইনো এসিডের সুষমতা মন্দ নয় কিন্তু এর প্রোটিনের পরিমাণ যথেষ্ট কম। নানা ফসলের এই যে ঘাটতি তা আজ পূরণ করার সুযোগ এসেছে নানা উৎস থেকে ফসলে জিন সংযোজন করে দিয়ে।

৪.২. অশিম্বি ফসলে নাইট্রোজেন সংবন্ধনক্ষমতা সংযোজন

ফসলের উৎপাদনের জন্য সার প্রয়োগ এখন এক অত্যাবশ্যকীয় ঘটনা। এমন কোনো ফসল নেই যার আবাদের জন্য এখন রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবাহার করা হচ্ছে না। দিন দিন নাইট্রোজেন সারের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ফসলের উৎপাদন খরচও বেড়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো উদ্ভিদ অণুজীবদের নিজের মূলে আশ্রয় দিয়ে বায়ুর নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে সক্ষম। অন্য ফসলের তুলনায় এদের নাইট্রোজেন সার অল্প প্রয়োগ করতে হয়। শিমজাতীয় (legume) ফসলের নাইট্রোজেন সংবন্ধনক্ষম জিন (nif gene) অশিমজাতীয় ফসলে (non-legumes) সংযোজন করা উদ্ভিদ প্রজননবিদ এবং জীব প্রযুক্তিবিদদের একটি দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন।

বিজ্ঞানীরা এখনও মিথোজীবিতার মাধ্যমে নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জটিল কৌশলগুলো পুরোপুরি রপ্ত করতে পারেনি। কোথায় রয়েছে এর নিয়ন্ত্রণ, নাইট্রোজেনেজ এনজাইম কার্যকরণের জন্য কি কৌশলে নডিউলের ভেতরে তৈরি হয় অজীবীয় পরিবেশ, এমনি খুটিনাটি অনেক বিষয় এখনও জানা যায়নি। তবে যে ধারায় এ লক্ষ্যে জীবপ্রযুক্তিগত কর্মকাণ্ড এগুচ্ছে এই শতকের মাঝামাঝিতে গিয়ে এ স্বপ্নের বাস্তবায়ন পাবে এটি আশা করা যায় নিঃসন্দেহে।

৪.৩. পুং-বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে হাইব্রিড জাত সৃষ্টি

ফসলের 'সঙ্কর সাবল্য' ধরণটির প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে অনেকগুলো ফসলে। এখনও আরও অনেক ফসল রয়েছে যারা প্রচুর সঙ্কর সাবল্য প্রদর্শন করলেও উপযুক্ত পর-পরাগায়ন কৌশল না থাকায় এদের হাইব্রিড বীজ উৎপাদন করা অলাভজনক হচ্ছে। বিশেষ করে পুংবন্ধ্যা কৌশলের অনুপস্থিতি কোনো কোনো ফসলে হাইব্রিড জাত সৃষ্টি বিঘ্নিত করছে। জিনপ্রযুক্তি প্রয়োগ পুংবন্ধ্যাত্ব সৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তেলবীজ রেপ (Rape) এ ব্যাকটেরিয়া থেকে Barnase জিন প্রবিষ্ট করে দিয়ে দেখা গেছে যে, তা পরাগরেণুর কোষ প্রাচীরকে ভেঙে দিচ্ছে বলে পুংরেণু বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, পরিণামে সৃষ্টি হচ্ছে পুংবন্ধ্যাত্ব। পিটুনিয়াতে এন্টিসেন্স প্রযুক্তি প্রয়োগ করে চালকন সিনথেজ জিনকে কর্মহীন করে দিয়ে পাওয়া গেছে পুংবন্ধ্যাত্ব। এসব পুংবন্ধ্যাত্ব গাছে উর্বরতা ফিরিয়ে নিয়ে আসবার জিনেরও সন্ধান পাওয়া গেছে ব্যাকটেরিয়ায়। ফলে আগামী দিনে পুংবন্ধ্যাত্ব সৃষ্টিতে গবেষণার এসব ফলাফল যে অধিকতর প্রয়োগ করা হবে তা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর এরই ধারাবাহিকতায় অনেক ফসলে হাইব্রিড বীজ তৈরির সুযোগও সৃষ্টি হবে আগামী দিনগুলোতে।

৪.৪. C3 ফসলকে C4 ফসলে রূপান্তর

ফসলের ফলনশীলতা বৃদ্ধির একটি বড় উপায় হলো ফসলের সালোকসংশ্লেষণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। ধানে আর গমে ষাটের দশকে ফসলের উদ্ভিদাকৃতি পাল্টে দিয়ে ফলন বৃদ্ধির যে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল এর মূল কারণ ছিল উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের দক্ষতা বৃদ্ধি। আধা-খর্বাকৃতি উদ্ভিদের খাড়া খাড়া পাতা নেতিয়ে পড়া স্বভাবের পাতা অপেক্ষা অনেক বেশি সালোকসংশ্লেষণ ঘটাতে সক্ষম ছিল বলে এবং প্রস্তুতকৃত খাদ্যের একটি বড় অংশ দানায় পৌঁছাতে পারে বলে বৃদ্ধি পেয়েছে ফলন। সালোকসংশ্লেষণের জন্য উদ্ভিদের C_4 পথক্রম C_3 পথক্রম অপেক্ষা বায়ুর CO_2 কে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাতে পারে। ভুট্টা গাছের C_4 পথক্রমের প্রধান এনজাইম হলো ফসফোএনোল পাইরুভেট ডিকার্বোক্সাইলেজ (phosphoenol pyruvate dicarboxylase)। জিনপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে এ এনজাইমের জিনটি ধানে জাপানী বিজ্ঞানী Ku এবং তাঁর সঙ্গীরা সংযোজন করেছেন। ধানের এরকম রূপান্তরিত গাছে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সালোকসংশ্লেষণ মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধানের ফলন যথেষ্ট বেড়েছে। বিজ্ঞানীরা C_4 পথের আরও দুটি জিনকে ধানে সংযোজন করে দিতে পারলে ফলন বেড়ে যাবে আরও। আর সেটি হবে নিঃসন্দেহে আর এক সবুজ বিপ্লব।

৪.৫. ফসলের গুণগতমান বৃদ্ধি

ফসলের উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা নানামুখি গবেষণা সম্পন্ন করে যাচ্ছেন। ভিটামিন 'A' সমৃদ্ধ ধান 'সোনালি ধান' সৃষ্টির মাধ্যমে ভিটামিনের পরিমাণ বাড়াবার কর্মযজ্ঞও শুরু হয়েছে। ধানে ভিটামিন 'এ' উৎপাদনের লক্ষ্যে বিজ্ঞানী ইনগো পুত্রিকাস আর পিটার বেয়ার তিনটি জিন প্রবিষ্ট করে দিয়ে তৈরি

করেছেন সোনালি ধান। *japonica* এবং *indica* উভয় প্রকার ধানেই এখন সংযোজন করা হয়েছে ভিটামিন 'এ' উৎপাদনকারী জিন। ধানে সংযোজন করা হয়েছে আয়রন উৎপাদনকারী জিনও। এমনকি একটি ধানের জাতে ভিটামিন 'এ' এবং আয়রন উৎপাদনকারী জিন একত্রে সংযোজন করা হয়েছে। ফলনের মাত্রা যথাযথ হলে এবং জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য তা হুমকির কারণ না হলে আগামী দিনে এরকম জিএম ধানের জাত ফসলের মাঠে জন্মাবে তেমনটি আশা করা যায়।

Arabidopsis প্রজাতির ফসলে জিনপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে বীজের তেলে ভিটামিন 'E' এর পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে নয়গুণ। এরকম ভিটামিন উপাদান বাড়াবার কাজ চলছে পৃথিবীর বহু গবেষণাগারে এখন। ধানের সস্যে (endosperm) স্বাভাবিকের তুলনায় লোহার পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে তিন গুণ। টমেটোতে লাইকোপেন এন্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণ বেড়েছে কয়েকগুণ। দানাশস্যে এবং শিমজাতীয় ফসলের বীজে আমিষের জৈবীয় দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। দানাদার শিমজাতীয় ফসল থেকে জিন নিয়ে দানাশস্যে সংযোজন ঘটিয়ে পাওয়া গেছে উচ্চ লাইসিন দানা। ধানের প্রোলামিন জিন, ভুট্টার জেইন (zein) জিন এবং সূর্যমুখির সালফার সমৃদ্ধ ২ S এলবুমিন জি সয়াবিনে পৃথক পৃথকভাবে সংযোজন ঘটিয়ে পাওয়া গেছে উচ্চ পরিমাণ মেথিওনিন এমাইনো এসিড। পৃথিবীর বহু গবেষণাগারে ফসলের নানামুখি দক্ষতা বাড়াবার কাজ চলছে। জিনপ্রযুক্তি ফসলের বহুমাত্রিকতা সৃষ্টির মাধ্যমে এ শতাব্দিতে নিয়ে আসবে বিস্ময়কর সব সাফল্য। এ শতাব্দি যে জীবপ্রযুক্তি শতাব্দি হবে এ বিষয়ে সংশয় থাকার কোনো কারণ নেই।

ফসলের গুণগতমান বৃদ্ধি উদ্ভিদ প্রজননবিদদের দুটি প্রধান উদ্দেশ্যের একটি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ফসলের ফলন বৃদ্ধি প্রধান উদ্দেশ্য হলেও উন্নত বিশ্বে ফসলের উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি এখন প্রধান লক্ষ্য। আর জীবপ্রযুক্তিগত গবেষণাগুলো মূলত যেহেতু তাদের ল্যাবরেটরিতেই হচ্ছে ফলে গুণগতমান বৃদ্ধির বিষয়টি যে প্রাধান্য পাবে এটিই স্বাভাবিক। নানা ফসলের আমিষের মান বৃদ্ধি জিনপ্রযুক্তিবিদদের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। ডাটা প্রজাতির ফসল থেকে অ্যামারেন্থাস এলবুমিন জিন গোলআলুতে সংযুক্ত করে দেখা গেছে যে গোলআলুতে অধিকতর সুষম সংযোগে অত্যাবশকীয় এমাইনো এসিডসমৃদ্ধ অধিক পরিমাণ আমিষ তৈরি হচ্ছে। এভাবে আমিষের গুণমান বৃদ্ধির জন্য জিনপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে সাফল্য পাওয়া গেছে তামাকে এবং গমেও। এসব গবেষণার ফলাফল মাঠ পর্যায়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। শ্বেতসারের রূপান্তর ঘটাবার কাজেও এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যাকটেরিয়া থেকে উচ্চমাত্রার এমাইলোজ উৎপাদকারী জিন গোলআলুতে সংযোজন করে আলুতে পাওয়া গেছে অধিক পরিমাণ এমাইলোজ। উচ্চ চিনি ধারণক্ষম সয়াবিন তৈরি করা হয়েছে জিনপ্রযুক্তি ব্যবহার করে। এসব গবেষণার ফলাফল এ শতাব্দিতে প্রায়োগিক পর্যায়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ক্যানোলার বীজ অধিক লরিক এসিড (একটি উত্তম লুব্রিকেন্ট) উৎপাদনের লক্ষ্যে জিন সংযোজন করা হয়েছে। ট্রান্সজিনের সংযোজন ঘটিয়ে পাওয়া সম্ভব হয়েছে নেপাস সরিষার বীজে অধিক পরিমাণ স্টিয়ারিক এসিড। আর এভাবে তামাকের বীজে পাওয়া গেছে অধিক

পরিমাণ পামিটোলিয়েক এবং পেট্রোসেলেনিক এসিড। সয়াবিনে উচ্চ অলিয়েক এসিড উৎপাদনের লক্ষ্যে সংযোজন করা হয়েছে জিন। জিনপ্রযুক্তির মাধ্যমে মার্জারিন তৈরির লক্ষে তেলবীজ রেপ-এ এবং সয়াবিনে পাল্টে দেয়া হয়েছে ফ্যাটি এসিডের গঠন।

তেল ফসলে ফ্যাটি এসিডের গঠন রূপান্তরের গবেষণা চলছে পৃথিবীর বেশ কিছু ল্যাবরেটরিতে। মানুষ এখন কোলেস্টেরল সম্পর্কে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। সম্পৃক্ত তেল অপেক্ষা অসম্পৃক্ত তেল স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উত্তম। তেল ফসলে জিন সংযুক্ত করে দিয়ে অধিক মাত্রায় লিনোলেনিক এবং লিনোলেয়িক এসিড সমৃদ্ধ তেল উৎপাদন করতে পারলে তা সহজেই মানুষের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। এদেশে সরিষার তেলের ব্যবহার হয়ে আসছে আদিমকাল থেকেই। এখন আমরা মূলত সয়াবিন তেল নির্ভর হয়ে উঠলেও সরিষার তেলকে একেবারে বিসর্জন দেইনি। সরিষার তেলে শতকরা ৫০ ভাগের চেয়ে বেশি রয়েছে ইরিউসিক এসিড যা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। ইরিউসিক এসিড উৎপাদন করার পূর্বে সরিষার বীজে তৈরি হয় লিনোলেনিক এসিড এবং লিনোলেয়িক এসিড। সরিষার গাছে যদি কোনো জিন অন্তর্ভুক্ত করে দিয়ে ঠেকিয়ে দেয়া যায় ইরিউসিক এসিড উৎপাদন তাহলে বীজে অনিবার্যভাবে বেড়ে যাবে লিনোলেনিক বা লিনোলেয়িক এসিডের পরিমাণ। সেরকম সরিষাও অনেক কাঙ্ক্ষিত সরিষা হবে।

শিল্পের জন্য ব্যবহারের লক্ষ্যে ফসলের উৎপাদিত পণ্যের ফ্যাটি এসিডের গঠনে নানারকম রূপান্তর সম্ভব হবে আগামী দিনগুলোতে। কোনো কোনো তেল ফসলের আবাদ হবে লরিক এসিড উৎপাদনের লক্ষ্যে, কোনো কোনো তেল ফসলের আবাদ করা হবে স্টিয়ারিক এসিড বা পামিটোলিয়েক এসিড বা পেট্রোসেলেনিক এসিড কিংবা কখনো অলিয়েক এসিড উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। মার্জারিন তৈরির লক্ষ্যে তেলে নিয়ে আসতে হবে নানারকম রূপান্তর। কখনও ফ্যাটি এসিডের শৃংখলটাকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলতে হবে, কখনও আবার রূপান্তর ঘটানো হবে ফ্যাটি এসিডের সম্পৃক্ততা আর অসম্পৃক্ততা স্বভাবেরও।

কোনো কোনো ফসলে মানুষের এলার্জি সৃষ্টি করার উপাদান 'এলার্জেন' রয়েছে। সহজে যাদের এসব ফসলের উৎপাদিত পণ্য খাবার গ্রহণ করলে এলার্জি দেখা দেয় তারা অনেকটা কষ্ট করেই এসব খাবার বর্জন করে। আগামী দিনে এলার্জেনকে রোধ করার জন্য জিনপ্রযুক্তির প্রয়োগকে নিশ্চয়ই স্বাগতম জানাবে অনেকে। বেগুন আমাদের দেশি ফসল। এদেশে এর উৎপত্তি ঘটেছে। ফলে এদেশে বেগুনের রয়েছে নানারকম বৈচিত্র্যপূর্ণ জাত। বেগুনের এলার্জি ঘটাবার ক্ষমতাটাকে তাড়াতে পারলে তা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি সবজি হয়ে উঠতে পারে। এই এলার্জেনকে অপসারণের লক্ষ্যে বাদামসহ আরও কিছু ফসলে জিনপ্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। সয়াবিনের নির্দিষ্ট এলার্জেনকেও শনাক্ত করেছে বিজ্ঞানীরা এবং জিনপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে সফলভাবে রূপান্তরিত সয়াবিন তৈরি করা হয়েছে।

কফি পানীয় হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়। কফিপায়ীদের জন্য কফির মধ্যে বিদ্যমান 'ক্যাফেইন' স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। জার্মান রসায়নবিদ লুডউইগ রোসেলিয়াজ

রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে কফি থেকে ক্যাফেইন দূর করার কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। এ কৌশল ধীরে ধীরে মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নানা রাসায়নিক বিক্রিয়া শেষে কফিতে তৈরি হয় এ পদার্থটি। রাসায়নিক বিক্রিয়ার কোনো ধাপকে বাধাগ্রস্থ করে ক্যাফেইন তৈরি হওয়া বন্ধ করা যেতে পারে। জিনপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে ক্যাফেইনমুক্ত কফি তৈরি হবে আগামীতে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

এখন জিনপ্রযুক্তির প্রয়োগ পাল্টে দিতে যাচ্ছে খাদ্যের শ্বেতসার, চর্বি, আঁশ এবং ভিটামিন উপাদানের পরিমাণ ও গুণ। আমিষ সমৃদ্ধ দানাশস্য থেকে জিন আলাদা করে নিয়ে এখন তা সংযোজন করা হচ্ছে কম আমিষযুক্ত অন্য দানাশস্যে। কখনও দানাদার শস্যের আমিষ জিন ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে অন্য কোনো ফসলে। অ্যামারেন্থ (Amaranth) নামক আমাদের ডাটার এক আত্মীয় প্রজাতি তৈরি করে আমিষসমৃদ্ধ ছোট ছোট বহু দানা। এর দানার আকৃতি ছোট বলে এ ফসলটিকে খুব একটা জনপ্রিয় করে তোলা যাচ্ছে না। সেজন্য এ ফসলের অ্যামারেন্থাস অ্যালবুমিন জিন (Am A 1) সংগ্রহ করে তা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে গোলআলুর মধ্যে। লক্ষ্য আমিষহীন গোলআলুতে অধিক মাত্রায় আমিষ পাওয়া। ফলাফল বেশ আশাব্যঞ্জক। রুটি বানানোর জন্য উচ্চ গুনমাণসম্পন্ন প্রোটিন জিন একটি পুরোনো দিনের গমের জাত থেকে গমের আধুনিক জাতে সংযোজন করা হয়েছে । ফলাফল এখানেও যথেষ্ট উৎসাহব্যাঞ্জক।

শ্বেতসারের পরিমাণ ও গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যেও চলছে জিনপ্রযুক্তির প্রয়োগ। উচ্চ এমাইলোজ উৎপাদনকারী জিন *E. coli* ব্যাকটেরিয়া থেকে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে গোলআলুর জেনোমে। এতে বেড়েছে গোলআলুর এমাইলোজ উৎপাদনক্ষমতা। অন্য আর একটি জিন গোলআলু গাছে সংযোজন করায় বেড়েছে শতকরা ৩৫ ভাগ অধিক শর্করা উৎপাদন ক্ষমতা। উচ্চ মাত্রার সুগার উৎপাদনকারী সয়াবিন জিএম তৈরি করা হয়েছে। শিল্পে ব্যবহারের লক্ষ্যে এখন ফসলে তৈরি করা হচ্ছে সাইক্লোডেক্সট্রিন। ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদে এখন তৈরি করা হচ্ছে অধিক মাত্রায় ফ্রুকটান (fructan)। ব্যাকটেরিয়া থেকে লেভেনসূক্রেজ জিন উদ্ভিদে সংযোজন করে পাওয়া যাচ্ছে অধিক মাত্রায় ফ্রুকটান।

আগামী দিনগুলোতে বাজারে আসবে অধিক গুণগত পুষ্টিমান সম্পন্ন জিএম ফসল। টমেটোতে এন্টিঅক্সিডেন্ট ফ্ল্যাভানয়েডের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে কয়েক গুণ। দানা ও শিমজাতীয় শস্যের আমিষের জীবীয় দক্ষতা (biological efficeiency) বাড়ানো সম্ভব হবে এক ফসলের জিন অন্য ফসলে সংযোজন করে। শিমজাতীয় ফসলের জিন দানাশস্যে ঢুকিয়ে পাওয়া সম্ভব হবে অধিক মাত্রায় লাইসিন। ফসলের বীজে বিদ্যমান পুষ্টিমান বিনাশী উপাদানও কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। গমের মত অনেক শ্বেতসার উৎপাদনকারী ফসলের দানায় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে বীজ সংরক্ষণশীল আমিষ। নুডুলস বানানোর উপযোগী করে শর্করা উৎপাদনের লক্ষ্যে পরিবর্তন আনা হবে শর্করায়।

ফুল ব্যবসা এখন বহু দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ। ফুল প্রিয় মানুষ চায় আরও নানা বর্ণের ফুল, নানা আকৃতির গন্ধযুক্ত ফুল। ফুল উন্নয়নের ক্ষেত্রে

জিনপ্রযুক্তির প্রয়োগ আজ নতুন মাত্রা সংযোজন করতে যাচ্ছে। জীবপ্রযুক্তিবিদগণ চাচ্ছে *Vibrio fischeri* থেকে জীবালোকোজ্জ্বল (bioluminescence) জিন বা *lux* জিন ফুল গাছের কোষে সংযোজন করে দিতে। জোনাকি পোকার লুসিফারেজ জিন ফুল গাছে বা বাহারী উদ্ভিদে (ornamental) প্রবিষ্ট করে দিতে পারলে সেসব বাহারী উদ্ভিদ বা ফুল থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকবে আলোক রাশি। রাতে তা তখন সৃষ্টি করবে এক দৃষ্টি নন্দন পরিবেশ। বিশ্ব পরিবেশ অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন একটি নাজুক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দিন দিন ওজোন স্তর ক্ষয়ে যাওয়ায় অধিক মাত্রায় অতিবেগুনি রশ্মি ভূপৃষ্ঠে পৌছাচ্ছে। অন্যদিকে বায়ুমণ্ডলে দিন দিন CO_2 এর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে বলে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং অতিবেগুনি রশ্মির হাতে পড়ছে যাবতীয় গাছপালা এবং আমাদের ফসল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফসলের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ এর ফলন ও গুণমান বৃদ্ধি করার কৌশল জীবপ্রযুক্তিবিদদের এখন থেকেই উদ্ভাবন না করে উপায় নেই। আগামী দিনের ফসল উৎপাদনের সমস্যা নিরসনে জিনপ্রযুক্তির প্রয়োগ যে বৃদ্ধি পাবে সে কথা সহজেই অনুমান করা চলে।

তথ্যপঞ্জি

ইংরেজি

Bhuiyan. M S.R. and Hoque, M.E. 2008. An Introduction to Plant Tissue Culture. ZN Shahana and M.D. Nesa, SAU, Dhaka.

Chrispeels M.J. and D.E. Sadava 1944. Plants, Genes and Agriculture. Jones and Bartlett Publishers, London.

Fedoroff, N. and Brown, N. 2004. Mendel in the kitchen. Joseph Henry Press, Washington, D.C.

Karim, M.A. and Miah, M.A. 1990. Breeding research on sugarcane in Bangladesh. In - Plant Breeding in Bangladesh. (ed. L. Rahman and M A Q Shaikh). Proceedings of the First National Symposium , June 5-7, 1989. Plant Breeding and Genetics Society of Bangladesh.

Mahtabuddin, M. 1990. Jute Breeding in Bangladesh. In - Plant Breeding in Bangladesh. (ed. L. Rahman and M A Q Shaikh). Proceedings of the First National Symposium , June 5-7, 1989. Plant Breeding and Genetics Society of Bangladesh.

Miah, N.M. 1990. Breeding research on rice in Bangladesh. In - Plant Breeding in Bangladesh. (ed. L. Rahman and M A Q Shaikh). Proceedings of the First National Symposium, June 5-7, 1989. Plant Breeding and Genetics Society of Bangladesh.

Singh B.D. 2006. Plant Biotechnology. Kalyani Publishers, New Delhi.

Singh, B.D. 1993. Plant Breeding. Kalyni Publishers, New Delhi.

Slater, A., Scott, N.W. and Fowler. M.R. 2003. Plant Biotechnology- The Genetic Manipulation of plants. Oxford University Press.

Siddiq, E.A. and Viraktamath, B.C. 2001. Rice. In - Breeding Field Crops (ed. V.L. Chopra). Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi.

Rao, V.S. 2001. Wheat. In Breeding Field Crops (ed. V.L. Chopra). Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi.

Dhillon. B.S. and Prassanna, B.M. 2001. Maize. In Breeding Field Crops (ed. V.L. Chopra). Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi.

বাংলা

ভূঁইয়া, শ র। ২০০৪। ট্রান্সজেনিক ফসল। নবীন বিজ্ঞানী। ১৩তম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

ভূঁইয়া, শ র। ২০০৪। ফসলের জাত রক্ষায় মেধাস্বত্ব। নবীন বিজ্ঞানী। ১৩তম বর্ষ ২য় সংখ্যা, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

ভূঁইয়া, শ র। ২০০৪। কৃষিতে মেধাসম্পদস্বত্ব। পুরোগামীবিজ্ঞান। ১ম - ৪র্থ সংখ্যা, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ডঃ কুদরত-এ-খুদা রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫।

ভূঁইয়া, শ র। ২০০৬। উদ্ভিদ প্রজনন ও বিবর্তন। প্রোগ্রেসিভ বুক কর্ণার। হযরত শাহ্‌জালাল মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

ভূঁইয়া, শ র। ২০০৬। দেশী ধানের জাত। কৃষি কথা। ৬৬তম বর্ষ: ৫ সংখ্যা, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০০৬। পৃ: ১৩১-১৩৩।

ভূঁইয়া, শ র। ২০০৮। জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

[stamp]

মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া (১৯৫৬-)। পিতা : মরহুম আঃ রশীদ ভূঁইয়া, মাতা : সুফিয়া খানম, জন্ম : রায়েরগাঁও, বেলাব, নরসিংদী। পিএইচ-ডি ইন বায়োটেক-নোলজি। তিনি বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটে কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। বর্তমানে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সিস্টেমের পরিচালক (গবেষণা) হিসেবে এবং দুটি গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এক যুগ ধরে সরিষা নিয়ে গবেষণা করছেন এবং এস এ ইউ সরিষা ১' এবং এস এ ইউ সরিষা ২' নামক দুটি সরিষার জাত উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা ৪০টি এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা ৫২টি। তিনি দুটি বিজ্ঞান গবেষণা জার্নালের মুখ্য সম্পাদক ও সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বেশ ক'টি বিজ্ঞান জার্নালের সম্পাদনা পরিষদের সদস্য। বাংলা একাডেমী থেকে তাঁর লেখা 'উদ্ভিদ প্রজনন', 'কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন শব্দকোষ' এবং 'জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' নামের তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বাংলা একাডেমীর জীবন সদস্য। এছাড়াও তিনি বেশ ক'টি পেশাজীবী সংগঠনের জীবন সদস্য।